কুরআন-হাদীসের আলোকে

হাফিযের মর্যাদা

দায়িত্ব ও কর্তব্য

মুফতি মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন

ফারেগ: জামিয়া আরাবিয়া ইমদাদুল উলূম ফরিদাবাদ, ঢাকা

ইফতা: জামিয়া হুসাইনিয়া আরজাবাদ, মিরপুর, ঢাকা

নিবাস: সাতাউক মধ্যগ্রাম, মুড়িয়াউক, লাখাই, হবিগঞ্জ

সম্পাদনা

মাওলানা মুফতি আঃ সালাম নুমানী হাফিযাহুল্লাহ

মুফতি ও মুহাদ্দিস: ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার বাংলাদেশ

বসুন্ধরা, গুলশান, ঢাকা-১২৩০

প্রকাশনায়: আল-হিকমাহ প্রকাশনী

আলহাজ্ব ইঞ্জি. মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম, ঢাকা-১২০৭

মুঠোফোন: ০১৭৫৭৮০৩৩২৯

স্বত্ব: লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ: রবিউস সানী-১৪৪২ হি.; অগ্র.-১৪২৭ বা.; সেপ্টেম্বর, ২০২০ ঈ.

প্রাপ্তিস্থান

মাকতাবাতুল ইসলাম, গুলশান, ঢাকা- ০১৯১১ ৪২ ৫৬ ১৫

রহমানিয়া লাইব্রেরি, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা- ০১৮৪০ ৯৯ ৪৮ ১৭

আল-ইখওয়ান লাইব্রেরি, হবিগঞ্জ সদর- ০১৭৭৫ ৬১ ৭০ ২৭

খিদমাহশপ, বাংলাবাজার, ঢাকা- ০১৯৩৯ ৭৭ ৩৩ ৫৪ (অনলাইন)

বিনিময়:

: ১৭২ টাকা মাত্র (খুচরা সর্বোচ্চ ৩০% কমিশন)

বই সংগ্রহ, পরামর্শ প্রদান এবং সার্বিক যোগাযোগ

মুঠোফোন, হোয়াটসঅ্যাপ - **০১৭১২ ৯৬ ১৪ ৭০**

Facebook ID: Mohammad Nasiruddin (**মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন**)

YouTube Channel: 5 minutes online madrasah (**৫ মিনিটের মাদরাসা**)

YouTube Channel Link:
https://www.youtube.com/channel/UCPm9jBVMKDtJeF4hwPBiYfA

QR CODE

বইটিতে হাদীসের দুআ, আমলের সঠিক উচ্চরণ এবং কুরআন-হাদীসের রেফারেন্সসহ ইসলামিক ভিডিও, মাসআলা এবং সঠিক তথ্যের জন্য স্মার্টফোনের প্লেস্টোর থেকে QR Code নামে যে কোন একটি এপস ইনস্টল করে তা দিয়ে আমাদের QR Code স্ক্যান করলে সরাসরি চ্যানেলে গিয়ে সাবক্রাইব করে আপনার পছন্দের ভিডিও দেখন। শেয়ার করে ইসলাম প্রচার শরীক হোন।

উপহার

শ্রদ্ধেয়/স্নেহের,

মুহা./মোছা. . . . .

গ্রাম . . . . পোস্ট. . . . .

থানা . . . . জেলা . . . . কে

তাঁর/প্রতিষ্ঠানের এবং পরিবারের সকলের সুস্থ, সুন্দর, আলোকিত জীবন এবং পরকালীন মুক্তি কামনায় কুরআন-হাদীসের আলোকে-

‘হাফিযের মর্যাদা, দায়িত্ব ও কর্তব্য’

বইটি কুরআন-হাদীসের আলোকে হাফিয ও অন্যান্য মুমিনের জীবনকে আলোকিত করতে এবং অন্যকে সঠিক পথের দিকে দাওয়াত দেওয়ার উদ্দেশ্যে, আন্তরিক দু‘আ পাবার আশা রেখে উপহার দিলাম।

শুভেচ্ছান্তে

আপনার . . . .

মুহা./মোছা . . . .

গ্রাম/পোস্ট. . . . . থানা . . . .

জেলা . . . . ফোন . . . .

সাক্ষর . . . . তারিখ . . . .

আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ

‘একে অপরকে উপহার দাও এবং একে অপরকে ভালোবাসো।’

(ইমাম বুখারীর রচিতঃ আল আদাবুল মুফরাদ, হাদীস-৫৯৪)

সম্পাদকীয়

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

মুফতি মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন সাহেব কর্তৃক রচিত কুরআন-হাদীসের আলোকে ‘হাফিযের মর্যাদা, দায়িত্ব ও কর্তব্য’ নামক গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় আমার জানা মতে এক অপূর্ব লিখনী। আমি তা সম্পূর্ণ খতিয়ে দেখেছি। বিশেষভাবে হাদীস সমূহের হাওয়ালাজাত (রেফারেন্স) এবং এর মান নির্ণয়ের মত গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করা হয়েছে। তাতে গ্রন্থটির মর্যাদা অনেকগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এর নির্ভরযোগ্যতা লাভ করেছে।

অতএব উল্লেখিত বিষয়ে পাঠক মহলের প্রতি আমার আবেদন রইল যে, গ্রন্থটি নির্বিঘ্নে অধ্যয়ন করে উপকৃত হবেন। ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে দুআ করি, যেন মহান আল্লাহ তায়ালা এই বইয়ের লেখক, প্রকশকের প্রয়াসকে কবূল করেন। এই বইয়ের তত্ত্বাবধায়ক, সহায়ক এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে উত্তম বিনিময় দান করেন। আমীন।

মুফতী আবদুস সালাম নোমানী
সিনিয়র মুহাদ্দিস
ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার
বসুন্ধরা, ঢাকা
তারিখঃ ২১.১০.২০২০

পাঠক সমীপেঃ বই লেখার তিনটি কারণ

১. আল্লাহ যেমন মহান তাঁর কিতাবও মহান। যারা এই মহান কিতাব হৃদয়ে ধারণ করবেন তারাও মহান হবেন। শ্রেষ্ঠ মর্যাদা লাভ করবেন জীবনের এপারে ওপারে। তবে এ মর্যাদা পাওয়া যাবে যদি জীবনকে সাজানো হয় কুরআনের আলোকে। কুরআনের দাবি যদি বাস্তবায়ন করা হয় জীবনের ক্ষণে ক্ষণে। প্রতিটি মুহূর্তে। ব্যক্তিগত জীবন থেকে নিয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের সাথেই বলতে হচ্ছে, আমাদের বাংলাদেশে প্রতি বছর কুরআনের অসংখ্য হাফিয তৈরি হলেও তাদের অনেকের পক্ষেই কুরআনের গভীর জ্ঞান অর্জনের সুযোগ হয় না। ফলে মহান আল্লাহর কুরআনের হাফিযগণ নিজের মর্যাদা জানেন না। জানেন না তাদের প্রতি কুরআনের অপরিহার্য দাবিগুলো কী কী? ব্যক্তিগত জীবন থেকে নিয়ে আন্তর্জাতিক জীবনে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো কী কী সে সম্পর্কেও তাদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। কুরআনের হাফিযগণের প্রতি কুরআনের দাবি এবং তাদের মৌলিক দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা এবং দিক-নির্দেশনা প্রদান করার জন্য আমাদের এই সংক্ষিপ্ত সংকলন।

২. আমি মাদরাসায় লেখাপড়ার শুরু থেকেই মাঝে মধ্যে অবাক হতাম যে, একজন হাফিয এতো বড় কুরআন মুখস্ত করতে পারলেন অথচ সে এই কুরআনের মধ্যে কী আছে তা জানেন না। তখন থেকেই মনের মধ্যে ইচ্ছা ছিল মহান আল্লাহ যদি আমাকে কখনো কিছু লেখার তাওফিক দান করেন তাহলে কুরআনের সে সব হাফিযগণের উদ্দেশ্যে কিছু লিখব। আজ থেকে ২২ বছর পূর্বের সেই ইচ্ছা ও পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার উদ্দেশ্যে এই লেখার প্রয়াস।

৩. পূর্বের উম্মতের তুলনায় আমাদের হায়াত অনেক কম। জীবনের অল্প সময়ে বেশী আমল করা আমার মতো ছোট মানুষের পক্ষে অনেক কঠিন। এজন্য আল্লাহর কুরআনের হাফিযগণের মাকবূল দুআ পাবার আশায় তাদের খেদমতে আমার এই আয়োজন।

বিভিন্ন ব্যস্ততার মধ্যে 'হাফিযের মর্যদা দায়িত্ব ও কর্তব্য' বইটি লিখতে সবচেয়ে বেশি কষ্ট দিয়েছি ও অধিকার নষ্ট করেছি আমার পরিবারের সকল

সদস্যদের এবং মুসল্লীদের। মহান আল্লাহ তাঁদেরকে দুনিয়া ও পরকালের সর্বোত্তম পুরষ্কার দান করুন। তিনি আমাকে এবং আমার পিতা-মাতা, স্ত্রী-সন্তান, ভাই-বোন, শশুর-শাশুরী, শিক্ষক-উস্তাদ এবং বইটি প্রকাশে যারা বিভিন্নভাবে সহযোগীতার হাত বাড়িয়েছেন তাদের সকলের পরকালীন নাজাতের ওসীলা করেন এবং এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাটুকু কবুল করে নেন এই আশায়।

এই বইটিতে হাদীসের নাম্বারের ক্ষেত্রে 'আল-মাকতাবাতুশ শামিলা' www.almeshkat.net-এর অন্তর্ভুক্ত কিতাবসমূহ সামনে রাখা হয়েছে। এই ওয়েবসাইট-এর অন্তর্ভুক্ত প্রায় সকল কিতাব সউদী আরব, বৈরুত এবং মিশর থেকে প্রকাশিত। এ জন্য উপমহাদেশ থেকে প্রকাশিত কিতাবসমূহের হাদীস নাম্বার উল্লেখিত কিতাবসমূহের হাদীস নাম্বারের সাথে হয়তো মিল হবে না।

সংক্ষিপ্ত সময়ে লেখা বইটিকে নির্ভুল রাখার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। সতর্কতার সাথে হাদীস লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। অগ্রহণযোগ্য হাদীস পরিহার করা হয়েছে। এই বইটি সুন্দর করার জন্য ইবনে খালদুন ইনস্টিটিউট এর পরিচালক মাওলানা লাবীব আবদুল্লাহ সাহেবের অবদান ভুলার মতো নয়। বিশেষভাবে ঢাকা বসুন্ধরা ইসলামিক রিসার্চ সেন্টারের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা মুফতী আবদুস সালাম নোমানী দা.বা. বইটিতে উল্লেখিত হাদীসের সনদ এবং মান যাচাই বাছাই করে এর গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধিতে অনেক বড় ধরণের অবদান রেখেছেন। মহান আল্লাহ তাদেরকে সর্বোত্তম বিনিময় দান করেন। পরিশেষে সকল ভুলভ্রান্তির জন্য মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। তারপরও যদি কোনো সুহৃদ পাঠক/পাঠিকার দৃষ্টিতে ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় তাহলে আমাদের নির্ধারিত ঠিকানায় আপনার মতামত জানিয়ে কৃতজ্ঞতায় বাধিত করবেন বলে আশা করছি। পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করে দেওয়া হবে। ইনশাআল্লাহ।

মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন
সাতাউক মধ্যগ্রাম, লাখাই, হবিগঞ্জ
০১৭১২ ৯৬১ ৪৭০

সংক্ষিপ্ত সূচী

কুরআন বিষয়ক কিছু মৌলিক আলোচনা
১. কুরআন পরিচিতি ও নাযিলের প্রয়োজনীয়তা
২. কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য
৩. কুরআন নাযিলের ইতিহাস
৪. সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ আয়াত এবং কুরআনের আয়াত সংখ্যা
৫. কুরআন সংকলন ও সংরক্ষণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস
৬. কুরআনের কিছু বৈশিষ্ট্য
৭. কুরআনের আলোচ্য বিষয় ও এর গুরুত্ব
হিফয ও হাফিযের গুরুত্ব
১. কুরআনের আলোকে হিফয ও হাফিযের গুরুত্ব
২. হাদীসের আলোকে হিফয ও হাফিযের গুরুত্ব
ইসলামে হাফিযের মর্যাদা
১. দুনিয়াতে হাফিযের মর্যাদা
২. পরকালে হাফিযের মর্যাদা
হাফিযের দায়িত্ব ও কর্তব্য
১. কুরআনের হক আদায় করা
২. যাবতীয় মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকা
৩. পরিবার ও সমাজের জন্য করণীয়
৪. দেশ-রাষ্ট্রের জন্য করণীয়
হাফিযের প্রতি কুরআনের দশটি দাবি
১. কুরআনের হক আদায় করা
২. সঠিক আকিদায় বিশ্বাস স্থাপন করা
৩. ঈমানের ক্ষতিকারক বিশ্বাস ও কাজ না করা
৪. ঈমানকে শিরক থেকে মুক্ত রাখা
৫. ঈমান ও আমলকে বিদআত থেকে মুক্ত রাখা
৬. সকল কবীরা গুনাহ থেকে নিজেকে রক্ষা করা
৭. কুরআনের নির্দেশগুলো পালন করা এবং নিষেধগুলো না করা
৮. শুধু কুরআন-সুন্নাহ নির্দেশিত আমলের প্রতি যত্নবান হওয়া
৯. আলোকিত সমাজ গঠন করা
১০. হৃদয়ে কুরআনিক চেতনা লালন করা

কুরআন বিষয়ক কিছু মৌলিক আলোচনা

কুরআনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও নাযিলের প্রয়োজনীয়তা

কুরআনের নাম ও নামকরণের তাৎপর্য: কুরআনের নামের ব্যাপারে অনেক অভিমত রয়েছে। তম্মধ্যে দু'টি অভিমত সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধ।এক.আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী রাহিমা. তাঁর কিতাব 'আল-ইতকান ফী উলূমিল কুরআন' এর মধ্যে শাফিয়ী মাযহাবের প্রসিদ্ধ আলেম আল্লামা আবুল মায়ানী রাহ. রচিত 'আল-বুরহান ফী মুশকিলাতিল কুরআন' এর উদ্ধৃতি দিয়ে কুরআনের ৫৫টি নাম উল্লেখ করেছেন। দুই. সরাসরি কুরআনের মধ্যেই কুরআনের পাঁচটি নাম রয়েছে। যেমন আল-কুরআন, আল-ফুরকান, আয যিকর, আল-কিতাব ও আত তানযিল।[১]

তবে কুরআনের গুণবাচক নামগুলো হিসাব করলে কুরআনের নাম ৫৫টি বা এর চেয়ে আরো বেশি। সবচেয়ে প্রসিদ্ধ নাম হচ্ছে 'আল-কুরআন'। কারণ, স্বয়ং কুরআনের ভেতরই কুরআন শব্দটি ষাট বারের চেয়েও বেশি উল্লেখ রয়েছে।

কুরআনের অর্থ: কুরআনের শাব্দিক অর্থ, পঠিত বা পাঠকৃত।
কুরআনের পারিভাষিক অর্থ

اَلْكِتَابُ الْمُنَزَّلُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ اَلْمَكْتُوْبُ فِيْ الْمَصَاحِفِ اَلْمَنْقُوْلُ عَنْهُ نَقْلًا مُتَوَاتِرًا بِلَا شُبْهَةٍ

কুরআন ঐ কিতাবকে বলা হয় যা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি নাযিল করা হয়েছে। গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ রয়েছে। সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য সূত্রে সন্দেহ মুক্তভাবে বর্ণিত হয়ে আসছে।[২]

কুরআন নাযিলের প্রয়োজনীয়তা: প্রত্যেক মানুষকেই তার জীবন পরিচালনা করার জন্য সৃষ্টজীবের ব্যবহার সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা প্রয়োজন। অর্থাৎ সৃষ্ট জীবের কোনটাকে কীভাবে ব্যবহার করতে হবে তা জানা প্রয়োজন। নতুবা ভুল ব্যবহারের কারণে মানুষ যে কোন মুহূর্তেই ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে যেতে পারে। সুতরাং মানুষের নিজের সুরক্ষার জন্য সৃষ্টজীবের ব্যবহার সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন করা অত্যাবশ্যকীয়। সৃষ্টজীবের ব্যবহার সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জনের জন্য মানুষের সামনে অপরিহার্য তিনটি মাত্র পথ খোলা রয়েছে।
১. পঞ্চইন্দ্রিয় শক্তি। যেমন- চোখ, কান, নাক, জিহ্বা এবং ত্বক।
২. বিবেক-বুদ্ধির শক্তি।

---

[১] যথাক্রমে: বাকারা-১৮৫; আলে ইমরান-৪; হিজর-৯; বাকারা-২; ইয়াসিন-৫
[২] মাদরাসার সিলেবাসের পাঠ্য কিতাব: নূরুল আনওয়ার

৩. ওহী বা কুরআনের শক্তি।

উল্লেখিত তিনটি শক্তির প্রত্যেকটি শক্তি সুনির্দিষ্ট সীমারেখা পর্যন্ত মানুষকে পথ নির্দেশ করে। মানুষ পঞ্চইন্দ্রিয় শক্তির মাধ্যমে অনেক কিছুর জ্ঞান লাভ করতে পারে। আবার অনেক কিছুর জ্ঞান লাভ করার জন্য প্রয়োজন হয় বিবেকশক্তির । যে সকল জিনিসের জ্ঞান পঞ্চইন্দ্রিয় এবং বিবেক শক্তির মাধ্যমে অর্জিত হয় না তার জ্ঞান অর্জন করতে হয় ওহী বা কুরআনের শক্তির মাধ্যমে। উদাহরণ দিয়ে একটু বুঝিয়ে বললে বুঝতে সহজ হবে। যেমন- আমার সামনে মিষ্টান্ন পানির গ্লাস এবং সাধারণ পানির গ্লাস রাখা হলো। পঞ্চ ইন্দ্রিয় থেকে জিহ্বা দ্বারা জানা যাবে কোন গ্লাসের পানি মিষ্টি এবং কোন গ্লাসের পানি সাধারণ। এখানে বিবেক বুদ্ধি দিয়ে মিষ্টান্ন এবং সাধারণ পানি চেনা যাবে না। চেনার জন্য জিহ্বা প্রয়োজন। তেমনিভাবে যে জিনিস বিবেক বুদ্ধি দিয়ে জানা যায় তা শুধু পঞ্চ ইন্দ্রিয় শক্তির মাধ্যমে জানা যায় না। যেমন, আমার সামনে একজন মানুষ বসে আছে। সেই মানুষটি ফর্সা না কালো তা বিবেক বুদ্ধি দিয়ে জানা যাবে না। এর জন্য প্রয়োজন পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের। আবার কিছু বিষয় এমনও আছে যা পঞ্চ ইন্দ্রিয় শক্তির মাধ্যমে বুঝা যায় না। এর জন্য বিবেকের প্রয়োজন। যেমন, আমার সম্মুখের লোকটি সুস্থ না পাগল, শিক্ষিত না মূর্খ? তা পঞ্চ ইন্দ্রিয় শক্তির মাধ্যমে জানা যায় না, তা জানা যায় বিবেক বুদ্ধির মাধ্যমে।

আমরা এতক্ষণে বুঝতে পারলাম, যে জিনিসের জ্ঞান পঞ্চ ইন্দ্রিয় শক্তির মাধ্যমে জানা যায় না, তা জানা যায় বিবেক বুদ্ধি দিয়ে। আবার কখনো বিবেক বুদ্ধি দিয়ে যা জানা যায় না তা জানা যায় পঞ্চ ইন্দ্রিয় শক্তির মাধ্যমে। কিন্তু যে জিনিসের জ্ঞান পঞ্চ ইন্দ্রিয় শক্তি এবং বিবেক বুদ্ধি কোনোটা দিয়েই জানা যাবে না, সেই জিনিসের জ্ঞান কীভাবে লাভ করা হবে? তার জ্ঞান অর্জন হবে একমাত্র ওহী বা কুরআনের মাধ্যমে। যেমন, আমার সামনে বসা লোকটির ব্যাপারে আমার বিবেক বুদ্ধি বলে দিল যে, লোকটির একজন সৃষ্টিকর্তা আছে। কিন্তু লোকটিকে সৃষ্টিকর্তা কেন সৃষ্টি করেছেন? সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে তাকে কী কী কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে? দায়িত্বগুলো কখন এবং কীভাবে পালন করতে হবে? তার কোন কোন কাজে সৃষ্টিকর্তা তার উপর সন্তুষ্ট হবেন এবং কোন কোন কাজে সৃষ্টিকর্তা তার উপর অসন্তুষ্ট হবেন? এ ধরণের প্রশ্নের উত্তর পঞ্চ ইন্দ্রিয় শক্তি এবং বিবেক বুদ্ধি একত্রে মিলিত হয়েও দিতে পারবে না। এ ধরণের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যে ব্যবস্থা রেখেছেন তার নাম ওহী বা কুরআনিক জ্ঞান।

কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য

ভারত উপমহাদেশের প্রখ্যাত দার্শনিক আলেম হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রাহি.। তিনি বলেন, কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য তিনটি।

تَهْذِيبُ النُّفُوسِ الْبَشَرِيَّةِ وَدَمْغُ الْعَقَائِدِ الْبَاطِلَةِ وَنَفْيُ الْأَعْمَالِ الْفَاسِدَةِ

মানবআত্মার সংশোধন। সকল বাতিল আকিদার মূলোৎপাটন এবং যাবতীয় ভ্রান্ত আমলের মূলোচ্ছেদ।[৩]

ওহী বা কুরআনের জ্ঞান মানুষের জন্য এমন উচ্চস্তরের জ্ঞান অর্জনের মাধ্যম যা মানুষের জীবনের সাথে সম্পৃক্ত এমন প্রশ্নের উত্তর সরবরাহ করে । যা শুধু পঞ্চ ইন্দ্রিয় এবং বিবেক বুদ্ধি দিয়ে সমাধান করা যায় না। সে সব বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করা প্রয়োজন। আমরা এতোক্ষণের আলোচনা থেকে বুঝতে পারলাম যে, শুধু পঞ্চ ইন্দ্রিয় শক্তি এবং বিবেক বুদ্ধি মানুষের জীবন পরিচালনার পথ প্রদর্শনের জন্য যথেষ্ট নয়, বরং মানুষের পথ প্রদর্শনের জন্য মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী বা কুরআনের জ্ঞান অবশ্যই প্রয়োজন। আর এই প্রয়োজন পূরণের জন্যই মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআন নাযিল করেছেন।[৪]

কুরআন নাযিলের ইতিহাস

এখানে আমরা প্রথমেই যে কথাটা জানব তা হচ্ছে কুরআন নাযিল হওয়ার পূর্বে কুরআন কোথায় ছিল? এ বিষয়ে মহান আল্লাহ সূরা বুরুজ এর মধ্যে বলেন-

بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ • فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ

এটি অতি সম্মানিত কুরআন, যা লাওহে মাহফুজে সংরক্ষিত।[৫]

লাওহে মাহফুজ থেকে কুরআনকে দুই পর্বে নাযিল করা হয়েছে। প্রথম পর্বে লাওহে মাহফুজ থেকে দুনিয়ার কাছাকাছি প্রথম আসমানের বাইতুল ইজ্জত (বা বাইতুল মা'মুর) নামক স্থানে নাযিল করা হয়েছে। তখন লাওহে মাহফুজ থেকে পূর্ণ কুরআন একসাথে নাযিল করা হয়েছিল। দ্বিতীয় পর্বে বাইতুল ইজ্জত থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট দীর্ঘ ২৩ বছরে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে নাযিল করা হয়েছিল। বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায় যে, রমজান মাসেই কুরআনকে লাওহে মাহফুজ থেকে বাইতুল ইজ্জতে নাযিল করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনের সূরা বাকারার ১৮৬ নং আয়াত থেকে সুস্পষ্টভাবে জানা যায় যে, কুরআনকে রমযান মাসেই বাইতুল ইজ্জত থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে নাযিল করা হয়েছিল।

[৩] বিস্তারিত: আল ফাউযুল কাবীর

[৪] আল্লামা তকি ওসমানি দা. বা. কর্তৃক রচিত 'উলূমুল কুরআন ও উসূলুত তাফসীর' দ্রষ্টব্য।

[৫] সূরা বুরুজ, আয়াত-২১,২২

অন্যান্য হাদীস থেকে আরও জানা যায় যে, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বয়স ছিল চল্লিশ। কুরআন নাযিলের সংক্ষিপ্ত এই ইতিহাস থেকে আমরা আরো জানতে পেরেছি যে বর্তমান পৃথিবীতে সংরক্ষিত কুরআন ছাড়া আরো দুটি স্থানে কুরআনকে সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছে। লাওহে মাহফুজ এবং বাইতুল ইজ্জত, যার অপর নাম বাইতুল মামুর।

কুরআন নাযিলের সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ আয়াত

একথা পূর্বেই বলা হয়েছে যে, প্রথম আসমানের বাইতুল ইজ্জত (বাইতুল মা'মুর) থেকে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে সুদীর্ঘ তেইশ বছরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর কুরআন নাযিল করা হয়েছে। তবে সর্বপ্রথম কোন আয়াতটি নাযিল করা হয়েছে এ ব্যাপারে বিভিন্ন বর্ণনা থাকলেও নির্ভরযোগ্য এবং বিশুদ্ধ বর্ণনা মতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি সর্বপ্রথম 'সূরা আলাক' এর প্রথম পাঁচটি আয়াত নাযিল করা হয়েছে। হাদীসে বলা হয়েছে- 'রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে নির্জনতা পছন্দ হতো। এজন্য তিনি হেরা গুহায় রাতদিন অবস্থান করতেন। এ অবস্থাতে একরাতে হযরত জিবরাঈল আ. হেরাগুহায় তার নিকট আগমন করে বললেন, আপনি পড়ুন। তিনি বললেন, আমি তো পড়তে জানি না। হযরত জিবরাঈল আ. রাসূলকে চেপে ধরেন। তারপর ছেড়ে দিয়ে বললেন, আপনি পড়ু ন। তিনি বললেন, আমি তো পড়তে জানি না। জিবরাঈল আ. তাকে চেপে ধরেন এবং ছেড়ে দিয়ে বললেন, আপনি পড়ুন। তিনি তখনও বললেন, আমি তো পড়তে জানি না। জিবরাঈল আ. তাকে আবারও বললেন-

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ • خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ • اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ •

তখন তিনি উল্লেখিত আয়াতগুলো পাঠ করলেন। এর অর্থ 'আপনি পড়ুন আপনার রবের নামে যিনি সব কিছুকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাট রক্ত দ্বারা। আপনি পড়ুন এবং আপনার রব সর্বাপেক্ষা বেশি মহানুভব।[৬]

এটা ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি সর্বপ্রথম অবতীর্ণ কয়েকটি আয়াত। তখন চন্দ্র বছর অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বয়স ছিল ৪০ বছর ৬ মাস ১২ দিন। সৌর বছর হিসেবে ৩৯ বছর ৩ মাস ২২ দিন।[৭]

[৬] সূরা আলাক, আয়াত- ১-৩
[৭] রাসূলুল্লাহ সা. এর জীবনী সংক্রান্ত বিভিন্ন ইতিহাস।

সূরা আলাকের কয়েকটি আয়াত নাযিলের পর লাগাতার তিন বছর পর্যন্ত কোন আয়াত বা সূরা নাযিল হয় নি। তিন বছর পর রাসূলুল্লাহ ﷺ আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী স্থানে হযরত জিবরাঈল আ.-কে দেখতে পেলেন। তখন ফিরেশতা তাকে সূরা মুদ্দাসসির এর কয়েকটি আয়াত শোনালেন। এরপর থেকেই নিয়মিতভাবে কুরআন নাযিলের ধারাবাহিকতা শুরু হয়। এভাবে সুদীর্ঘ তেইশ বছরে কুরআন নাযিল হওয়া সম্পন্ন হয়।[৮]

রাসূলুল্লাহ ﷺ-একাদশ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। ইন্তেকালের ৮১ দিন মতান্তরে ৯ দিন পূর্বে কুরআনের সর্বশেষ আয়াত নাযিল হয়। কুরআনের সর্বশেষ কোন আয়াতটি নাযিল হয় এ ব্যাপারে ভিন্নমত থাকলেও আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদি. এর সূত্রে ইবনে জারীর তাবারী বলেন, কুরআনের সর্বশেষ নাযিলকৃত আয়াত হলো সুরা বাকারার ২৮১ নং আয়াতটি। তা হচ্ছে-

وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ إِلَى اللّٰهِ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ•

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস এবং প্রমূখ সাহাবীর মতে এই আয়াতটি কুরআনের নাযিলকৃত সর্বশেষ আয়াত।

একটি সংশয় ও তার নিরসন: মহান আল্লাহ সূরা মায়েদার তৃতীয় আয়াতে বলেন-

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

আজ আমি তোমাদের জন্য আমার দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম। তোমাদের উপর আমার নিয়ামত পরিপূর্ণ করলাম। তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে ইসলামকে (চির দিনের জন্য) পছন্দ করে নিলাম।

আয়াত থেকে জানা গেল যে, মহান আল্লাহ ইসলাম ধর্মকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। সুতরাং ইসলাম যদি পরিপূর্ণই হয়ে থাকে তাহলে তো আর কোন আয়াত নাযিল হওয়ার প্রয়োজন নেই। সুতরাং এই আয়াতই হবে কুরআনের নাযিলকৃত সর্বশেষ আয়াত। তাহলে উপরে যে বলা হয়েছে কুরআনের নাযিলকৃত সর্বশেষ আয়াত সুরা বাকারার ২৮১ নং আয়াত, তা কীভাবে সম্ভব?

নিরসন: উল্লেখিত সংশয়ের কয়েকটি নিরসন রয়েছে। তবে উল্লোখযোগ্য নিরসন হলো, সূরা মায়িদার তিন নম্বর আয়াতটি দশম হিজরীর যিলহজ মাসে শুক্রবার দিন আরাফার ময়দানে বিকেল বেলা নাযিল হয়েছিল। বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায় যে, দশম হিজরীর যিলহজ মাসের পরে আরো অনেক আয়াত নাযিল হয়েছিল। সুতরাং সূরা মায়েদার তিন নম্বর আয়াতটি কুরআনের নাযিলকৃত

[৮] সহীহ বুখারী, হাদীস-৩; আল্লামা তকি ওসমানি দা.বা. এর রচিত 'উলূমুল কুরআন

সর্বশেষ আয়াত নয়। কুরআনের প্রখ্যাত তাফসিরকারক আল্লামা সুদ্দী রাহি. বলেন, 'সূরা মায়েদার ৩ নং আয়াতটি আরাফার ময়দানে নাযিল হয়েছিল। এই আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর হালাল-হারাম সম্পর্কিত কোন আয়াত নাযিল হয় নি।' ইমাম সুদ্দীর বক্তব্যকে কেন্দ্র করে ওলামায়ে কিরাম বলেন, সূরা মায়েদার ৩ নং আয়াতে ইসলাম ধর্ম পরিপূর্ণ করার মর্ম হলো মহান আল্লাহ হালাল-হারাম এবং বিধি-বিধান সম্পর্কে ইসলাম পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। এরপর হালাল হারাম সম্পর্কিত আর কোন আয়াত নাযিল হয় নি। তবে সুরা বাকারার ২৮১ নং আয়াতটি হালাল-হারাম সম্পর্কিত নয়। আয়াতটি হল নসীহত বিষয়ে। আরাফার ময়দানে ইসলাম ধর্ম পরিপূর্ণ করে দেওয়ার ঘোষণার মর্ম ছিল ইসলামের বিধি-বিধান, হালাল-হারাম পরিপূর্ণ করে দেওয়া। এরপরও নসীহতের আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। সুরা বাকারার ২৮১ নং আয়াতটি নসীহত সম্পর্কিত আয়াত।[৯]

কুরআনের আয়াত সংখ্যা

লোকমুখে কুরআনের আয়াত সংখ্যা ৬৬৬৬টি বলেই বেশি প্রচলিত এবং প্রসিদ্ধ। তবে এর কোন ভিত্তি নেই। হাদীসে কিংবা কুরআনের তথ্য সম্পর্কিত নির্ভযোগ্য কিতাবে উল্লেখিত সংখ্যার কথা উল্লেখ নেই। বিশুদ্ধ বিবরণ থেকে জানা যায় যে, কুরআনের আয়াতের সংখ্যার ব্যাপারে কয়েকটি বর্ণনা রয়েছে। যেমন-

১. মদীনাবাসীদের গণনামতে ৬২১৪টি এবং অন্য বর্ণনায় ৬২১৭টি।
২. মক্কাবাসীদের গণনামতে ৬২১৯টি।
৩. শামবাসীদের গণনামতে ৬২২৬টি।
৪. হিমসবাসীদের গণনামতে ৬২৩২টি।
৫. ইরাকের বসরাবাসীদের গণনামতে ৬২০৪টি।
৬. ইরাকের কূফাবাসীদের গণনামতে ৬২৩৬টি।

আমাদের দেশে যে কুরআনুল কারীম রয়েছে এর মধ্যে আয়াতের সংখ্যা ইরাকের কূফাবাসীদের গণনা অনুযায়ী সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে। উপরে উল্লেখিত বিবরণে আয়াতের সংখ্যার ক্ষেত্রে ব্যবধান হলেও আয়াতের পরিমাণের ক্ষেত্রে কোনও ধরণের কম-বেশি হয় নি। মূলত আয়াত গণনার পদ্ধতিগত ব্যবধানের কারণে আয়াতের সংখ্যার ক্ষেত্রে ব্যবধান হয়েছে। দু'টি উদাহরণের মাধ্যমে কথাগুলো আরও সহজে বুঝে আসবে।

উদারহণ-১:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (১) اللَّهُ الصَّمَدُ (২) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (৩) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (৪)

[৯] বিস্তারিত: তাফসীরে ইবনে কাসীরের ফাযায়েলে কুরআন অংশ দ্র.

ইরাকের কূফা, বসরা এবং মদীনাবাসীদের গণনামতে সূরা ইখলাসের মধ্যে মোট আয়াত চারটি। তবে মক্কা ও শামবাসীদের গণনামতে সূরা ইখলাসের মধ্যে মোট আয়াত পাঁচটি। যেমন-

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (১) اللَّهُ الصَّمَدُ (২) لَمْ يَلِدْ (৩) وَلَمْ يُولَدْ (৪) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (৫)

উদারহণ-২:

لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ (১) إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ (২) فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ (৩)
الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ (৪)

ইরাকের কূফা, বসরা এবং শামবাসীদের গণনামতে সূরা কুরাইশের মধ্যে মোট চারটি আয়াত। তবে মক্কা ও মদীনাবাসীদের গণনামতে সূরা কুরাইশের মধ্যে মোট আয়াত পাঁচটি। যেমন-

لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ (১) إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ (২) فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ
(৩) الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ (৪) وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ (৫)

উভয় উদাহরণে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, উভয় গণনায় আয়াতের সংখ্যায় কম-বেশি হলেও আয়াতের পরিমাণ বা তিলাওয়াতের পরিমাণের মধ্যে ব্যবধান নেই, কম-বেশিও নেই। তবে কীভাবে এবং কেন ৬৬৬৬ সংখ্যাটি লোকমুখে প্রচার এবং প্রসিদ্ধি লাভ করেছে এ সম্পর্কে জানতে বাংলাদেশের 'গবেষণামূলক উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মারকাযুদ দাওয়া আলইসলামিয়া ঢাকা' এর মুখপত্র মাসিক আলকাউসার এর 'কুরআনুল কারীম সংখ্যা'র মধ্যে 'কুরআন মাজীদের আয়াত-সংখ্যা, একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা' শিরোনামে মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মালেক সাহেব (দা.বা.) এর প্রবন্ধটি কুরআনের পাঠক, আলোচক এবং গবেষক সকলেরই পাঠ করা উচিত। মহান আল্লাহ হযরতের হায়াতের মধ্যে বরকত দান করুন। আমাদেরকে বেশি বেশি উপকৃত করুন। আমীন।

কুরআন সংকলন ও সংরক্ষণের ইতিহাস

ইতিহাস পর্যালোচনা করে জানা যায়, কুরআন সংকলন এবং সংরক্ষণের কাজ কয়েক যুগে বিভিন্নভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। যেমন-

রাসূলুল্লাহ ও সাহাবা কর্তৃক মুখস্থ করণের মাধ্যমে কুরআন সংরক্ষণ

পূর্বেই বলা হয়েছে, পবিত্র কুরআন একসাথে অবতীর্ণ করা হয় নি। বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজন অনুযায়ী অল্প অল্প করে নাযিল করা হয়েছে। এ কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে কুরআনকে গ্রন্থাকারে একত্রে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হয়

নি। তবে যখন কুরআন নাযিল হতো তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কুরআন মুখস্ত করার জন্য বারবার দ্রুতগতিতে কুরআনের আয়াতগুলো পড়তেন, যেন তা অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে যায়। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মহান আল্লাহ তাকে সম্বোধন করে বললেন-

لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ • إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ •

আপনি কুরআনকে তাড়াতাড়ি মুখস্থ করার জন্য আপনার জিহ্বা নাড়াবেন না। দৃঢ় বিশ্বাস রাখুন, এটা মুখস্থ করানো এবং পাঠ করানোর দায়িত্ব আমারই।[১০]

এই আয়াতে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কুরআন মুখস্থ করা এবং অন্তরে সংরক্ষণ করার ব্যাপারে আশ্বস্ত করলেন যে আমি আপনার মধ্যে এমন প্রখর স্মৃতিশক্তি দান করব যে একবার কুরআন নাযিল হওয়ার পর আপনি তা কখনো ভুলবেন না। এজন্য দেখা গেছে কুরআন নাযিল হওয়ার পর তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে যেত। এভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হৃদয় কুরআনের সুরক্ষিত স্থানে পরিণত হয়ে গেল। যার মধ্যে সামান্যতম সংযোজন ও বিয়োজন হয় নি। এতে ভুলভ্রান্তির সামান্যতম আশঙ্কাও ছিল না। এতদসত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অধিক সতর্কতার জন্য প্রতি রমজান মাসের প্রতি রাতেই জিবরাঈল আ. তার সাথে দেখা করতেন এবং তারা একে অপরকে কুরআন তিলাওয়াত করে শোনাতেন।[১১]

তাহলে জানা গেল যে রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরআন মুখস্ত করে সংরক্ষণ করেছেন। এভাবে সাহাবা কর্তৃক হিফয বা মুখস্ত করণের মাধ্যমেও কুরআন সংরক্ষণ করা হয়েছে। হযরত উবাই ইবনে সামেত রাদি. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাহাবীগণের মধ্য থেকে কোনও সাহাবী হিজরত করে মক্কা থেকে মদীনায় এলে কুরআন শিক্ষার জন্য তাকে একজন আনসারী সাহাবীর সাথে সম্পৃক্ত করে দেওয়া হতো। প্রথম দিকে মসজিদে নববীতে উচ্চ কণ্ঠে কুরআনের তিলাওয়াত হতো। অবশেষে বিশেষ বিবেচনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ নমনীয় আওয়াজে কুরআন তিলাওয়াতের নির্দেশ প্রদান করলেন। এভাবে মসজিদে নববী কুরআন শিক্ষার কেন্দ্রে পরিণত হলো এবং সেখানে নিয়মিতভাবে কুরআন শিক্ষার ফলে সামান্য সময়ের ব্যবধানে সাহাবীগণের মধ্য থেকে অনেকে কুরআনের হাফিয তৈরি হলেন। এভাবে ইসলামের প্রথম যুগে রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং সাহাবীগণের হিফয বা মুখস্ত করার মাধ্যমে কুরআন সংরক্ষণ করা হয়েছিল।

[১০] সূরা কিয়ামাহ, আয়াত-১৬, ১৭

[১১] সহীহ বুখারী, হাদীস-৬; ই.ফা হাদীস-৫

রাসূলুল্লাহ এর যুগে কুরআন লিপিবদ্ধ করণ

রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে কুরআন হিফয বা মুখস্ত করতেন। সাহাবায়ে কিরামও কুরআন মুখস্থ করতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময়ে কুরআন হিফয বা মুখস্ত করণের সাথে সাথে তিনি কুরআন লিপিবদ্ধ আকারে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি লেখাপড়া জানতেন এমন কয়েকজন বিশিষ্ট সাহাবীকে কুরআন লিপিবদ্ধকরণের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত করেছিলেন। হযরত ওসমান রাদি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর কোন আয়াত নাযিল হলে কুরআন লিপিবদ্ধ করার দায়িত্বে নিয়োজিত সাহাবীকে তিনি সংশ্লিষ্ট আয়াতটি কোন সূরার কোন আয়াতের আগে বা পরে সংযোজন করতে হবে তাও তিনি বলে দিতেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত সাহাবী সেভাবেই লিখতেন।

হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত রাদি. বলেন-

كُنْتُ أَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَكَانَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ أَخَذَتْهُ بُرَحَاءُ شَدِيْدَةٌ ...

আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর নাযিলকৃত ওহী লিখার কাজে নিয়োজিত ছিলাম। যখন তাঁর উপর ওহী নাযিল হতো তখন তাঁর পুরো শরীরে মুক্তার মত বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে যেত। এই অবস্থা শেষ হওয়ার পর আমি দুম্বার চামড়া, হাড় অথবা লিখে রাখার উপযুক্ত কোন কিছু নিয়ে উপস্থিত হতাম। লেখা সমাপ্ত করার পর আমার শরীর এমন ওজন হত যেন আমার পা ভেঙ্গে গেছে। আমি যেন চলার শক্তিটুকু হারিয়ে ফেলেছি। লেখা শেষ হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলতেন, 'তুমি পড়ো'। আমি তাঁকে পরে শোনাতাম। এর মধ্যে কোথাও কোনো ভুল ত্রুটি থাকলে তিনি তৎক্ষণাৎ তা ঠিক করে দিতেন।[১২]

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশে কয়েকজন সাহাবী কুরআন লিপিবদ্ধ করতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-কর্তৃক কুরআন লিপিবদ্ধ করণের এই পদ্ধতিকে সরকারি ব্যবস্থাপনাও বলা যায়। অনেক লেখক সরকারি অনুলিপির পাশাপাশি নিজেদের জন্য পৃথক অনুলিপি তৈরি করতেন। প্রখ্যাত সাহাবী হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত রাদি. কুরআন লেখার কাজে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন। এজন্য তাকে কাতিবুন নবী বা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রাইভেট সচিব বলা হতো। এছাড়াও ইসলামের প্রথম চার খলিফাসহ আরো অনেক সাহাবী ওহী লেখার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

মূলত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তিকালের পূর্বেই সম্পূর্ণ কুরআন লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। তবে তা একত্রিত করা হয় নি। তখন কুরআন লিপিবদ্ধকরা হত

[১২] মুয়জামুত তাবরানী, হাদীস-৪৮৮৯; মাজমাউয যাওয়াইদ, হাদীস-৬৮৪

খেজুরের ডাল, হাড়, কাঠফলক, চামড়া ও স্বচ্ছ পাথর ইত্যাদির ওপর। ঐ সময়ে এগুলোই ছিল লেখার উপকরণ।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদি. এর যুগে কুরআন সংকলন ও সংরক্ষণ

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদি.এর যুগে দু'টি কারণে সম্পূর্ণ কুরআনকে একত্র করা হয়েছিল। ১. রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যুগে চামড়া, হাড়, পাথরশিলা এবং গাছের পাতা ইত্যাদিতে কুরআন লিপিবদ্ধ করা হতো। কিন্তু সে লেখাগুলো পরিপূর্ণ কিতাব আকারে সংকলিত ছিল না। সাহাবীগণের ব্যক্তিগত পাণ্ডুলিপিও ছিল অপূর্ণাঙ্গ। ২. হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদি. এর আমলে আরবের কিছু গোত্র ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল। কেউ কেউ মিথ্যা নবী হওয়ারও দাবি করেছিল। এ সব মিথ্যুকদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ছিল মূসাইলামাহ্ আল কায্যাব। হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদি. তার বাহিনীর বিরুদ্ধে হযরত খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রাদি. এর নের্তৃত্বে বিরাট বাহিনী প্রেরণ করেন। ইয়ামামার ময়দানে তাদের সাথে যুদ্ধও হয় তখন। প্রচণ্ড যুদ্ধে মিথ্যুক মূসাইলামাহ্ পরাজিত ও নিহত হয়। এই যুদ্ধে অনেক মুসলমানও শাহাদাত বরণ করেন। কোনও কোনও বর্ণনা মতে সাত শতাধিক সাহাবী শহীদ হন। যাঁদের অনেকে হাফিযুল কুরআন ছিলেন। কোন কোন বর্ণনা মতে ৭০ জন হাফিযে কুরআন শহীদ হবার কথা বলা হয়েছে। বিশেষ করে যে চারজন সাহাবীর কাছ থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরআন তিলাওয়াত শেখার নির্দেশ দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে কুরআনের হাফিয হযরত সালিম রাদি. ছিলেন অন্যতম। তিনিও ইয়ামামার যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন।

হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত রাদি. বলেন, ইয়ামামার যুদ্ধের পরই হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদি. আমাকে জরুরী ভিত্তিতে আহ্বান করলেন। আমি তাঁর কাছে পৌঁছে হযরত ওমর রাদি.-কে সেখানে উপস্থিত দেখতে পেলাম। তিনি আমাকে বললেন, হে যায়েদ! আমাকে ওমর ইবনুল খাত্তাব এসে বললেন, ইয়ামামার যুদ্ধে অনেক হাফিযে কুরআন সাহাবী শাহাদাত বরণ করেছেন। এভাবে বিভিন্ন যুদ্ধে কুরআনের হাফিয শাহাদাত বরণ করলে কুরআনের কিছু অংশ হারিয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। বিশেষ করে হাফিয সালিম রাদি. এর মত কুরআনের অবিসংবাদিত কারীর মৃত্যুতে এ আশঙ্কা আরও তীব্র হয়ে ওঠে। সুতরাং আমি অপেক্ষা করছি আপনি আপনার খেলাফতের সময়ে জরুরী নির্দেশের মাধ্যমে কুরআনকে একত্রে সংকলনের ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।' আমি ওমরের এই প্রস্তাব শুনে তাকে বললাম, হে ওমর ইবনুল খাত্তাব! যে কাজ রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর জীবদ্দশায় করেন নি সে কাজ আমার জন্য করা সমীচীন হবে কিনা তা আমি ভেবে দেখছি। ওমর আমাকে বললেনঃ হে খলীফাতুল মুসলিমীন! আল্লাহর

শপথ! আপনি এ কাজ করুন। এ কাজ অতি উত্তম। ওমর রাদি. এই কথাটি বারবার বলতে লাগলেন। এরপর আমার অন্তরে সেই কাজের জন্য দৃঢ় প্রত্যয় সৃষ্টি হয়েছে।

যখন আবু বকরের অন্তরে সেই কাজ করার জন্য দৃঢ়তা সৃষ্টি হলো তখন তিনি আমাকে বললেন, হে যায়েদ! তুমি একজন তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন উদ্যমী যুবক। তোমার সততা সম্পর্কে আমাদের কোনও সন্দেহ নেই। তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে কুরআন লিপিবদ্ধকরণ কাজে নিয়োজিত ছিলে। তুমি বিভিন্ন সাহাবীর নিকট থেকে আয়াত এবং সূরাসমূহ একত্র করে লিপিবদ্ধ করতে থাকো।

তখন হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত রাদি. বয়সে ২১ বছরের একজন তরুণ। তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ তারা যদি আমাকে একটি পাহাড় স্থানান্তরিত করার নির্দেশ প্রদান করতেন তাতেও আমার কাছে এতটুকু কঠিন মনে হতো না যতটা কঠিন মনে হয়েছে পবিত্র কুরআন লিপিবদ্ধ করার কাজটিকে। এজন্য আমি তাকে বললাম, যে কাজ রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে করেন নি আপনি সে কাজ কীভাবে করতে চান? তিনি আমাকে উত্তর দিলেন, 'এ কাজ অতি উত্তম কাজ।' তিনি আমাকে বারবার এ কথা বলতে লাগলেন। এ কথা শুনে আমার হৃদয়ের মধ্যেও সে কাজ করার দৃঢ় প্রত্যয় সৃষ্টি হলো। আমি তৈরী হলাম সে কাজের জন্য। আমি খেজুরের ডাল, পাথরশিলা, চামড়া ও পশুর হাড় ইত্যাদিতে লিপিবদ্ধ আয়াতসমূহ একত্র করতে লাগলাম। সাহাবীগণের স্মৃতিতে সংরক্ষিত কুরআনের আয়াত ও সূরাসমূহ সংগ্রহ করলাম। সূরা তাওবার শেষ দুটি আয়াত পেলাম আবু খুযাইমা আল আনসারীর নিকট। তা নিয়ে এলাম। আমি সংগৃহীত আয়াত এবং সূরা যাচাই-বাছাই করে সেগুলো ধারাবাহিকভাবে লিখে পূর্ণ এক বছরে কুরআন সংকলনের কাজ শেষ করলাম। একত্রিত ও সংকলিত কুরআনের কপি হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদি. এর জীবদ্দশায় তাঁরই কাছে ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর হযরত ওমর রাদি. এর কাছে সংরক্ষিত ছিল।

হযরত ওমর রাদি. এর যুগে কুরআন সংকলন ও সংরক্ষণ

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদি. এর যুগে সূরাগুলো ধারাবাহিকভাবে বিন্যস্ত করে একত্র করা হয়। বিন্যস্ত করার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশনা অনুসরণ করা হয়। সমগ্র মুসলিম উম্মাহ এই বিষয়ে একমত যে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদি. এর আমলে সংকলিত কুরআন হলো সেটি যা জিবরাঈল আ. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে তাঁর জীবনের শেষ বছরে উপস্থাপন করেছিলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদি. এর যুগে সংকলিত কুরআনের কপি তাঁর জীবদ্দশায় তাঁরই কাছে ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর হযরত ওমর রাদি. এর কাছে সংরক্ষিত ছিল। তিনি কুরআনের উল্লেখযোগ্য কোনও কাজ করেন নি। তবে

হযরত যায়েত ইবনে সাবিত রাদি. এর সাথে কুরআন সংগ্রহ এবং বিভিন্ন কাজে তাঁকে সহযোগিতা করেছিলেন। হযরত ওমর রাদি. এর শাহাদাতের পর তা ছিল তাঁর কন্যা উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা রাদি. এর নিকট।

হযরত ওসমান রাদি. এর যুগে কুরআন সংকলন ও সংরক্ষণ

হযরত ওসমান রাদি. ইসলামের জন্য অনেক অবদান রেখে গেছেন। তাঁর সবচেয়ে বড় কীর্তি হল, তিনি কুরআন সংকলনে এক যুগান্তকারী ইতিহাস সৃষ্টি করে গেছেন। মূলত কুরআন সংকলনের কাজ শুরু হয়েছিল রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم-এর যুগে। তবে হযরত ওসমান রাদি. সর্বসাধারণের সুবিধার্থে কুরআনের সাত কিরাতকে এক কিরাতে রূপ দান করেছিলেন এবং এক কিরাতের উপর উম্মতকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। এজন্য হযরত ওসমান রাদি. কে কুরআনের সংকলক বলা হয়।

ইসলাম আরব ভূমির সীমানা পেরিয়ে ইতালি, ইরান ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। প্রত্যেকটি নতুন এলাকার লোক ইসলাম গ্রহণের পর মুসলমান মুজাহিদ ও বণিকদের নিকট থেকে তারা কুরআনের শিক্ষা গ্রহণ করতে শুরু করেন। কিন্তু একটা পর্যায়ে কুরআনের কিরাত পদ্ধতি নিয়ে বড় ধরনের সমস্যা দেখা দিল। আমরা জানি, মহান আল্লাহ সাতটি কিরাত পদ্ধতিতে কুরআন নাযিল করেছেন। কিন্তু ইতালি, ইরান ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের লোকেরা কুরআনের কিরাতের এই সাতটি পদ্ধতি সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে তাদের মধ্য থেকে কেউ এক পদ্ধতিতে কুরআন শিক্ষা গ্রহণ করলে অন্য কেউ ভিন্ন পদ্ধতিতে কুরআন তিলাওয়াত করলে সে ঐ পদ্ধতিকে ভুল পদ্ধতি বলে মন্তব্য করতো। এভাবে পরস্পরের মাঝে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হতে লাগল। একে অপরের সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ পর্যন্ত চলতে লাগলো। মানুষকে ভুল বোঝাবুঝি এবং পরস্পরের ঝগড়া থেকে রক্ষা করা ছিল খলিফাতুল মুসলিমিনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

এদিকে হযরত ওসমান রাদি. এর আমলে বিশিষ্ট সাহাবী হযরত হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান রাদি. সিরিয়া ও ইরাকি মুজাহিদদের সাথে আর্মেনিয়া ও আজারবাইজান বিজয়াভিযানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি সেখানকার মানুষের মধ্যে কুরআন পাঠের ভিন্নতা লক্ষ্য করলেন। এতে তিনি শঙ্কিত হয়ে পড়লেন। তিনি আরও পর্যবেক্ষণ করলেন, কেউ কেউ আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদি. এর অনুসরণে কুরআন তিলাওয়াত করে, আবার কেউ কেউ আবু মূসা আল-আশ'আরির রাদি. কিরাআত অনুসরণে কুরআন তিলাওয়াত করে। শুধু তাই নয়, একদল অন্যদলকে হেয় জ্ঞান করে। এই অবস্থা দেখে তিনি বললেন, 'আল্লাহর শপথ! আমি আমীরুল মুমিনীন হযরত ওসমান রাদি. রাদি. এর কাছে গিয়ে অনুরোধ করব তিনি যেন সবাইকে একই পঠনপদ্ধতিতে কুরআন তিলাওয়াতের

উপর একত্রিত করেন।' অভিযান শেষে মদীনায় এসে তিনি হযরত ওসমান রাদি.-কে বললেন, 'হে আমীরুল মুমিনীন! ইহুদি ও খৃস্টানদের মত নিজেদের কিতাবের ব্যাপারে মুসলিমগণ মতভেদ করার পূর্বেই আপনি এই উম্মাতকে সামলান।'

কিন্তু নতুন বিজীত এলাকার নব মুসলিমদেরকে কুরআন সম্পর্কে পরষ্পরের ভুল বুঝাবুঝি থেকে মুক্ত করে সঠিক পথে আনা কীভাবে সম্ভব? কেননা, তখন মদীনায় যায়েদ ইবনে সাবিত রাদি. এর কিরাতে লিপিবদ্ধ পাণ্ডুলিপি ছাড়া আর কোনো নির্ভরযোগ্য পাণ্ডুলিপি ছিল না। এজন্য তখন হযরত ওসমান রাদি. আনসার ও মুহাজিরদের থেকে বিশিষ্ট সাহাবীগণের সাথে পরামর্শ করে বিভিন্ন স্থানে সংরক্ষিত কুরআনের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করলেন। তিনি প্রথমে রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم-এর স্ত্রী হযরত হাফসা রাদি. নিকট সংরক্ষিত হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদি. কর্তৃক সংকলিত পাণ্ডুলিপিটি ফেরত পাঠাবার শর্তে সংগ্রহ করলেন। এরপর তিনি কুরআন সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ কয়েক সদস্যবিশিষ্ট একটি বোর্ড গঠন করলেন। উক্ত বোর্ডের সদস্য ছিলেন চারজন। ১. হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত, ২. আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর, ৩. সাঈদ ইবনুল আস এবং ৪. আবদুর রহমান ইবনে হারিস ইবনে হিশাম রাদি.। তিনি বোর্ডের সদস্যদেরকে নির্দেশ দিলেন 'তারা যেন হযরত হাফসা রাদি. থেকে সংগৃহীত পাণ্ডুলিপিকে এমন একটি লিখন পদ্ধতিতে লিপিবদ্ধ করে যার মাধ্যমে প্রত্যেকটি পাণ্ডুলিপিকে সঠিক পদ্ধতিতে তিলাওয়াত করা যায়। দায়িত্বপ্রাপ্ত বোর্ডের চারজন সাহাবীর মধ্যে হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত রাদি. ছিলেন মদীনার আনসার সাহাবী। অপর তিনজন সাহাবী ছিলেন মক্কার কুরাইশ বংশের। তিনি তাদেরকে আরও বললেন-

إِذَا اخْتَلَفْتُمْ أَنْتُمْ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَاكْتُبُوهُ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ، فَإِنَّمَا نَزَلَ بِلِسَانِهِمْ

যদি লিখনপদ্ধতি নিয়ে যায়েদ ইবনে সাবিতের সাথে তোমাদের মতবিরোধ দেখা দেয় তাহলে কুরাইশদের লিখনপদ্ধতি অনুসরণ করা হবে। কেননা তাদের ভাষায় কুরআন নাযিল হয়েছে।[১৩]

কুরআনের পাণ্ডুলিপি তৈরির জন্য প্রাথমিকভাবে এই চারজনকে দায়িত্ব দেওয়া হলেও পরবর্তিতে আরো অনেককেই এই কাজে যুক্ত করা হয়। হযরত ওসমান ইবনে আফফান রাদি. উল্লেখিত বোর্ডের সদস্যদের মাধ্যমে সাতটি পাণ্ডুলিপি তৈরি করান। এজন্য এগুলোকে 'মাসহাফে উসমানী' বলা হয়।

২৫ হিজরীতে কুরআন সংকলন বোর্ডের সদস্যগণ কাজ শুরু করেন। চার সদস্যের বোর্ডের সবাই হাফিযুল কুরআন হলেও তাঁরা উম্মুল মুমিনীন হযরত

[১৩] সুনানুত তিরমিযী, হাদীস-৩৪৮; আহকামুল কুরআন, ৪/৪৬৯

হাফসার রাদি. কাছ থেকে সংগৃহীত পাণ্ডুলিপির উপর ভিত্তি করে কুরআনের কয়েকটি অনুলিপি প্রস্তুত করলেন। কুরআনের কপি তৈরি করতে গিয়ে বোর্ডের সদস্যদের মধ্যে একটি মাত্র শব্দ নিয়ে মতভেদ দেখা দেয়। শব্দটি হলো সূরা বাকারার ২৩৪ নং আয়াতের (التَّابُوتُ) 'আত-তাবূত'। মদীনার আনসারদের উপভাষায় এটির পাঠ ছিল 'আত-তাবূহ' (التَّابُوه)। এ বিষয়ে তাঁরা হযরত ওসমান রাদি. এর কাছে নির্দেশনা চাইলেন। তিনি তাঁদেরকে (التَّابُوتُ) 'আত-তাবূত' লিখার নির্দেশ প্রদান করলেন।

বোর্ড কর্তৃক পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হওয়ার পর হযরত ওসমান রাদি. মূল কপি হযরত হাফসা রাদি. এর কাছে ফেরত পাঠালেন। এরপর তিনি উপস্থিত অসংখ্য সাহাবীগণের সম্মুখে তা পড়ে শোনানোর ব্যবস্থা করলেন। এভাবে উপস্থিত সাহাবীগণের পক্ষ থেকে নির্ভুল ঘোষিত হওয়ার পর তিনি বিভিন্ন মুসলিমরাষ্ট্রে কুরআনের পাণ্ডুলিপি প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত নেন। প্রতিটি পাণ্ডুলিপির সাথে কুরআনের ক্বারী সাহেবও প্রেরণ করলেন। কিন্তু তিনি কতটি পাণ্ডুলিপি তৈরি করেছিলেন তা নিয়ে মতভেদ আছে। কোনও বিবরণে চারটি, কোনও বিবরণে সাতটির কথা জানা যায়। আবার এক বিবরণে আটটির কথাও বলা হয়েছে। তিনি পাণ্ডুলিপিগুলোকে মক্কা, মদীনা, বসরা ও কূফায় এবং ইয়ামেন ও বাহরাইন এবং সিরিয়ায় প্রেরণ করেন। অষ্টম পাণ্ডুলিপিটি তিনি নিজের কাছেই সংরক্ষণ করে রেখেছিলেন।[১৪]

হযরত ওসমান রাদি. কুরআনের যে পাণ্ডুলিপি সিরিয়াতে প্রেরণ করেছিলেন সেটি প্রথমে সিরিয়ার তাবরিয়া শহরে সংরক্ষণ করা হয়। তারপর ৫১৮ হিজরীতে দামেস্কের জামে মসজিদের প্রাচীর পরিবেষ্টিত কক্ষের পূর্বাংশে সংরক্ষণ করা হয়েছিল। আল্লামা ইমাদ উদ্দীন ইবনে কাসীর রাহি. বলেন, আমি সেই পাণ্ডুলিপি দেখার সৌভাগ্য লাভ করেছি। আমি দেখেছি এই পাণ্ডুলিপির কলেবর বিপুল। এর হস্তাক্ষর সুস্পষ্ট, সুখপাঠ্য ও সুন্দর দীর্ঘস্থায়ী রংয়ের কালিতে লিখিত। এর পাতাগুলো সম্ভবত উটের চামড়ার।

হযরত ওসমান রাদি. নিজ ঘরে বসে কুরআন তিলাওয়াত করছিলেন। তিনি যখন পড়ছিলেন-

فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

এটি সূরা বাকারার ১৩৭ নং আয়াতের শেষাংশ। তিনি তাঁর ডান দিয়ে কুরআনের পাতা স্পর্শ করে তিলাওয়াত করার সময় মিসরীয় বিদ্রোহীরা তাঁর

[১৪] আহকামুল কুরআন, ৪/৪৬৯; আল-ইতকান; ইবনে কাসীর, ই.ফা অনূদিত ও প্রকাশিত

ডান হাতের মধ্যে সর্বপ্রথম আঘাত করে। তিনি হাত টেনে নেবার সময় বলছিলেন 'আল্লাহর কসম এই হাত সর্বপ্রথম কুরআনে মাজীদ পূর্ণাঙ্গভাবে লিপিবদ্ধ করে গ্রন্থাকারে মুসলিমদের সামনে উপস্থাপন করেছে।'

কুরআনের সেবক ইসলামের সোনালি মনিষীকে ৩৫ হিজরীর ১৮ যিলহজ শুক্রবার আসরের নামাজের পর মিসরীয় বিদ্রোহীরা তাঁর ঘরে প্রবেশ করে কুরআন তিলাওয়াতরত অবস্থায় তাঁকে শহীদ করেন। তখন তিঁনি রোযা অবস্থায় ছিলেন।[১৫]

৬১০ ঈসায়ী সনের ১০ই আগস্ট সোমবার কুরআন নাযিল শুরু হয়। এরপর থেকে হিফয এবং হাতে লেখার মাধ্যমে কুরআন সংরক্ষণ করার কাজ শুরু হয়। এভাবে চলতে থাকে ১১১৩ হিজরী পর্যন্ত। ১১১৩ হিজরীর শেষের দিকে জার্মানির হামবুর্গ প্রেস থেকে সর্বপ্রথম ছাপার কাজ শুরু হয়। এর একটি কপি আজও মিশরের 'দারুল কুতুব আল-মিশরিয়া'তে সংরক্ষিত আছে।[১৬]

কুরআনের কিছু বৈশিষ্ট্য:

১. আল-কুরআনে নির্ভুলতার চ্যালেঞ্জ: পৃথিবীতে এমন কোনো বই-পুস্তক আজও রচিত হয় নি যার মধ্যে নির্ভুলতার চ্যালেঞ্জ দেওয়া হয়েছে। একমাত্র আল-কুরআনের মধ্যেই নির্ভুলতার চ্যালেঞ্জ দেওয়া হয়েছে। আরও বলা হয়েছে যদি তোমরা সক্ষম হও তবে এর মতো একটি কিতাব রচনা করে নিয়ে এসো। মহান আল্লাহ বলেন-

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

এটি একটি কিতাব। এর মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই। এটি হিদায়াত তাকওয়া অবলম্বনকারীদের জন্য।[১৭]

২. কুরআনে রয়েছে অতীতের সঠিক ইতিহাসের বর্ণনা: মহান আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা কুরআনের মধ্যে অতীতের পঁচিশজন[১৮] নবী-রাসুলের আলোচনা করেছেন। আদম আ. সম্পর্কে বলেন-

وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ

[১৫] বিস্তারিতঃ ইবনে কাসীর, ই.ফা অনূদিত ও প্রকাশিত; আল্লামা তকি উসমানি দা.বা. রচিত 'উলূমুল কুরআন ও উসূলুত তাফসীর' দ্র.

[১৬] ড. সুবহী সালেহ লিখিতঃ উলূমুল কুরআন

[১৭] সূরা বাকারা, আয়াত-২

[১৮]. আদম, ইদ্রিস, নূহ, হুদ, সালিহ, লুত, ইবরাহিম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব, ইউসূফ, আইয়ূব, শুয়াইব, মূসা, হারুন, ইউনুস, দাউদ, সুলাইমান, ইলয়াস, ইলয়াসা, যুলকিফল, যাকারিয়া, ইয়াহইয়া, ঈসা এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহিমুস সালাম।

হে আদম! আপনি ও আপনার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করুন।[১৯]

ঈসা আ. সম্পর্কে বলেন-

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ

আর স্মরণ করুন সেই সময়কে যখন ঈসা ইবনে মারইয়াম বলেছিল, হে বনী ইসরাঈল! আমি তোমাদের নিকট আল্লাহর রাসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছি।[২০]

৩. কুরআনের ভবিষ্যৎবাণী সঠিক এবং বাস্তব: কুরআনের বিভিন্ন স্থানে মহান আল্লাহ অনেক ভবিষ্যৎবাণী করেছেন। যেগুলো পরবর্তীতে বাস্তবে পরিণত হয়েছে। আমরা একটি উদাহরণ তুলে ধরছি। মহান আল্লাহ বলেন-

غُلِبَتِ الرُّومُ• فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ• فِي بِضْعِ سِنِينَ

আলিফ লাম মীম, রোমকগণ (ইতালিরা) পরাজিত হয়েছে নিকটবর্তী অঞ্চলে। কিন্তু তারা তাদের পরাজয়ের পর অচিরেই বিজয় অর্জন করবে কয়েক বছরের মধ্যেই।[২১]

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময়ে পৃথিবীতে দুটি পরাশক্তি ছিল। ইরানি এবং রোমক (ইতালি)। ইরানিরা ছিল অগ্নিপূজারী। তারা আসমানি কিতাবসমূহ অবিশ্বাস করতো। আরবের মুশরিকরা ছিল মূর্তিপূজারী। তারাও আসমানি কিতাব অবিশ্বাস করতো। ফলে আসমানি কিতাব অবিশ্বাসের দিক থেকে আরবের মূর্তিপূজারী এবং ইরানের অগ্নিপূজারীদের মধ্যে চমৎকার মিল ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং সাহাবারা ছিলেন আসমানি কিতাবের বিশ্বাসী এবং ইতালিরাও ছিল আসমানি কিতাবের বিশ্বাসী। আসমানি কিতাবের বিশ্বাসের দিক থেকে তাদের মধ্যে ছিল দারুন মিল। ৬১৫ খৃস্টাব্দে ইরানি সম্রাট খসরুর সেনাবাহিনীর হাতে ইতালির সম্রাট হেরাক্লিয়াসের বাহিনী চরমভাবে পরাজিত হয়। এ যুদ্ধে ইতালির রোম সম্রাট তার গোটা এলাকা হারিয়ে কনস্টান্টিনোপলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। এ যুদ্ধে রোম শক্তি এতটাই বিপর্যস্ত ছিল যে তারা সাফল্যের আশা হারিয়ে ফেলে। আরবের মূর্তিপূজারীরা এই সংবাদ শোনে মুসলিমদেরকে বলত, দেখো ইতালিতে আসমানি কিতাবের বিশ্বাসীরা পরাজয় বরণ করেছে। একদিন তোমরাও আমাদের হাতে পরাজয় বরণ করবে। তাদের এমন মন্তব্যের কারণে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদি. রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বিষয়টি অবহিত করলেন। তখন মহান আল্লাহ ওহীর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বিষয়টি জানিয়ে দিলেন। অবশেষে দেখা গেল ৬২৪ খৃস্টাব্দে রোমান শক্তি পুনর্গঠিত

[১৯] সূরা আরাফ, আয়াত-১৯

[২০] সূরা সফ্ফ, আয়াত-৬

[২১] সূরা রোম, আয়াত-২, ৩ ও ৪

হয়ে ইরানিদের কাছ থেকে শুধু তাদের হারানো এলাকা উদ্ধার করে নি বরং তারা ইরানের মূল ভূ-খন্ড পর্যন্ত দখল করে নেয়। তাহলে কুরআনের ভবিষ্যত বানী যে সত্য তা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো।

৪. কুরআন ন্যায় বিচারের নির্দেশ প্রদান করে: মহান আল্লাহ বলেন-

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى

নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায় বিচার, দয়া এবং আত্মীয়-স্বজনের অধিকার আদায়ের নির্দেশ প্রদান করেন।[২২]

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন-

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا•

(হে নবী!) আপনার প্রতিপালকের শপথ! তারা ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না নিজেদের পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদের ক্ষেত্রে আপনাকে বিচারক মানে, তারপর আপনি যে রায় দেন সে ব্যাপারে নিজেদের অন্তরে কোনরূপ কুণ্ঠাবোধ না করে এবং অবনত মস্তকে তা গ্রহণ করে নেয়।[২৩]

৫. কুরআন হক-বাতিল ও ভালো-মন্দ নির্ণয়ের মানদণ্ড: মহান আল্লাহ বলেন-

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ •

রমযান মাস। যে মাসে কুরআন নাযিল করা হয়েছে। যা আদ্যোপান্ত হিদায়াত এবং সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী সম্বলিত, যা সঠিক পথ দেখায় এবং সত্য ও মিথ্যার মধ্যে চূড়ান্ত ফায়সালা করে দেয়।[২৪]

৬. সর্বকালের সর্বোচ্চ মানের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের ভান্ডার আল-কুরআন: মহান আল্লাহ মানব এবং জ্বীন জাতিকে লক্ষ্য করে বলেন-

قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا

বলুন, যদি মানুষ ও জ্বীন এ কুরআনের অনুরূপ হাজির করার জন্য একত্র হয়, তবুও তারা এর অনুরূপ হাজির করতে পারবে না। যদিও তারা একে অপরের সাহায্যকারী হয়।[২৫]

[২২] সূরা নাহল, আয়াত-৯০

[২৩] সূরা নিসা, আয়াত-৬৫

[২৪] সূরা বাকারা, আয়াত-১৮৫

[২৫] সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত-৮৮

কুরআনের সাহিত্যকে প্রমাণ করার জন্য প্রিয়নবী ﷺ একটি অভিনব পন্থা গ্রহণ করলেন। তিনি সাহাবায়ে কিরামকে নির্দেশ দিলেন 'সূরায়ে কাউছারের' প্রথম আয়াত লিখে কাবা ঘরের দেওয়ালে ঝুলিয়ে রাখার জন্য। তৎকালীন প্রথিতযশা কবি-সাহিত্যিক এবং জ্ঞানী-গুণীদেরকে ঐ আয়াতের বর্ণনা ভঙ্গি, ভাষাশৈলী, অনন্য রচনানীতি এবং সমিল ছন্দের ন্যায় আরেকটি আয়াত রচনা করার জন্য আহবান জানালেন। আরবের সেরা কবি সাহিত্যিকগণ তাঁর এ ডাকে সাড়া দিয়ে শত চেষ্টা করেও ঐ আয়াতের ন্যায় একটি আয়াত রচনা করতে সামর্থ হয় নি, ফলে তারা জোটবদ্ধভাবে পরাজয় বরণের কথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়। অবশেষে তখনকার যুগের শ্রেষ্ঠ কবি 'লাবিদ ইবনে রাবিয়াহ' উক্ত আয়াতটির সাথে মিল রেখে একটি ছোট বাক্য লিখে দিলেন-

لَيْسَ هٰذَا كَلَامُ الْبَشَرِ

অর্থাৎ 'এটা কোন মানব রচিত গ্রন্থ নয়।' সাথে সাথে ঐ ছন্দের মাধ্যমেই তাদের পরাজয় বরণের ঘোষণাটি আরো প্রস্ফুটিত হয়ে উঠে। মোটকথা, কুরআনের অসাধারণ বর্ণনা ভঙ্গি, ভাষাশৈলী, অনন্য রচনানীতি এবং বিষয়বস্তুর মৌলিকত্ব ও গভীরতার কারণেই কুরআন ও কুরআনের বাহক নবী ﷺ-এর বিরুদ্ধে জান-মাল এবং ইজ্জত-আবরু সবকিছু ব্যয় করার জন্য তারা প্রস্তুত থাকা সত্ত্বেও কুরআনের এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে একটি আয়াতও রচনা করতে কারও সাহস হয় নি। আরবের সেরা কবি ইমরুল কায়েস বলল: 'কুরআনের সামনে আমার কবিতা চলবে না।' সে কবিতা লেখা বন্ধ করে দিল।

৭. কুরআনে অপ্রয়োজনীয় একটি শব্দও নেই: মহান আল্লাহ বলেন-

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى • إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحٰى •

তিঁনি নিজের খেয়াল-খুশি মতো কিছু বলেন না। তিঁনি যা বলেন তা বিশুদ্ধ ওহী, যা তাঁর কাছে প্রেরণ করা হয়।[২৬]

৮. কুরআনের আলোচনার মধ্যে কোন সীমাবদ্ধতা নেই: প্রত্যেক মানুষের চিন্তা-চেতনা, কথা, ও কাজ-কর্মের মধ্যে সীমাবদ্ধতা থাকে। কিন্তু কুরআনের আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধতা নেই। যে যত গবেষণা করবে সে ততো জ্ঞানের সাগর থেকে মণি-মুক্তা সংগ্রহ করতে পারবে। কুরআনের আলোচনা করে কেউ শেষ করতে পারবে না। মহান আল্লাহ বলেন-

وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ •

[২৬] সূরা নাজম, আয়াত-৩,৪

পৃথিবীতে যত বৃক্ষ আছে তা যদি কলম হয়ে যায় এবং এই যে সাগর, এর সাথে যদি এ ছাড়া আরও সাত সাগর একত্রিত হয়ে যায় (এবং তা কালি হয়ে আল্লাহর গুণাবলি লিখতে শুরু করে) তবুও আল্লাহর কথা শেষ হবে না। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমতারও মালিক, হিকমতেরও মালিক।[২৭]

৯. একটি আয়াত আরেকটি আয়াতের সাথে সাংঘর্ষিক নয়: আমাদের আদালতে, হাইকোর্টে একজন আইনজীবি যা বলেন আরেকজন আইনজীবি তার বিপরীত বলতে থাকেন। অথচ তেইশ বছরে নাযিল হওয়া কুরআনের একটি আয়াতের বিধান আরেকটি আয়াতের বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক হয় না। যদি কুরআন মানব রচিত হতো তাহলে একটি বিধান আরেকটি বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক হতো। মহান আল্লাহ বলেন-

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا•

তারা কি কুরআন সম্বন্ধে গবেষণা করে না, এটা যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো পক্ষ থেকে হতো তাহলে তারা এর মধ্যে অনেক অসঙ্গতি (সাংঘর্ষিক) পেত।[২৮]

১০. আল্লাহর কুরআন হিদায়াতের চূড়ান্ত ঠিকানা: মহান আল্লাহ বলেন-

ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ

এটি আল্লাহর হিদায়াত, যার মাধ্যমে তিনি যাকে চান তাকে হিদায়াত দান করেন। আর আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে হিদায়াতে কেউ আনতে পারে না।[২৯]

১১. আল্লাহকে পাবার সুদৃঢ় ব্যবস্থা আল কুরআন: মহান আল্লাহ বলেন-

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

তোমরা আল্লাহর রশিকে সুদৃঢ়ভাবে ধরে রাখো এবং পরষ্পরে বিভেদ করো না।[৩০]

১২. আলকুরআন সঠিক জ্ঞানগর্ভমূলক উপদেশ: মহান আল্লাহ বলেন-

ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ

ছোয়াদ! কসম উপদেশপূর্ণ কুরআনের।[৩১]

১৩. আলকুরআন জান্নাতের সরল সঠিক পথ: মহান আল্লাহ বলেন-

[২৭] সূরা লুকমান, আয়াত-২৭
[২৮] সূরা লুকমান, আয়াত-২৭
[২৯] সূরা যুমার, আয়াত-২৭
[৩০] সূরা আলে-ইমরান, আয়াত-১০৩
[৩১] সূরা ছোয়াদ, আয়াত-১

وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

(হে নবী! আপনি তাদেরকে বলুন) এটি (কুরআন) আমার সরল সঠিক পথ। তোমরা এর অনুসরণ কর, অন্য কোনও পথের অনুসরণ করো না। অন্যথায় তা তোমাদেরকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে।[৩২]

১৪. আল কুরআন মানুষকে কুপ্রবৃত্তি থেকে বাঁধা দেয়: মহান আল্লাহ বলেন-

فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا

তোমরা কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করো না, যা তোমাদের ইনসাফ প্রতিষ্ঠায় বাঁধা হয়।[৩৩]

১৫. কুরআন দ্বীনের উপর অবিচল থাকার পথ দেখায়: মহান আল্লাহ বলেন-

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

নিশ্চয় যারা বলেছে, 'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ' এবং এতে অবিচল থেকেছে, তাদের কোনও ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।[৩৪]

১৬. পৃথিবীতে সর্বাধিক পঠিত কিতাব আল-কুরআন: কুরআন ছাড়া অন্যান্য গ্রন্থ কোনো যুগে বা বিশেষ সময়ে মানুষের কাছে কিছু সময়ের জন্য সমাদৃত হলেও কুরআনের মতো এতো অধিক পঠিত আর কোনো গ্রন্থ নেই। এমনকি অন্যান্য আসমানি গ্রন্থও নয়। এজন্য কুরআনকে যে সব কারণে কুরআন বলা হয় এর মধ্যে এটিও একটি কারণ যে এটি সর্বাধিক পঠিত।

১৭. কুরআন মুখস্তকারীর সংখ্যা অগণিত: এটি হচ্ছে পবিত্র কুরআনের আরো একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই পৃথিবীতে যে সব বই-পুস্তক মুখস্ত করা হয় তা খুবই অল্প এবং মুখস্তকারীর সংখ্যাও উল্লেখ করার মতো নয়। আবার যারা মুখস্ত করে তারা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শোনাতে পারে না। যেমন আমাদের বাংলাদেশের সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভূক্ত বাংলা সাহিত্যের বইয়ে পল্লীকবি জসিম উদ্দীনের 'কবর' কবিতা মুখস্তকারীর সন্ধান সাধারণত মেলে না। যদি কেউ মুখস্ত করেও থাকে তাহলে সে পুরোটা শোনাবার সাহস করে না, কেউ শোনালেও ভুল থাকে। অথচ কবিতাটি মাত্র ১১৮ লাইন। কিন্তু এই পৃথিবীতে পূর্ণ কুরআনকে মুখস্ত করেছে এমন মানুষের সংখ্যা অনেক। মহান আল্লাহ ছাড়া কেউ তাদের সঠিক সংখ্যা বলতে পারবে না। অথচ

[৩২] সূরা আনয়াম, আয়াত-১৫৩

[৩৩] সূরা নিসা, আয়াত-১৩৫

[৩৪] সূরা আহকাফ, আয়াত-১৩

স্বাভাবিক কবিতার হিসেবে কুরআনের লাইন সংখ্যা হচ্ছে ৯,০০০ এর চেয়েও বেশি। এই পুরো কুরআনে রয়েছে ৩০ টি পারা, ৭টি মনজিল, ১১৪টি সুরা। এখানে আরও ভাববার মতো বিষয় হচ্ছে, এই সুবিশাল কিতাব যারা মুখস্ত করেছে তাদের অধিকাংশই শিশু–কিশোর।

১৮. উত্তম বিচারব্যবস্থা পেশ করেছে আল-কুরআন: বর্তমান পৃথিবীতে অনেক বিচার ব্যবস্থা রয়েছে। কোনও বিচারব্যবস্থাই মানুষকে কাঙ্ক্ষিত শান্তি ও নিরাপত্তা দিতে পারে নি। শান্তি প্রতিষ্ঠার নামে অশান্তির আগুন ধরিয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আগমনের পূর্বে সমাজের প্রভাবশালীরা দুর্বলদের উপর জুলুম করত। তিনি এসে ইসলামের বিচার ব্যবস্থা চালু করে সেই জুলুম দূর করেছেন। আল কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে ইসলামের বিচার ব্যবস্থার কথা আলোচনা করা হয়েছে। ইসলামের বিচার ব্যবস্থার বিপরীতে অন্য বিচার ব্যবস্থার ভয়াবহ পরিণামের কথা সূরা মায়েদার ৪৪, ৪৫ এবং ৪৭ নং আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে।

১৯. ধর্ম-বর্ণের উর্ধ্বে সকল মানুষের অধিকার ঘোষণা করছে আল কুরআন: এ কথাটি বলার আগে আমার ক্ষুদ্র জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা বলছি। আমি ঢাকার একটি মসজিদে ইমাম-খতিবের দায়িত্ব পালন করেছি আট বছর। একদিন এক অফিসার জুমার আলোচনার পর আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, খতিব সাহেব! আপনারা কুরআনের যে শাসন প্রতিষ্ঠার কথা বলেন সে শাসন এ দেশে প্রতিষ্ঠা করা কি যুক্তিসঙ্গত? আমি বললাম, অযৌক্তিক হবে কেন? তিনি বললেন, এদেশে মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খৃস্টানসহ অনেক ধর্মের মানুষ বাস করেন। সুতরাং মুসলিমদের ধর্মগ্রন্থ দিয়ে সব ধর্মের মানুষের উপর শাসন প্রতিষ্ঠার কথা অযৌক্তিক। আমি অবাক হলাম। এতো শিক্ষিত মানুষ এমন কথা কীভাবে বলতে পারেন। আমি বললাম, মায়ের চেয়ে মাসীর বেশি দরদ কখনোই ভালো নয়। আপনার ভালো করে বুঝা উচিত, সকল মানুষের স্রষ্টা একজন। মানুষ নিজ স্বার্থে বিভিন্ন ধর্ম পালন শুরু করেছে। মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ খৃস্টানসহ সকল ধর্মের মানুষকে এক স্রষ্টা সৃষ্টি করেছেন। তিনি জানেন মানুষের জন্য কোন আইন বেশি কল্যাণকর। যা সকল মানুষের জন কল্যাণকর তিনি তা আরোপ করেছেন। একই অন্যায় এবং অপরাধের শাস্তি মুসলিমের জন্য যেমন অমুসলিমের জন্যও তেমন। এখানে কোনও দলীয়করণ নেই। আপনি যে কোনো নির্ভরযোগ্য ইতিহাস পাঠ করলে জানতে পারবেন যে, যে দেশে মুসলিম শাসন ব্যবস্থা ছিল সেখানে কোনো অমুসলিম ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত হয় নি। বরং যেখানেই ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ এবং অন্যান্য শাসন ব্যবস্থা আছে সেখানেই কোনো এক জাতির উপর বিভিন্নভাবে জুলুম চলছে। আমার যুক্তিসঙ্গত সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শোনে কিছুটা সম্মতি জ্ঞাপন করে বিদায় নিলেন ভদ্রলোক।

২০. আল কুরআন বিজ্ঞানের সঠিক ও ভুল তথ্য নির্ণয়ের মাপকাঠি: কুরআনের অনেক আয়াতে বৈজ্ঞানিক তথ্য রয়েছে। এ সব তথ্য আধুনিক বৈজ্ঞানিক তথ্যের সাথে অমিল নয়। যেখানে অমিল দেখা দিবে সেখানে বৈজ্ঞানিক তথ্যেরই ভুল। কারণ হচ্ছে, আমরা কয়েক শতাব্দির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে নিশ্চিত করে বলতে পারি যে, মানবরচিত বৈজ্ঞানিক তথ্য সময়ের ব্যবধানে ভুল প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু আলকুরআনের তথ্য বরাবরের মতো সত্য প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং বৈজ্ঞানিক যে সব তথ্য কুরআনের তথ্যের সাথে মিলবে তা সঠিক। আর যে সব তথ্য মিলবে না সে সব তথ্য ভুল। বিস্তারিত জানতে: ড. মরিস বুকাইলির রচিত 'কুরআন, বাইবেল ও বিজ্ঞান' বইটি পড়তে পারেন।

২১. পুরো কুরআন কাব্য ও গদ্যের অপূর্ব সমাহার: কুরআনের তেলাওয়াত কত সুমধুর! কুরআনের কোনো আয়াত গদ্যের মতো আবার কোনটা কবিতার মতো। যেমন, সূরা শামস, নাজম, তীন, রহমান ইত্যাদি।

২২. কুরআন তার অনুসারীদের আকৃষ্ট করে: এ বিষয়ে কিছু বলার প্রয়োজন নেই। কারণ, কুরআনের আকর্ষণের কথা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট। যেমন, হযরত ওমর রাদি. এবং তাঁর বোন ও ভগ্নিপতির ইতিহাস। হযরত বিলাল রাদি. এর ইতিহাস। হযরত সুমাইয়া রাদি. এর ইতিহাসসহ এমন হাজারও ইতিহাস আমাদের জানা আছে। বর্তমান আধুনিক ইউরোপে অনেক অমুসলিমরাই ইসলাম গ্রহণ করছে কুরআনের আকর্ষণে।

কুরআনের আলোচ্য বিষয়

প্রিয় হাফিয! আজ আমি আপনাকে কুরআনের আলোচ্য বিষয়ের সাথে পরিচয় করাবো। মহান আল্লাহ তাঁর কুরআনে কী কী বিষয়ে আলোচনা করেছেন তা জানাবো। গুরুত্বসহকারে কথাগুলো বুঝতে হবে। হৃদয় দিয়ে অনুধাবন করার চেষ্টা করতে হবে। গেথে রাখতে হবে অন্তরের গভীরে। কারণ হচ্ছে, কুরআন ও কুরআনের আলোচ্য বিষয়কে নিজে নিজে বুঝতে হলে দু'টি জিনিসের প্রয়োজন হয়। এক. কুরআনের জ্ঞানে উচ্চ যোগ্যতা সম্পন্ন হওয়া । দুই. দীর্ঘ সময় নিয়ে তা গভীরভাবে ভাবতে থাকা। অথচ আমাদের দেশে শতকরা প্রায় ৯৫ জন হাফিয সাহেবদের ক্ষেত্রে উল্লেখিত দু'টি জিনিস একসাথে পাওয়া যায় না। অথচ কুরআনের আলোচ্য বিষয় এবং একজন হাফিযের প্রতি কুরআনের দাবিগুলো কী কী তা না জানলে, না বুঝলে এবং পালন না করলে একজন হাফিযের জীবনে পূর্ণ সার্থকতা এবং সফলতা আসে না। সুতরাং একজন হাফিযের অমূল্য সম্পদ জীবনকে সার্থক এবং সফল করার জন্য অবশ্যই কুরআনের আলোচ্য বিষয় এবং একজন হাফিযের প্রতি কুরআনের দাবি গুলো কী কী তা জানা আবশ্যক। এজন্য কুরআনের আলোচ্য বিষয়কে ভালোভাবে

জেনে, বুঝে মুখস্থ করা উচিত। এর দ্বারা একজন হাফিযের প্রতি কুরআনের দাবিগুলো কী কী তা বুঝা সহজ হবে বলে আশা করি। আমরা কুরআনের এই বইয়ের শেষের দিকে হাফিযের প্রতি কুরআনের দাবিগুলো উপস্থাপন করবো।
কুরআনের আলোচ্য বিষয় কতটি তা কুরআন-হাদীসের কোথাও উল্লেখ নেই। কুরআনের গবেষকগণ দীর্ঘ দিন কুরআন গবেষণার পর কেউ তিনটি আলোচ্য বিষয় উল্লেখ করেছেন। কেউ এর চেয়ে বেশি উল্লেখ করেছেন। আমরা সাম্প্রতিককালের কয়েকজনের কথা উল্লেখ করে সমন্বিত আলোচ্য বিষয় উল্লেখ করব।

প্রখ্যাত মুফাসসির আল্লামা আহমদ আলী লাহুরী রাহি. বলেন: কুরআনের আলোচ্য বিষয় তিনটি। যথা-

১. আকাঈদ বা অন্তরের বিশ্বাস। (তাওহীদ, রিসালাত ও পরকাল)।
২. ইবাদাত বা সবধরণের আমল।
৩. মুয়ামালাত বা আচার-আচরণ, লেনদেন, উঠা-বসা ইত্যাদি।

আল্লামা মুফতি তাকি ওসমানি (দাঃবাঃ) বলেন: আলোচ্য বিষয় চারটি। যথা-

১. আকাঈদ বা অন্তরের বিশ্বাস। ২. আহকাম বা আইন-কানুন।
৩. কাসাস বা বিভিন্ন ধরনের ঘটনা। ৪. মিছাল বা উপমা-উদাহরণ।

বাংলাদেশের 'গবেষণামূলক উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান 'মারকাযুদ দাওয়া আলইসলামিয়া ঢাকা' এর মুখপত্র মাসিক আলকাউসার এর 'কুরআনুল কারীম সংখ্যা'র মধ্যে 'কুরআনের পরিচয় কুরআনের ভাষায়' কলামে শায়খুল হাদীস আবুল বাশার মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম (দাঃবাঃ) লিখেছেন: কুরআন মাজীদের মূল আলোচ্য বিষয় চারটি। যথা-

১. আকাঈদ। ২. আহকাম। ৩. আখলাক। ৪. মাওয়াইজ। (ওয়াজ-নসীহত)।

উল্লেখিত আলোচ্য বিষয়কে সমন্বিত করে অনেকে এভাবে উপস্থান করেন-

১. আকাঈদ: অন্তরের বিশ্বাস, যেমন- তাওহীদ, রিসালাত ও পরকাল ইত্যাদি।
২. আহকাম: ইবাদাত ও মুয়ামালাত, মুয়াশিরাত, বিধি-বিধান ইত্যাদি।
৩. কাসাস ও মাওয়াইয: ঘটনা ও ওয়াজ-নসীহত, আখলাক ইত্যাদি।
৪. মিছাল: উপমা-উদাহরণ।

উপরে কুরআনের চারটি আলোচ্য বিষয়ের শিরোনাম আলোচনা করা হয়েছে। এখন চারটি আলোচ্য বিষয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিয়ে আলোচনা করা হবে।

কুরআনের প্রথম আলোচ্য বিষয়

আকাঈদ: অন্তরের বিশ্বাস। যেমন- তাওহীদ, রিসালাত ও পরকাল ইত্যাদি।

আকাইদ শব্দটি আকিদা শব্দের বহুবচন। এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে- বন্ধন করা, চুক্তি করা, গিরা দেওয়া, শক্ত হওয়া, ধর্মের সুদৃঢ় বিশ্বাস ইত্যাদি। আকিদা শব্দের পারিভাষিক অর্থ-'আল-মু'জামুল ওয়াসীত' গ্রন্থে বলা হয়েছে -

اَلْعَقِيْدَةُ: اَلْحُكْمُ الَّذِىْ لَا يَقْبَلُ الشَّكَّ فِيْهِ لَدَى مُعْتَقِدِهِ ؛ وَ(فِى الدِّيْنِ) مَا يُقْصَدُ بِهِ الْاِعْتِقَادُ دُوْنَ الْعَمَلِ

আকিদা অর্থ এমন বিধান বা নির্দেশ যা বিশ্বাসী ব্যক্তির বিশ্বাসের মধ্যে কোনো ধরণের সন্দেহের অবকাশ রাখে না। ধর্মীয় ক্ষেত্রে বিশ্বাসকে অন্তর্ভুক্ত করে, তা আমল বা কর্ম থেকে পৃথক।

কুরআনের মধ্যে মৌলিকভাবে তিন ধরণের আকিদার কথা আলোচনা করা হয়েছে।

এক. তাওহীদ সম্পর্কে আকিদা: ঈমানের ছয় রুকনের আলোচনায় আসবে।
দুই. রিসালাত সম্পর্কে আকিদা: ঈমানের ছয় রুকনের আলোচনায় আসবে।
তিন. আখিরাত সম্পর্কে আকিদা: ঈমানের ছয় রুকনের আলোচনায় আসবে।

কুরআনের দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয়

আহকাম: ইবাদাত ও মুয়ামালাত, মুয়াশিরাত, বিধি-বিধান ইত্যাদি।

আহকাম শব্দটি হুকম (حُكْمٌ) শব্দের বহুবচন। এর শাব্দিক অর্থ- হুকুম, আদেশ, নির্দেশ, আজ্ঞা, রায়, নীতি, বিধান, আইন ইত্যাদি। এর পারিভাষিক অর্থের ব্যাপারে সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'লিসানুল আরব' এর মধ্যে বলা হয়েছে–

اَلْحُكْمُ : اَلْقَضَاءُ بِالْعَدْلِ

হুকুম বলা হয়, ন্যায়সঙ্গত সিদ্ধান্তের নির্দেশ প্রদান করা।
আশরাফুল হিদায়াতে বলা হয়েছে-

هُوَ خِطَابُ اللهِ تَعَالى اَلْمُتَعَلِّقُ بِاَفْعَالِ الْمُكَلَّفِيْنَ

আল্লাহর সেই সম্বোধন যা উপযুক্ত মানুষের উপর কর্মের সাথে সম্পর্কিত হয়।
বাগদাদের দারুল কুতুব থেকে প্রকাশিত ‘মুয়জামু মুস্তালাহাতিল ফিকহি ওয়া আলফাযিহি’ কিতাবের ২৬৩ নং পৃ. বলা হয়েছে-

هُوَ التَّشْرِيْعُ الصَّادِرُ مِنَ اللهِ تَعَالى لِتَنْظِيْمِ حَيَاةِ الإِنْسَانِ

হুকুম হলো: মানুষের জীবন ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার জন্য মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে আরোপিত বিধি-বিধান।

ইবাদাত,মুয়ামালাত ও মুয়াশিরাত: এ সম্পর্কে হাফিযের প্রতি কুরআনের ৯ নং দাবির মধ্যে আলোচনা আসবে।

কুরআনের মধ্যে তিন ধরণের আহকাম বর্ণনা করা হয়েছে।

এক. মহান আল্লাহর হক সম্পর্কিত আহকাম বা বিধি-বিধান।

পরিচয়: মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন আহকাম বা বিধি-বিধান যা শুধু তাঁর হকের সাথে সম্পর্কিত, অন্য কোনো মানুষের হকের সাথে তার সম্পর্ক নেই। এমন আহকামকে ইবাদাতও বলা হয়। যেমন, পবিত্রতা, নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত ও কুরবানি ইত্যাদি।

দুই. মানুষের হক সম্পর্কিত আহকাম বা বিধি-বিধান।

পরিচয়: এমন আহকাম বা বিধি-বিধান যা শুধু মানুষের হকের সাথে সম্পর্কিত। এগুলোকে মুয়ামালাত ও মুয়াশিরাত বলা হয়। যেমন, ব্যবসা-বাণিজ্য, সাক্ষ্য প্রদান, আমানত, বন্ধক রাখা, ওসীয়ত ও মিরাস ইত্যাদি।

তিন. আল্লাহর হক ও মানুষের হক সম্পর্কিত আহকাম বা বিধি-বিধান।

পরিচয়: মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন আহকাম বা বিধি-বিধান যা কোনো কোনো দিক দিয়ে ইবাদাত এবং কোনো কোনো দিক দিয়ে 'মুয়ামালাত' হয়। যেমন- ঈমান, বিয়ে, তালাক, শাস্তি (Criminal laws), জিহাদ, শপথ ইত্যাদি।[৩৫]

কুরআনের তৃতীয় আলোচ্য বিষয়

কাসাস ও মাওয়াইয: ঘটনা ও ওয়াজ-নসীহত, আখলাক ইত্যাদি।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে ইতিহাস শিক্ষা দেওয়ার জন্য কুরআনের মধ্যে ঘটনা বর্ণনা করেন নি। তিনি ঘটনার মাধ্যমে আমাদেরকে উপদেশ প্রদান করেছেন। নবী-রাসূলের দাওয়াতের কার্যক্রম, সামাজ এবং রাষ্ট্র থেকে অশান্তি, নৈরাজ্য, এবং যাবতীয় অন্যায়, অবিচার দূর করে শান্তি, শৃঙ্খলা ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার দায়িত্ববোধ এবং তাদের আদর্শ ও কর্ম কৌশল আমাদেরকে তিনি শিক্ষা দিয়েছেন।

কুরআনের মধ্যে তিন পদ্ধতিতে ওয়াজ-নসীহত করা হয়েছে।

১. ইতিহাসের বিবরণ দিয়ে ওয়াজ-নসীহত: এগুলো আবার সাধারণত দুই ধরণের। যথা- ক. অতীত কালের সাথে সম্পর্কিত ঘটনা। এসব ঘটনার মধ্যে সাধারণত পঁচিশ জন নবী-রাসূলের ঘটনা এবং আরও কিছু ব্যক্তি ও গোত্রের ঘটনাও । যেমন- ১. আসহাবুল জান্নাত, ২. আসহাবুল কারিয়া, ৩. আসহাবুল কাহাফ ও রাকীম, ৪. আসহাবুল উখদূদ, ৫. আসহাবুল ফীল, ৬. আসহাবুস

[৩৫] বিস্তারিত: আল্লামা তকি ওসমানি দা.বা, রচিত, উলূমুল কুরআন ও উসূলুস তাফসীর।

সাবত, ৭. আসহাবুর রাস, ৮. কাওমে সাবা, ৯. হযরত লুকমান, ১০. বাদশা যুলকারনাইন ইত্যাদি। খ. ভবিষ্যত কালের সাথে সম্পর্কিত ঘটনা। এসব ঘটনার মধ্যে রয়েছে- ১. ইরান ও রোমকদের যুদ্ধর ঘটনা, ২. আবু লাহাব এবং তার স্ত্রীর ধ্বংস হওয়ার বিবরণ, ৩. কিয়ামতের বিভিন্ন আলামত, ৪. কিয়ামত সংঘটিত হওয়া, ৫. কিয়ামতের অবস্থা ইত্যাদি।

২. মহান আল্লাহর কুদরতের বিবরণ দিয়ে ওয়াজ-নসীহত: মহান আল্লাহ বলেন-

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ•

নিশ্চয় আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে রাত দিনের একটানা আবর্তনে, সেই সব নৌযানে যা মানুষের উপকারী সামগ্রী নিয়ে সাগরে বয়ে চলে, সেই পানিতে যা আল্লাহ আকাশ থেকে বর্ষণ করেছেন এবং তার মাধ্যমে ভূমিকে তার মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করেছেন ও তাতে সর্বপ্রকার জীব-জন্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং বায়ুর দিক পরিবর্তনে এবং মেঘমালাতে যা আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে আজ্ঞাবহ হয়ে সেবায় নিয়োজিত আছে, বহু নিদর্শন আছে সেই সকল লোকের জন্য যারা নিজেদের জ্ঞান বুদ্ধিকে কাজে লাগায়।[৩৬]

৩. মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের বিবরণ দিয়ে ওয়াজ-নসীহত: মহান আল্লাহ বলেন-

فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ• فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا• وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا• وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ• فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا• وَيَصْلَى سَعِيرًا• إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا• إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ• بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا

যাকে তার আমলনামা তার ডান হাতে দেওয়া হবে, তার থেকে তো হিসাব নেওয়া হবে সহজ হিসাব। সে তার পরিবারবর্গের কাছে ফিরে যাবে আনন্দচিত্তে। কিন্তু যাকে তার আমলনামা দেওয়া হবে তার পিঠের পেছন দিক থেকে, সে ধ্বংসকে ডাকবে। সে প্রজ্জ্বলিত আগুনে প্রবেশ করবে। পূর্বে সে তার পরিবারবর্গের মধ্যে বেশ আনন্দে ছিল। সে মনে করেছিল, কখনই (আল্লাহর কাছে) ফিরে যাবে না। অবশ্যই ফিরে যাবে, নিশ্চয় তার প্রতিপালক তার উপর দৃষ্টি রাখছিলেন।[৩৭]

---

[৩৬] সূরা বাকারা, আয়াত-১৬৪

[৩৭] সূরা ইনশিকাক, আয়াত, ৭ থেকে ১৫

কুরআনের চতুর্থ আলোচ্য বিষয়

মিছাল: উপমা-উদাহরণ।

কুরআনের মধ্যে বর্ণিত উপমাগুলো সাধারনত দুই ধরণের।

এক. এমন উপমা-উদাহরণ যা সাধারণ মানুষের জন্য কোনো বিষয়কে সহজ বা বোধগম্য করার জন্য দেওয়া হয়েছে। যেমন -

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ

যারা আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করে, তাদের দৃষ্টান্ত এ রকম- যেমন একটি শস্য দানার মতো। যা আরও সাতটি শীষ জন্ম দেয়। আর প্রতিটি শীষ থেকে একশ দানা হয়।[৩৮]

দুই. কুরআনের মধ্যে বর্ণিত উপমাগুলোর দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে, প্রবাদ বা প্রচলিত কথা। যেমন-

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ

উত্তম কাজের প্রতিদান উত্তম ছাড়া আর কী হতে পারে![৩৯]

---

[৩৮] সূরা বাকারা, আয়াত-২৬১

[৩৯] সূরা আর রহমান, আয়াত-৬০

হিফয ও হাফিযের গুরুত্ব

কুরআনের আলোকে হিফয ও হাফিযের গুরুত্ব

১. কুরআন হিফয করার জন্য মহান আল্লাহ একে সহজ করে দিয়েছেন

হিফয পড়ার গুরুত্ব অনেক। হিফয পড়া বা হাফিয হওয়া কঠিন বা অসাধ্য কোন ব্যাপার নয়। অনেকে হিফয করাকে অসাধ্য মনে করে তার সন্তানকে হাফিয বানাতে চান না। অথচ যে কেউ চেষ্টা করলে কুরআন হিফয করতে পারবে। হিফয করার জন্য মহান আল্লাহ কুরআনকে সহজ করে দিয়েছেন। আমরা কুরআনের কিছু বৈশিষ্ট্য শিরোনামে ১৭ নং বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বাস্তবতা আলোচনা করেছি। এছাড়া কুরআনের সূরা কামারের চারটি আয়াতেও এ কথা বলা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন-

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ

আমি কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করে দিয়েছি। সুতরাং আছে কি কেউ, যে উপদেশ গ্রহণ করবে?[৪০]

নোট: এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, মহান আল্লাহ যত কারণে কুরআনকে সহজ করেছেন, এর মধ্যে 'উপদেশ গ্রহণ, হিফয করা, কুরআন লিপিবদ্ধকরণ, অর্থ ও বিশ্লেষণ করা ইত্যাদি। তাহলে আয়াতের একটি অর্থ এভাবে হবে 'আমি কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি, সুতরাং আছে কি কেউ, যে হিফয (মুখস্ত) করবে?[৪১]

প্রিয় পাঠক! মহান আল্লাহ যা সহজ করে দিয়েছেন তা শিক্ষা করা, হিফয বা মুখস্ত করা অসাধ্য কোনো বিষয় নয়। তবে অনেকের কাছে অসাধ্য বা কঠিন মনে হওয়ার ভিন্ন কারণ রয়েছে। যেমন, অমনোযোগী হওয়া, অনিয়মিত পড়াশোনা করা, কুরআনের আদব রক্ষা না করা, গুনাহে লিপ্ত হওয়া কিংবা কারো বদ দু'আর স্বীকার হওয়া ইত্যাদি।

২. কুরআন হিদায়াতের রাজপথ: মহান আল্লাহ বলেন-

وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ

আমি যেন কুরআন তিলাওয়াত করি। যে ব্যক্তি হিদায়াতের পথে আসবে, সে হিদায়াতের পথে আসবে নিজেরই কল্যাণার্থে।[৪২]

৩. পথভ্রষ্টতা এবং সংকট থেকে রক্ষার পথ: মহান আল্লাহ বলেন-

[৪০] সূরা কামার, আয়াত-১৭, ২২, ৩২, ৪০

[৪১] বিস্তারিত: তাফসীরে ইবনে আব্বাস, তাফসীরুল মুয়াসসার, বগবী, জালালাইন ইত্যাদি।

[৪২] সূরা নামল, আয়াত-৯২

فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ

যে আমার হিদায়াত (কুরআন) অনুসরণ করবে সে পথভ্রষ্ট হবে না এবং কোনো সংকটেও পড়বে না।[৪৩]

৪. কুরআনের প্রতি শ্রদ্ধা হিদায়তের পথ সুগম করে দেয়: মহান আল্লাহ বলেন-

يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ •

মহান আল্লাহ কুরআনের উদাহরণের দ্বারা অনেক মানুষকে পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত করেন এবং অনেক মানুষকে হিদায়াত দান করেন। তিনি কেবল নাফরমানদেরকে পথভ্রষ্ট করেন।[৪৪]

হাদীসের আলোকে হিফয ও হাফিযের গুরুত্ব

হাদীসে হিফয ও হাফিয হওয়ার ব্যাপারে অনেক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আমরা সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করার চেষ্টা করব। ইনশাআল্লাহ।

১. সাহাবীগণের মধ্যে হিফযের গুরুত্ব এবং হিফয সম্পর্কে আমাদের ভুল ধারণা: যখন কুরআন নাযিল হতো তখন সাহাবায়ে কিরাম তা মুখস্ত করে ফেলতেন। তারপর এর অর্থ ও মর্ম শিক্ষা করতেন। সাহাবায়ে কিরাম কুরআন হিফয করার ব্যাপারে কতটা গুরুত্ব দিতেন তা খুব সহজেই বুঝা যায় ছোট একটি ইতিহাস থেকে। ইতিহাসে বলা হয়েছে, 'ইয়ামামার যুদ্ধে ৭০ জন হাফিযে কুরআন শহীদ হয়েছেন'। তাহলে বুঝতেই পারছেন সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে কুরআন হিফযের কী পরিমাণ গুরুত্ব ছিল। বর্তমানে আমাদের মধ্যে অনেক হাফিয থাকলেও মুসলিম জনসংখ্যার অনুপাতে হাফিযের সংখ্যা অনেক কম। এর পেছনে কয়েকটি কারণ রয়েছে । ক. হিফয করা বা হাফিয হওয়াকে অসাধ্যা বা কঠিন মনে করা। আসলে এমন ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। এ ব্যাপারে কুরআনের বৈশিষ্ট্য শিরোনামে ১৭ নং বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আলোচনা করা হয়েছে। খ. পরকালের চিরস্থায়ী সুখ-শান্তির গুরুত্বহীনতা। গ. হাফিয হলে দুনিয়ার আরাম এবং অঢেল টাকা উপার্জন না হওয়ার ভয়। ঘ. হাফিয হওয়া শিশুদের কাজ। শিশু বয়স ছাড়া হাফিয হওয়া যায় না। এজন্য বড়দের মধ্যে কুরআনের হিফয বা হাফিয হওয়ার তেমন কোনও প্রবণতা নেই। ঙ. হাফিয হওয়ার জন্য পূর্ণ কুরআন মুখস্থ করাকে শর্ত মনে করা হয়। অথচ যে যতটুকু মুখস্থ করবে সে তুতটুকু অংশের হাফিয হবে। এ জন্য আমরা যারা হাফিয নই তারা এখন থেকে প্রতিনিয়ত কুরআনের কিছু কিছু অংশ হিফয বা মুখস্থ করার চেষ্টা করব।

[৪৩] সূরা তোয়াহা, আয়াত-১২৩

[৪৪] সূরা বাকারা, আয়াত-২৬

২. কুরআনের শিক্ষক নেতৃত্বে অগ্রাধিকার: হাদীসে এসেছে

عَنْ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدِ الْحَارِثِ لَقِيَ عُمَرَ بِعُسْفَانَ وَكَانَ عُمَرُ يَسْتَعْمِلُهُ عَلَى مَكَّةَ فَقَالَ مَنِ اسْتَعْمَلْتَ عَلَى أَهْلِ الْوَادِي فَقَالَ ابْنَ أَبْزَى. قَالَ وَمَنِ ابْنُ أَبْزَى قَالَ مَوْلًى مِنْ مَوَالِينَا. قَالَ فَاسْتَخْلَفْتَ عَلَيْهِمْ مَوْلًى قَالَ إِنَّهُ قَارِئٌ لِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنَّهُ عَالِمٌ بِالْفَرَائِضِ. قَالَ عُمَرُ أَمَا إِنَّ نَبِيَّكُمْ ﷺ قَدْ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ

আমির ইবনে ওয়াসিলা রাহি. থেকে বর্ণিত, নাফি ইবনে আবদুল হারিস রাদি. উসফান নামক স্থানে হযরত ওমর রাদি. এর সাথে সাক্ষাৎ করলেন। হযরত ওমর রাদি. তাকে মক্কায় (রাজস্ব আদায়কারী) নিয়োগ করলেন। অতঃপর তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন: তুমি প্রান্তরবাসীদের জন্য কাকে নিয়োগ করেছ? সে বলল, ইবনু আব্যা নামক ব্যক্তিকে। হযরত ওমর রাদি. বললেন: ইবনু আব্যা কে? নাফি বলল: আমাদের আযাদকৃত গোলামদের একজন। হযরত ওমর রাদি. বললেন: তুমি একজন গোলামকে তাদের স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করেছ? নাফি বললেন, সে গোলামটি মহান আল্লাহর কিতাবের একজন ক্বারী বা আলিম। সে ফারাইয শাস্ত্রেও অভিজ্ঞ। তখন হযরত ওমর রাদি. বললেন: তোমাদের নবী ﷺ বলেছেন, মহান আল্লাহ এই কিতাব দ্বারা অনেক জাতিকে মর্যাদায় উন্নীত করেন আর অন্যদের অবনত করেন। অর্থাৎ যারা এই কিতাবের অনুসারী হবে তারা দুনিয়ায় মর্যাদাবান এবং আখিরাতে জান্নাত লাভ করবে। আর যারা এই কিতাবকে অস্বীকার করবে তারা দুনিয়ায় লাঞ্ছিত ও পরকালে জাহান্নামে পতিত হবে।[৪৫]

৩. কুরআন শিক্ষা অর্জনের ব্যাপারে পরস্পরে প্রতিযোগিতা করা: আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন-

لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ عَلَّمَهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ فَسَمِعَهُ جَارٌ لَهُ فَقَالَ لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ فُلَانٌ فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُهْلِكُهُ فِي الْحَقِّ فَقَالَ رَجُلٌ لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ فُلَانٌ فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ

দুই ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো সাথে ঈর্ষা করা যায় না। এক ব্যক্তি, যাকে মহান আল্লাহ কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন এবং সে তা দিন-রাত তিলাওয়াত করে। আর তা শোনে তার প্রতিবেশীরা তাকে বলে, হায়! আমাদেরকে যদি এমন জ্ঞান দেওয়া হত, যেমন অমুককে দেওয়া হয়েছে। তাহলে আমিও তার মতো আমল

[৪৫] সহীহ মুসলিম, হাদীস-১৯৩৪; ইবনে মাজাহ, হাদীস-২১৮

করতাম। অন্য আর এক ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন এবং সে ঐ সম্পদ সত্য ও ন্যায়ের পথে খরচ করে। এ অবস্থা দেখে অন্য এক ব্যক্তি বলে, হায়! আমাকে যদি অমুক ব্যক্তির মতো সম্পদ দেওয়া হতো তাহলে সে যেমন ব্যয় করেছে আমিও তেমন ব্যয় করতাম।[৪৬]

৪. তিলাওয়াতে অসম্ভব পরিশ্রম করা অনুচিত: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদি. থেকে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেন-

اقْرَإِ الْقُرْآنَ فِي شَهْرٍ قُلْتُ إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً حَتَّى قَالَ فَاقْرَأْهُ فِي سَبْعٍ وَلَا تَزِدْ عَلَى ذَلِكَ

তুমি এক মাসে কুরআন পাঠ সমাপ্ত কর। আমি বললাম, আমি এর চেয়ে অধিক পাঠ করার শক্তি রাখি। তখন নবী ﷺ বললেন: তাহলে সাত দিনে এর পাঠ শেষ কর এবং এর চেয়ে কম সময়ে পাঠ করা শেষ করো না।[৪৭]

অন্য একটি হাদীসে এসেছে-

لَا يَفْقَهُ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ

যে ব্যক্তি তিন দিনের কম সময়ের মধ্যে কুরআন তিলাওয়াত সমাপ্ত করল সে কুরআনের কিছুই বুঝে নি।[৪৮]

নোট: কুরআনের হিফয করার জন্য প্রতি সাত দিনে অথবা তিন দিনের মধ্যে একাধিক বার কুরআন পাঠ করা নিষিদ্ধ নয়। তবে স্বাভাবিক তিলাওয়াতের জন্য উল্লেখিত নিয়ম প্রযোজ্য।

[৪৬] সহীহ বুখারী, হাদীস--৫০২৬; ৭২৩২; ৭৫২৮; ৭৫২৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস-১৯৩০

[৪৭] সহীহ বুখারী, হাদীস-৫০৫৪

[৪৮] সুনানু আবু দাউদ, হাদীস-১৩৯৬

ইসলামে হাফিযের মর্যাদা

দুনিয়াতে হাফিযের মর্যাদা

১. হাফিযে কুরআন সম্মানজনক জীবনে উত্তীর্ণ হন

মুহাম্মাদ ﷺ এর উপর কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ নামেই পরিচিত ছিলেন। কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পরই তিনি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ হিসেবে পরিচিতি পেলেন। এভাবে একজন সাধারণ মানুষ সমাজে সাধারণ মানুষ হিসেবেই পরিচিত থাকেন। কিন্তু মহান আল্লাহর কুরআন হিফয করা, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এবং এর উপর আমলের মাধ্যমে সাধারণ মানুষই সম্মানজনক জীবনে উত্তীর্ণ হন।

২. কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে ঈমান বৃদ্ধি পায়: মহান আল্লাহ বলেন-

وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

যখন তাদের সামনে তাঁর (আল্লাহর) আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হয় তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে এবং তারা তাদের প্রতিপালকের উপর ভরসা করে।[৪৯]

৩. সর্বাপেক্ষা সরল পথ দেখায় কুরআন: মহান আল্লাহ বলেন-

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا

বস্তুত এ কুরআন সেই পথ দেখায়, যা সর্বাপেক্ষা সরল, আর যারা (এর প্রতি) ঈমান এনে সৎকর্ম করে, তাদেরকে সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য আছে মহা প্রতিদান।[৫০]

৪. সত্য ও সঠিক পথ থেকে দূরে জীবন-যাপনকারীদের থেকে সুরক্ষার ব্যবস্থা: মহান আল্লাহ বলেন-

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا

হে নবী! আপনি যখন কুরআন পড়েন তখন আমি আপনার এবং যারা আখিরাতে ঈমান রাখে না তাদের মধ্যে এক অদৃশ্য পর্দা রেখে দেই।[৫১]

৫. রোগ থেকে আরোগ্য ও রহমত লাভের ব্যবস্থা: মহান আল্লাহ বলেন-

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

[৪৯] সূরা আনফাল, আয়াত-২,৪

[৫০] সূরা বনি ইসলাঈল, আয়াত-৯

[৫১] সূরা বনি ইসরাঈল, আয়াত-৪৫

আমি নাযিল করছি এমন কুরআন, যা মুমিনের জন্য (রোগ থেকে) আরোগ্য ও রহমতের ব্যবস্থা।[৫২]

৬. হৃদয়ে প্রশান্তি লাভের উত্তম ব্যবস্থা: মহান আল্লাহ বলেন-

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

স্মরণ রেখ, আল্লাহর যিকিরর দ্বারা অন্তরে প্রশান্তি লাভ হয়।[৫৩]

৭. কুরআনশিক্ষার ভিত্তিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে অগ্রগণ্য হওয়া: হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাদি. থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন-

كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَقُولُ أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ

রাসূলুল্লাহ ﷺ উহুদের যুদ্ধে শহীদগণের দুইজনকে এক কাপড়ে দাফন করার জন্য একত্রিত করলেন। তারপর বললেন, তাদের মধ্যে কুরআন সম্পর্কে কে বেশি জ্ঞাত? যখন তাদের দু'জনের মধ্য হতে একজনের এদিকে ইঙ্গিত করা হলো তখন তাকে প্রথমে কবরে রাখলেন।[৫৪]

৮. কুরআন তিলাওয়াতকারী ফুলের ন্যায় শ্রেষ্ঠ : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন-

مَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالأُتْرُجَّةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَرِيحُهَا طَيِّبٌ وَالَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالتَّمْرَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلَا رِيحَ لَهَا وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرٌّ وَلَا رِيحَ لَهَا

যে ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত করে তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে এমন কমলা লেবুর মত যা সুস্বাদু এবং সুগন্ধযুক্ত। আর যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে না, তাঁর দৃষ্টান্ত হচ্ছে এমন খেজুরের মত যা সুগন্ধহীন কিন্তু খেতে সুস্বাদু। আর ফাসিক-ফাজির ব্যক্তি যে কুরআন পাঠ করে তাঁর দৃষ্টান্ত হচ্ছে রায়হান জাতীয় লতার মত যার সুগন্ধ আছে কিন্তু খেতে বিস্বাদ। আর ঐ ফাসিক যে কুরআন একেবারেই পাঠ করে না, তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে ঐ মাকাল ফলের মত যা খেতেও বিস্বাদ এবং যার কোনও সুগন্ধও নেই।[৫৫]

৯. কুরআনের ছাত্র-শিক্ষক সর্বোত্তম ব্যক্তি: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন-

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

[৫২] সূরা বনি ইসলাঈল, আয়াত-৮২

[৫৩] সূরা রাদ, আয়াত-২৮

[৫৪] সহীহ বুখারী, হাদীস-১৩৪৭; সুনানুন আবু দাউদ, হাদীস-৩১৪০

[৫৫] সহীহ বুখারী, হাদীস-৫০২০, ৭৫৬০; সুনানু আবু দাউদ, হাদীস-৪৮৪১

(হযরত ওসমান রাদি. থেকে বর্ণিত) তোমাদের মধ্যে সে সর্বোত্তম যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়।[৫৬]

১০. সবচেয়ে উত্তম মানুষ হলেন হাফিযগণ: জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাদি. বলেন-

خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ نَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَفِينَا الأَعْرَابِيُّ وَالأَعْجَمِيُّ فَقَالَ
اقْرَءُوا فَكُلٌّ حَسَنٌ وَسَيَجِيءُ أَقْوَامٌ يُقِيمُونَهُ كَمَا يُقَامُ الْقِدْحُ يَتَعَجَّلُونَهُ وَلاَ يَتَأَجَّلُونَهُ

আমরা কুরআন পড়ছি। এমন সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ বের হয়ে আমাদের কাছে এলেন। তখন আমাদের মধ্যে আরব বেদুইন এবং অনারব লোকজন ছিল। তিনি বললেন, তোমরা পড়ো। সবাই উত্তম। অচিরেই এমন সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটবে যারা কুরআনকে তীরের ন্যায় ঠিক করবে, (তাজবীদ নিয়ে বাড়াবাড়ি করবে)। তারা কুরআন পাঠে তাড়াহুড়া করবে, অপেক্ষা করবে না।[৫৭]

১১. হাফিযকে সম্মান করা আল্লাহর প্রতি সম্মানের অন্তর্ভুক্ত: আবু মূসা আশআরী রাদি. থেকে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন-

إِنَّ مِنْ إِجْلاَلِ اللَّهِ إِكْرَامَ ذِى الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْغَالِى فِيهِ وَالْجَافِى
عَنْهُ وَإِكْرَامَ ذِى السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ

নিশ্চয় বৃদ্ধ মুসলিমকে সম্মান করা, কুরআনের ধারক-বাহক (আলিম-ওলামা ও হাফিয) এবং ন্যায় পরায়ণ শাসকের প্রতি সম্মান দেখানো মহান আল্লাহর প্রতি সম্মান দেখানোর অন্তর্ভুক্ত।[৫৮]

১২. পথভ্রষ্টতা এবং ধ্বংস থেকে রক্ষার পথ: আবু সুরাইহ আল-খুজায়ী রাদি. থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কাছে এসে বললেন, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো। তোমরা কি সাক্ষ্য দাও নি আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল? উপস্থিত লোকেরা বলল, অবশ্যই। তিনি বললেন, কুরআন মুক্তির পথ। এর এক দিক আল্লাহর হাতে অপর দিক তোমাদের হাতে। তারপর তিনি বললেন-

فَتَمَسَّكُوا بِهِ فَإِنَّكُمْ لَنْ تَضِلُّوا وَلَنْ تَهْلِكُوا بَعْدَهُ أَبَدًا

তোমরা একে শক্তভাবে আকড়ে ধরো। তাহলে তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না এবং ধ্বংসও হবে না।[৫৯]

[৫৬] সহীহ বুখারী, হাদীস-৫০২৭; সুনানু আবু দাউদ, হাদীস-১৪৫৪
[৫৭] সুনানু আবু দাউদ, হাদীস-৮৩০
[৫৮] সুনানু আবু দাউদ, হাদীস-৪৮৪৫

পরকালে হাফিযের মর্যাদা

১. কুরআন মুক্তির ঘোষণাপত্র: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন-

الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيمَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلأُ الْمِيزَانَ. وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلآنِ أَوْ تَمْلأُ
مَا بَيْنَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَالصَّلاَةُ نُورٌ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ
لَكَ أَوْ عَلَيْكَ كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا

পবিত্রতা ঈমানের অংশ। 'আলহামদুলিল্লা-হ' মিযানের পরিমাপকে পরিপূর্ণ করে দিবে। 'সুবহানাল্লা-হি ওয়াল হামদু লিল্লা-হ' আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী স্থানকে পরিপূর্ণ করে দিবে। নামায হচ্ছে জ্যোতি। দান-সাদাকাহ হচ্ছে দলিল। ধৈর্য হচ্ছে জ্যোতির্ময়। আলকুরআন হবে তোমার পক্ষে অথবা বিপক্ষে প্রমাণ স্বরূপ। প্রত্যেক মানুষ নিজেকে আমলের বিনিময়ে বিক্রি করে। তার আমল দ্বারা নিজেকে (আযাব থেকে) মুক্ত করে অথবা সে নিজের ধ্বংস ডেকে আনে।[৬০]

২. কুরআনের পাঠক সম্মানিত ফিরিশতাদের মত: হযরত আয়িশা রাদি. থেকে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন-

الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِى يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ
عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْرَانِ

কুরআনের হাফিয, পাঠক ও লিপিকারগণ সম্মানিত ফিরিশতাদের মতো। খুব কষ্টদায়ক হওয়া সত্ত্বেও যে বারবার কুরআন পাঠ করে সে দ্বিগুণ পুরস্কার পাবে।[৬১]

৩. তারা প্রতিনিয়ত অনেক বড় বড় গর্ভবতী উটনী লাভের চেয়ে লাভবান হবে: আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন-

أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ أَنْ يَجِدَ فِيهِ ثَلاَثَ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ. قُلْنَا نَعَمْ.
قَالَ فَثَلاَثُ آيَاتٍ يَقْرَأُ بِهِنَّ أَحَدُكُمْ فِى صَلاَتِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلاَثِ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ

কেউ কি চাও যে, যখন বাড়ি ফিরবে তখন বাড়িতে গিয়ে তিনটি বড় বড় মোটাতাজা গর্ভবতী উটনী দেখতে পাবে? আমরা বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন,

[৫৯] মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস-৩০৬২৮; মাজমাউয যাওয়াইদ, হাদীস-৭৭৯; ইমাম তাবরানী বলেছেন: হাদীসের বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য
[৬০] সহীহ মুসলিম, হাদীস-৫৫৬
[৬১] সহীহ মুসলিম, হাদীস-১৮৯৮; ইবনে মাজাহ, হাদীস-৩৭৭৯

তোমরা কেউ নামাযে তিনটি আয়াত পড়লে সেটা তার জন্য তিনটি বড় বড় মোটাতাজা গর্ভবতী উটনীর চেয়েও উত্তম।[৬২]

৪. অফুরন্ত সওয়াব লাভের সুবর্ণ সুযোগ: হাদীসে এসেছে-

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ فِي الصُّفَّةِ فَقَالَ أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَغْدُوَ كُلَّ يَوْمٍ إِلَى بُطْحَانَ أَوْ إِلَى الْعَقِيقِ فَيَأْتِيَ مِنْهُ بِنَاقَتَيْنِ كَوْمَاوَيْنِ فِي غَيْرِ إِثْمٍ وَلاَ قَطْعِ رَحِمٍ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ نُحِبُّ ذَلِكَ. قَالَ أَفَلاَ يَغْدُو أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيُعَلِّمُ أَوْ يَقْرَأُ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ وَثَلاَثٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلاَثٍ وَأَرْبَعٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَرْبَعٍ وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الإِبِلِ

হযরত ওকবা ইবনু আমির রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ বের হয়ে এলেন, তখন আমরা সুফফা বা মসজিদের চত্বরে অবস্থান করছিলাম। তিনি বললেন, তোমরা কি চাও যে, প্রতিদিন বুতহান অথবা আকিক বাজারে গিয়ে কোনও পাপ বা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা ছাড়াই উত্তম (বড় কুঁজ বা চুঁট বিশিষ্ট) দুটি উটনী নিয়ে আসবে? আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা এরূপ চাই। তিনি বললেন, তাহলে তোমাদের কারো মসজিদে গিয়ে আল্লাহর কিতাবের দুটি আয়াত শিক্ষা দেওয়া কিংবা পাঠ করা ঐরূপ দুটি উটনীর চেয়েও উত্তম। এরূপ তিনটি আয়াত তিনটি উটনীর চেয়েও উত্তম এবং চারটি আয়াত চারটি উটনীর চেয়েও উত্তম। আর অনুরূপ সমসংখ্যক উটনীর চেয়ে তত সংখ্যক আয়াত উত্তম।[৬৩]

৫. কুরআন সুপারিশকারী: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন-

اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لأَصْحَابِهِ

তোমরা কুরআন পাঠ করো। কেননা কিয়ামতের দিন কুরআন তার পাঠকের জন্য সুপারিশ করবে।[৬৪]

৬. আল কুরআন মর্যাদা লাভের চাবি: হাদীসে এসেছে-

إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ

মহান আল্লাহ এই কিতাব (কুরআন) দ্বারা অনেক জাতিকে মর্যাদায় উন্নীত করেন আর অন্যদের অবনত করেন।[৬৫]

[৬২] সহীহ মুসলিম, হাদীস-১৯০৮
[৬৩] সহীহ মুসলিম, হাদীস-১৯০৯
[৬৪] সহীহ মুসলিম, হাদীস-১৯১০
[৬৫] সহীহ মুসলিম, হাদীস-১৯৩৪; ইবনে মাজাহ, হাদীস-২১৮

৭. কুরআনের পাঠকের প্রতি শান্তি ও রহমত বর্ষিত হয়: হাদীসে এসেছে-

وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ

যখন কোনও জামাত একত্রিত হয়ে আল্লাহর ঘরসমূহ থেকে কোনও ঘরে আল্লাহর কিতাব পাঠ করে এবং একে অপরের সাথে মিলে কুরআন অধ্যয়নে লিপ্ত থাকে তখন তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হয়। রহমত তাদেরকে ঢেকে নেয় এবং ফিরিশতারা তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখে। মহান আল্লাহ তাঁর নিকটবর্তীদের (ফিরিশতাদের) মধ্যে তাদের সম্পর্কে আলোচনা করেন।[৬৬]

৮. অফুরন্ত পুরষ্কার লাভের সুবর্ণ সুযোগ: হাদীসে এসেছে-

مَنْ قَامَ بِعَشْرِ آيَاتٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ وَمَنْ قَامَ بِمِائَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْمُقَنْطِرِينَ

যে ব্যক্তি নামাযে দশটি আয়াত তিলাওয়াত করবে তার নাম গাফিলদের তালিকায় লিপিবদ্ধ করা হবে না। আর যে ব্যক্তি ১০০ আয়াত তিলাওয়াত করবে তার নাম অনুগত মানুষের তালিকায় লিপিবদ্ধ করা হবে। আর যে ব্যক্তি নামাযে ১০০০ আয়াত তিলাওয়াত করবে তাকে অফুরন্ত পুরষ্কার প্রাপ্তদের তালিকায় লিপিবদ্ধ করা হবে।[৬৭]

৯. কুরআনের আমলকারীর পিতা-মাতাকে মুকুট পরানো হবে: হাদীসে এসেছে-

مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ أُلْبِسَ وَالِدَاهُ تَاجًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ضَوْؤُهُ أَحْسَنُ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ فِي بُيُوتِ الدُّنْيَا لَوْ كَانَتْ فِيكُمْ فَمَا ظَنُّكُمْ بِالَّذِي عَمِلَ بِهَذَا

যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করবে এবং তদনুযায়ী আমল করবে কিয়ামতের দিন তার পিতা-মাতাকে এমন মুকুট পরানো হবে যার আলো সূর্যের আলোর চেয়েও উজ্জল হবে। যদি সূর্য তোমাদের ঘরে থাকে। (তাহলে এর আলো কিরূপ হবে?) তাহলে যে ব্যক্তি কুরআন অনুযায়ী আমল করেছে তার ব্যাপারটি কেমন হবে, তোমরা ধারণা করো তো![৬৮]

১০. জান্নাতে কুরআনের আয়াতের সমপরিমান উপরে উঠার সৌভাগ্যলাভ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদি. থেকে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন-

[৬৬] সহীহ মুসলিম, হা.-৭০২৮; সুনানু আবু দাউদ, হা.-১৪৫৭; সুনানুত তিরমিযী, হা.-২৯৪৫
[৬৭] সুনানু আবু দাউদ, হাদীস-১৪০০
[৬৮] সুনানুন আবু দাউদ, হাদীস-১৪৫৫; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস-১৫৬৮৩

يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ اقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا فَإِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَؤُهَا

কুরআনের পাঠককে বলা হবে, কুরআন পাঠ করতে করতে উপরে উঠতে থাকো। তুমি দুনিয়াতে যেভাবে ধীরস্থিরভাবে পাঠ করতে সেভাবে পাঠ করো। কেননা তোমার তিলাওয়াতের শেষ আয়াতেই তোমার বাসস্থান হবে।[৬৯]

১১. কুরআন তিলাওয়াতের সওয়াব দশগুণ: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন-

مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا لَا أَقُولُ الم حَرْفٌ وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ

যে ব্যক্তি কুরআনের একটি অক্ষর পাঠ করবে তার জন্য এর সওয়াব রয়েছে। সওয়াব হবে দশগুণ হিসেবে। আমি বলি না যে, 'আলিফ-লাম-মীম' একটি অক্ষর। বরং আলিফ একটি অক্ষর, লাম একটি অক্ষর, মীম একটি অক্ষর।[৭০]

১২. মহান আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন-

يَجِيءُ الْقُرْآنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ يَا رَبِّ حَلِّهِ فَيُلْبَسُ تَاجَ الْكَرَامَةِ ثُمَّ يَقُولُ يَا رَبِّ زِدْهُ فَيُلْبَسُ حُلَّةَ الْكَرَامَةِ ثُمَّ يَقُولُ يَا رَبِّ ارْضَ عَنْهُ فَيَرْضَى عَنْهُ فَيُقَالُ لَهُ اقْرَأْ وَارْقَ وَتُزَادُ بِكُلِّ آيَةٍ حَسَنَةً

কিয়ামতের দিন কুরআন এসে বলবে, হে আমার প্রভু! কুরআনের পাঠককে অলংকার পরিয়ে দেন। তারপর তাকে সম্মানের মুকুট পরানো হবে। কুরআন আবার বলবে, হে আমার প্রভু! তাকে আরও পোশাক দেন। অতঃপর তাকে মর্যাদার পোশাক পরানো হবে। কুরআন আবার বলবে, হে আমার প্রভু! আপনি তার প্রতি সন্তুষ্ট হোন। কাজেই তিনি তার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন। তারপর তাকে বলা হবে, তুমি পড় এবং উপরে উঠতে থাকো। এমনিভাব তাকে প্রতি আয়াতের বিনিময়ে একটি করে সওয়াব বাড়িয়ে দেওয়া হবে।[৭১]

১৩. কুরআন তিলাওয়াতকারী অন্যান্য ফযিলত লাভ করবেন: হাদীসে এসেছে-

مَنْ شَغَلَهُ الْقُرْآنُ وَذِكْرِي عَنْ مَسْأَلَتِي أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِي السَّائِلِينَ وَفَضْلُ كَلَامِ اللهِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللهِ عَلَى خَلْقِهِ

(হযরত আবু সাঈদ রাদি. থেকে বর্ণিত, মহান আল্লাহ বলেন) কুরআন ও আমার যিকির যাকে আমার নিকট কিছু আবেদন করা থেকে বিরত রেখেছে আমি তাকে আমার কাছে যারা চায় তাদের চেয়েও অনেক উত্তম জিনিস দেব। সকল

[৬৯] সুনানু আবু দাউদ, হা.-১৪৬৬; সুনানুত তিরমিযী, হা.-২৯১৪; ইবনে মাজাহ, হা.-৩৭৮০
[৭০] সুনানুত তিরমিযী, হাদীস-২৯১০
[৭১] সুনানুত তিরমিযী, হাদীস-২৯১৫

কালামের উপর মহান আল্লাহর কালামের শ্রেষ্ঠত্ব এতো বেশি, মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব যত বেশি তাঁর সৃষ্টির উপর।[৭২]

১৪. একটি আয়াত শিক্ষা করা ১০০ রাকাত নামাযের চেয়েও উত্তম: হাদীসে এসেছে-

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ يَا أَبَا ذَرٍّ! لَأَنْ تَغْدُوَ فَتَتَعَلَّمَ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تُصَلِّيَ مِائَةَ رَكْعَةٍ وَلَأَنْ تَغْدُوَ فَتَتَعَلَّمَ بَابًا مِنَ الْعِلْمِ عَمِلَ بِهِ أَوْ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تُصَلِّيَ أَلْفَ رَكْعَةٍ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ

হযরত আবু যার রাদি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেছেন: হে আবু যার! তুমি যদি সকালে আল্লাহর কুরআনের একটি আয়াত শিক্ষা কর তাহলে তা তোমার জন্য একশত রাকাত নামাযের চেয়েও উত্তম হবে। আর যদি সকালে এলেমের একটি অধ্যায় শিক্ষা কর, চাই তা আমল করা হোক বা না হোক তাহলে তা তোমার জন্য এক হাজার রাকাত নামাযের চেয়েও উত্তম হবে।[৭৩]

১৫. হাফিযগণ মহান আল্লাহর পরিবারভুক্ত: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন-

إِنَّ لِلَّهِ أَهْلِينَ مِنَ النَّاسِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ هُمْ؟ قَالَ هُمْ أَهْلُ الْقُرْآنِ. أَهْلُ اللهِ وَخَاصَّتُهُ

কিছু লোক আল্লাহর পরিবারভুক্ত। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তাদের পরিচয় কী? তিনি বললেন, কুরআন তিলাওয়াতকারীগণ আল্লাহর পরিবারভুক্ত এবং বিশেষ মানুষ।[৭৪]

১৬. কুরআন পথভ্রষ্টতা এবং ধ্বংস থেকে রক্ষার পথ: আবু সুরাইহ আল-খুজায়ী রাদি. থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কাছে এসে বললেন: তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো। তোমরা কি সাক্ষ্য দাও নি আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল? উপস্থিত লোকেরা বললেন: অবশ্যই। তিনি বললেন, কুরআন মুক্তির পথ। এর এক দিক আল্লাহর হাতে অপর দিক তোমাদের হাতে। তারপর তিনি বললেন-

فَتَمَسَّكُوا بِهِ فَإِنَّكُمْ لَنْ تَضِلُّوا وَلَنْ تَهْلِكُوا بَعْدَهُ أَبَدًا

তোমরা একে শক্তভাবে আকড়ে ধরো। তাহলে তোমরা কখনোই পথভ্রষ্ট হবে না এবং ধ্বংস হবে না।[৭৫]

[৭২] সুনানুত তিরমিযী, হাদীস-২৯২৬
[৭৩] ইবনে মাজাহ, হাদীস-২১৯; ইমাম মুনযিরি রাহি. বলেছেন: হাদীসের সনদ হাসান।
[৭৪] সুনানু ইবনে মাজাহ, হাদীস-২১৫
[৭৫] মূসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস-৩০৬২৮; ইমাম তাবরানী বলেছেন: হাদীসের বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য।

১৭. কুরআন তিলাওয়াত করা যিকির, সাদাকাহ থেকেও উত্তম: হাদীসে এসেছে-

قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فِي الصَّلاَةِ أَفْضَلُ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي غَيْرِ الصَّلاَةِ، وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فِي غَيْرِ الصَّلاَةِ أَفْضَلُ مِنَ التَّسْبِيحِ والتَّكْبِيرِ، والتَّسْبِيحُ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةُ والصَّدَقَةُ أَفْضَلُ مِنَ الصَّوْمِ والصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ

নামাযের মধ্যে কুরআন তিলাওয়াত করা নামাযের বাইরে তিলাওয়াত করার চেয়ে উত্তম। নামাযের বাইরে তিলাওয়াত করা তাসবীহ ও তাকবীর (আল্লাহু আকবার) যিকির করার চেয়ে উত্তম। তাসবীহ সাদাকাহ থেকে উত্তম। সাদাকাহ রোযা থেকে উত্তম। রোযা জাহান্নাম থেকে মুক্তির ঢাল স্বরূপ।[৭৬]

১৮. কুরআন তিলাওয়াত অন্তরকে পরিষ্কার করে: হাদীসে এসেছে-

إِنَّ هَذِهِ الْقُلُوْبَ تَصْدَأُ كَمَا يَصْدَأُ الْحَدِيْدُ إِذَا أَصَابَهُ الْمَاءُ قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا جِلاَؤُهَا قَالَ: كَثْرَةُ ذِكْرِ الْمَوْتِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ

অবশ্যই অন্তর মরিচাযুক্ত হয়, যেভাবে পানি পেলে লোহা মরিচাযুক্ত হয়। জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! তা পরিষ্কারের পদ্ধতি কী? তিনি বললেন, বেশি বেশি মৃত্যুকে স্মরণ করা এবং কুরআন তিলাওয়াত করা।[৭৭]

১৯. কুরআন তিলাওয়াত আসমান ও জমিনে নূর হবে: হাদীসে এসেছে-

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَوْصِنِي قَالَ: أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللهِ فَإِنَّهَا رَأْسُ لِأَمْرِكِ قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ زِدْنِي قَالَ: عَلَيْكَ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَذِكْرِ اللهِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَكَ نُوْرٌ فِي السَّمَاوَاتِ وَنُوْرٌ فِي الْأَرْضِ

হযরত আবু যার রাদি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে উপদেশ প্রদান করুন। তিনি বললেন, আমি তোমাকে মহান আল্লাহর প্রতি ভয়-ভীতির উপদেশ দিচ্ছি কেননা, মহান আল্লাহর প্রতি ভয় তোমার যাবতীয় কাজের মূল। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে আরও কিছু উপদেশ প্রদান করুন। তিনি বললেন, তুমি কুরআন তিলাওয়াত করবে এবং মহান আল্লাহর যিকির করবে। কেননা, এটা তোমার জন্য আসমান ও জমিনে নূর হবে।[৭৮]

২০. কুরআন তার পাঠকের মুক্তির জন্য সুপারিশ করবে: হাদীসে এসেছে-

اَلصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَقُوْلُ اَلصِّيَامُ: رَبِّ إِنِّيْ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِيْ فِيْهِ وَيَقُوْلُ الْقُرْآنُ: مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَيُشَفَّعَانِ

[৭৬] শুয়াবুল ঈমান, হাদীস-২২৪৩; আল-ফাতহুল কাবীর, হাদীস-৮৪৩৬

[৭৭] শুয়াবুল ঈমান, হাদীস-২০১৪; মিশকাত, হাদীস-২১৬৮

[৭৮] শুয়াবুল ঈমান, হাদীস-৪৯৪২; আল-মুয়জামুল কাবীর, হাদীস-১৬৫১

রোযা এবং কুরআন মানুষের পক্ষে সুপারিশ করবে। রোযা বলবে: হে রব! আমি তাকে দিনের বেলায় খাবার গ্রহণ এবং কামনা-বাসনা থেকে বিরত রেখেছি। সুতরাং তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করুন। কুরআন বলবে: আমি তাকে রাত্রে ঘুম থেকে বিরত রেখেছি। অত:পর তাদের সুপারিশ কবুল করা হবে।[৭৯]

২১. কুরআনের হক আদায়কারীর পক্ষে সে আবেদন জানাবে: হাদীসে এসেছে-

ثَلاَثَةٌ تَحْتَ الْعَرْشِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْقُرْآنُ لَهُ ظَهْرٌ وَبَطْنٌ يُحَاجُّ الْعِبَادَ وَالرَّحِمُ تُنَادِي صِلْ مَنْ وَصَلَنِي وَاقْطَعْ مَنْ قَطَعَنِي وَالأَمَانَةُ

তিনটি জিনিস কিয়ামতের দিন আরশের নিচে থাকবে। প্রথম. কুরআন। এর দুটি দিক রয়েছে। বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ। কুরআন সে দিন মানুষের পক্ষে বলিষ্ঠ আবেদন জানাবে। দ্বিতীয়. আত্মীয়তা। সে বলবে, যে আমাকে রক্ষা করেছে তাকে রহমতের সাথে মিলিত করুন। যে আমাকে ছিন্ন করেছে তাকে রহমত থেকে পৃথক করুন। তৃতীয়. আমানত। সেও দ্বিতীয়টির মতো বলবে।[৮০]

২২. কুরআনের হালাল-হারাম মেনে চললে দশজনকে সুপারিশ করার সুযোগ:

مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَاسْتَظْهَرَهُ فَأَحَلَّ حَلاَلَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ أَدْخَلَهُ اللهُ بِهِ الْجَنَّةَ وَشَفَّعَهُ فِيْ عَشْرَةٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلِّهِمْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده بصحيح و حفص بن سليمان يضعف في الحديث ضعيف جدا

যে ব্যক্তি কুরআন পড়ল এবং তা হিফয করল এর হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম মেনে চলল, তাকে মহান আল্লাহ জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। তার পরিবারের এমন দশজন ব্যক্তি সম্পর্কে তার সুপারিশ কবুল করবেন যাদের প্রত্যেকের জন্য জাহান্নাম অনিবার্য ছিল। ইমাম তিরমিযী বলেন: 'এই হাদীসটি গারীব। আমরা শুধু উপরোক্ত সনদেই এই হাদীসটি জেনেছি। এর সনদসূত্র সহীহ নয়। বর্ণনাকারী হাফয ইবনু সুলাইমান হাদীস শাস্ত্রে অনেক দুর্বল।'[৮১] সুতরাং এমন দুর্বল হাদীসের ভিত্তিতে 'জাহান্নাম অবধারিত দশজন ব্যক্তিকে সুপারিশ করে জান্নাতে প্রবেশ করাবার অধিকার একজন হাফিযকে দেওয়া হবে' এ কথা বলা যায় না।

[৭৯] শুয়াবুল ঈমান, হাদীস-১৯৯৭; আল-মুসতাদরাকু আলাস সাহিহাইন, হাদীস-২০৩৬; হাদীসটি ইমাম মুসলিমের নীতিতে সহীহ

[৮০] আল-ফাতহুল কাবীর, হাদীস-৫৬০৩

[৮১] সুনানুত তিরমিযী, হাদীস-২৯০৫

হাফিযের দায়িত্ব ও কর্তব্য

প্রথম দায়িত্ব ও কর্তব্যঃ কুরআনের হক আদায় করা।

মহান আল্লাহ যেমন মহাসত্য তাঁর কুরআনও তেমন মহাসত্য। মানুষের উপর যেমন তার হক রয়েছে তেমনি কুরআনেরও মানুষের উপর হক রয়েছে। মহাগ্রন্থ আল কুরআনের অনেকগুলো হক থেকে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হক হলো–

১. মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের বৈশিষ্ট্য ও গুণসহ বিশ্বাস করাঃ যেমন- মহাগ্রন্থ আলকুরআন মহান আল্লাহর নাযিলকৃত কিতাব। এ কিতাব সম্পূর্ণ সত্য। তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এতে রয়েছে অতীতের সঠিক ইতিহাসের বর্ণনা। এর ভবিষ্যৎ বাণী সঠিক এবং বাস্তব। হক-বাতিল ও ভালো-মন্দ নির্ণয়ের চূড়ান্ত মানদণ্ড। এতে অপ্রয়োজনীয় একটি শব্দও নেই। একটি আয়াত আরেকটি আয়াতের সাথে সাংঘর্ষিকও নয়। হিদায়াতের একমাত্র ঠিকানা। আল্লাহকে পাবার সুদৃঢ় ব্যবস্থা। সঠিক জ্ঞানগর্ভমূলক উপদেশের আলোকিত পথ। জান্নাতের সরল সঠিক পথ। চরম বিপণ্ণতায় দ্বীনের উপর অবিচল থাকার পথ দেখায়। আল কুরআন বৈজ্ঞানিক সঠিক ও ভুল তথ্য নির্ণয়ের মাপকাঠি।

২. পূর্ণ কুরআনে বিশ্বাস স্থাপন করাঃ এ কথা বিশ্বাস করতে হবে যে, মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর নাযিলকৃত কুরআন আজও পুরোপুরি সংরক্ষিত আছে। এ থেকে এক বিন্দুও পরিবর্তন করা হয় নি। কুরআনের কোন আইন বা বিধি-বিধান নিজের মতের বা দলের বিরুদ্ধে হলেও তা পুরোপুরি মানতে হবে। কোনও আয়াতকে অবিশ্বাস বা অবহেলা করার বিন্দু পরিমানও সুযোগ নেই। মহান আল্লাহ বলেন-

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ

তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশে ঈমান রাখ এবং কিছু অংশ অস্বীকার কর?[৮২]

এই আয়াতে মহান আল্লাহ ইহুদিদের মন্দ চরিত্র তাওরাতের প্রতি ভুল বিশ্বাসের কথা আলোচনা করে আমাদেরকে এ কথা বুঝিয়েছেন 'যদি কেউ তাদের মত কুরআনের কিছু অংশ বিশ্বাস করে এবং কিছু অংশ অস্বীকার করে তাহলে তাদের পরিণতিও ইহুদিদের মতই হবে।' বিস্তারিতঃ ঈমানের ক্ষতিকারক বিশ্বাস ও কাজ না করা শিরোনামের অষ্টম কারণের মধ্যে আলোচনা করা হয়েছে।

৩. কুরআনের শিক্ষা দাওয়াত ও তাবলীগ করাঃ প্রতিটি মুমিনের কাছে বিশেষ করে কুরআনের হাফিযের কাছে কুরআনের এটিও একটি বড় দাবি যে, তারা

[৮২] সূরা বাকারা, আয়াত-৮৫

অন্যকে কুরআন শিক্ষা দিবে এবং কুরআনের দাওয়াত ও তাবলীগ করবে। মহান আল্লাহ বলেন-

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

সুতরাং এমন কেন হয় না যে, তাদের প্রতিটি বড় দল থেকে একটি অংশ (জিহাদে) বের হবে, যাতে (যারা জিহাদে যায় নি) তারা দ্বীনের ইলম অর্জনের চেষ্টা করে এবং যখন তাদের (সেই সব) লোক (যারা জিহাদে গিয়েছে, তারা) তাদের কাছে ফিরে আসবে, তখন তারা তাদেরকে সতর্ক করে, ফলে তারা (গুনাহ থেকে) সতর্ক থাকবে।[৮৩]

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ

হে রাসূল! আপনার প্রতি আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা কিছু নাযিল করা হয়েছে, তা তাবলীগ (প্রচার) করুন।[৮৪]

৪. কুরআনের প্রতি অবহেলা না করাঃ মহান আল্লাহ বলেন-

وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا

আর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায় এ কুরআনকে পুরোপুরিভাবে পরিত্যাগ করেছিল।[৮৫]

নোটঃ এই আয়াতের আলোচনার ধারাবাহিকতার প্রতি লক্ষ্য করলে যদিও বুঝা যায় এখানে সম্প্রদায় বলে অমুসলিমদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যে বক্তব্য আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে মুসলিমদের জন্যও তা ভয়ের কারণ। কেননা, মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও যদি কুরআনকে অবহেলা করা হয় এবং জীবনের পথ চলায় কুরআনের হিদায়াত ও নির্দেশনাকে যথাযথ পালন করা না হয় তাহলে এই কঠিন বাক্যটির আওতায় মুসলিমদেরও পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। ফলে এমনও হতে পারে যে, নবী ﷺ সুপারিশ না করে উল্টো তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়েই দাঁড়িয়ে যাবেন। মহান আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন। আমীন।[৮৬]

৫. কুরআন থেকে দূরে না থাকাঃ মহান আল্লাহ বলেন-

[৮৩] সূরা তাওবা, আয়াত-১২২

[৮৪] সূরা মায়িদা, আয়াত-৬৭

[৮৫] সূরা ফুরকান, আয়াত-৩০

[৮৬] আল্লামা মুফতি তকি ওসমানি দা.বা. সংকলিত তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ •

সেই ব্যক্তি অপেক্ষা জালিম আর কে হতে পারে, যাকে তার রবের আয়াতসমূহ দ্বারা নসীহত করা হলে সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। আমি অবশ্যই এমন জালিমদের থেকে বদলা নিয়ে ছাড়ব।[৮৭]

৬. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশিত পদ্ধতিতে কুরআনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে: রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তাঁর সাহাবীগণ কুরআনের যে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন সেই নীতির আলোকে ব্যাখ্যায় বিশ্বাস করতে হবে। নিজের পক্ষ থেকে মনগড়া কোনো ব্যাখ্যা করা মানে কুরআনের মধ্যে সংযোজন করার নামান্তর। যা সম্পূর্ণ অবৈধ। এ ব্যাপারে হাদীসে কঠোর হুশায়ারি উচ্চারণ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন-

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

অবশ্যই আল্লাহর রাসূলের মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ।[৮৮]

উল্লেখিত আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইবাদত, আমল-আখলাক, বিচার নীতি, কাজ-কর্ম, চিন্তা-চেতনা, কুরআন ও অন্যান্য বিষয়ের প্রতি বিশ্বাসও আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ। সুতরাং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মতই কুরআনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে।

৭. অর্থ ও মর্ম বুঝে কুরআন তিলাওয়াত করা: মহান আল্লাহ বলেন-

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ

(হে রাসূল!) এটি এক বরকতময় কিতাব। যা আমি আপনার প্রতি এই জন্য নাযিল করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহের মধ্যে গবেষণা করে এবং যাতে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ উপদেশ গ্রহণ করে।[৮৯]

কুরআনের সূরা কামারের চারটি আয়াতে এ কথা বলা হয়েছে-

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ

আমি কুরআনকে বুঝার জন্য সহজ করে দিয়েছি। সুতরাং আছে কি কেউ, যে উপদেশ গ্রহণ করবে?[৯০]

নোট: এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, মহান আল্লাহ যত কারণে কুরআনকে সহজ করেছেন, এর মধ্যে 'উপদেশ গ্রহণ, হিফয করা, অর্থ ও বিশ্লেষণ করা

---

[৮৭] সূরা সাজদা, আয়াত-২২
[৮৮] সূরা আহযাব, আয়াত-২১
[৮৯] সূরা সোয়াদ, আয়াত-২৯
[৯০] সূরা কামার, আয়াত-১৭, ২২, ৩২, ৪০

ইত্যাদি। তাহলে আয়াতের একটি অর্থ এভাবে হবে 'আমি কুরআনকে বুঝার জন্য সহজ করে দিয়েছি, সুতরাং আছে কি কেউ, যে বুঝবে?[৯১]

তবে কেউ যদি অর্থ ও মর্ম না বুঝেও কুরআন তিলাওয়াত করে তাহলেও সে সওয়াব লাভ করবে। কিন্তু কুরআনের অর্থ ও মর্ম বুঝে তিলাওয়াত করা আর না বুঝে তিলাওয়াত করার মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। একটি উদাহরণের মাধ্যমে কথাটি বুঝাতে চেষ্টা করছি। আমাদের দেশে ফল-ফলাদি থেকে ভিটামিন বা শক্তি লাভের সাধারণত দু'টি পদ্ধতি রয়েছে। একটি হচ্ছে, ফল-ফলাদি দাঁত দিয়ে চিবিয়ে খাওয়ার মাধ্যমে। আরেকটি হচ্ছে, ফল-ফলাদিকে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে জুস তৈরি করে কোনও পাইপ মুখে দিয়ে পান করার মাধ্যমে। উল্লেখিত দু'টি পদ্ধতির যে কোনও পদ্ধতিতে ফল বা ফলের জুস আহরণ করলে শরীরে শক্তি অর্জিত হয়। তবে দাঁত দিয়ে চিবিয়ে খেলে শরীরে শক্তি হবে এবং জিহ্বার মধ্যে স্বাদ লাগবে। কিন্তু পাইপের সাহায্যে খেলে শরীরে শক্তি হবে তবে জিহ্বার মধ্যে স্বাদ লাগার অনুভূতি ভিন্ন রকম হবে। ঠিক তেমনিভাবে কুরআন শুধু তিলাওয়াত করলে সওয়াব হবে তবে অন্তরের মধ্যে স্বাদ এবং প্রকৃতভাবে যথার্থ উপকৃত হওয়া যাবে না। আর অর্থ ও মর্ম বুঝে তিলাওয়াত করলে সওয়াবও হবে এবং অন্তরের মধ্যে স্বাদ এবং প্রকৃতভাবে বেশি উপকৃতও হওয়া যাবে। এবার পাঠক নিজেই সিদ্ধান্ত নিবেন, আপনি কোন পদ্ধতি অবলম্বন করবেন। মহান আল্লাহ সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার তাওফীক দান করুন।

৮. কুরআনকে তারতীলের সাথে পড়া: মহান আল্লাহ বলেন-

وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا

আপনি ধীর-স্থিরভাবে স্পষ্টরূপে কুরআন তিলাওয়াত করুন।[৯২]

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নত হলো কুরআন ধীরে-ধীরে ও টেনে টেনে তিলাওয়াত করা এবং প্রত্যেক আয়াতের শেষে থামা।[৯৩] এভাবে তিলাওয়াত করলেই তিলাওয়াতের পরিপূর্ণ সওয়াব পাওয়া যাবে এবং এমন তিলাওয়াত শুনলেও তিলাওয়াতের মতই সওয়াব পাওয়া যাবে। তাড়াহুড়ো করে কুরআন পড়তে হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু আমরা ব্যক্তিগতভাবেও তাড়াহুড়ো

---

[৯১] বিস্তারিত: তাফসীরে ইবনে আব্বাস, তাফসীরুল মুয়াসসার, বগবী, জালালাইন ইত্যাদি।
[৯২] সূরা মুযযাম্মিল, আয়াত-৪
[৯৩] উম্মে সালামা রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- كان يقطع قراءته آية آية الحمد لله رب العالمين ثم يقف الرحمن الرحيم ثم يقف.... নবী ﷺ প্রতিটি আয়াত থেমে থেমে পড়তেন। যেমন, আলহামদু . . এরপর থামতেন। তারপর বলতেন আর রাহমানির . . . এভাবেই তিনি পড়া শেষ করতেন। মুসতাদরাকে হাকিম, হাদিস-২৯১০

করে কুরআন তিলাওয়াত করি এবং তারাবীর নামাযেও হাফেযদেরকে দ্রুত পড়তে বাধ্য করি। ফলে কুরআন এবং হাফিযদের সাথে বেয়াদবী হয়। কারণ অনেক তাড়াহুড়ো করে পড়লে কিছু শব্দ মুখেই থেকে যায়। ফলে মুক্তাদিরা পুরো কুরআন শুনতে পারেন না। এতে কোনোভাবেই কুরআন খতমের সওয়াব পাওয়া যায় না। যদি মসজিদের মুসল্লী কিংবা কর্তৃপক্ষ হাফিযদেরকে তাড়াহুড়ো করে পড়তে বাধ্য করেন তাহলে এর জন্য কে দায়ী হবেন তা সহজেই বুঝার কথা। অথচ সুন্নত পদ্ধতিতে তিলাওয়াত করলে হয়ত এক ঘন্টা সময় লাগে। আর তাড়াহুড়ো করে সুন্নতের পরিপন্থী তিলাওয়াত করলে হয়ত ৪০/৪৫ মিনিট সময় লাগে। তাহলে ১০/১৫ মিনিট সময়ের জন্য তাড়াহুড়ো করা মোটেও ঠিক নয়। এতে আমরা মাত্র ১০/১৫ মিনিট সময় বাঁচানোর জন্য অগণিত সওয়াব থেকে বঞ্চিত হচ্ছি। অথচ আমাদের উদ্দেশ্য রাকআত গণনা বা খতম করেছি এ দাবি করা নয়। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে সওয়াব অর্জন করা। আর সওয়াব পেতে হলে অবশ্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদর্শ অনুযায়ী তারাবীর নামাযে কুরআন তিলাওয়াত ও শ্রবণ করতে হবে।[৯৪]

৯. বেশি বেশি তিলাওয়াত না করলে কুরআন ভুলিয়ে দেওয়া হয়: আবদুল্লাহ রাদি. থেকে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন-

بِئْسَ مَا لِأَحَدِهِمْ أَنْ يَقُولَ نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ بَلْ نُسِّيَ وَاسْتَذْكِرُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ مِنَ النَّعَمِ

এটা খুবই খারাপ কথা যে, তোমাদের কেউ বলবে আমি কুরআনের অমুক অমুক আয়াত ভুলে গেছি। বরং তাকে ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং তোমরা কুরআন তিলাওয়াত করতে থাকো। কেননা, তা মানুষের অন্তর থেকে উটের চেয়েও দ্রুতগতিতে চলে যায়।[৯৫]

১০. কুরআন সম্পর্কিত সকল কথা ও কাজে আদব ও সম্মান রক্ষা করা: এর জন্য কয়েকটি কাজ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যথা-

ক. তিলাওয়াতের শুরুতে আউযুবিল্লাহি . . . পড়া উচিত: আল্লাহ বলেন-

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

তোমরা যখন কুরআন পড়বে তখন বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় গ্রহণ করবে।[৯৬]

[৯৪] খুতবাতুল ইসলাম, পৃ. ২৮২
[৯৫] সহীহ বুখারী, হাদীস-৫০৩২; সহীহ মুসলিম, হাদীস-১৮৭৭
[৯৬] সূরা নাহল, আয়াত-৯৮

খ. মহান আল্লাহর নামে কুরআন তিলাওয়াত শুরু করা উচিত: হযরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন-

كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ فَهُوَ أَقْطَعُ

প্রত্যেকটি ভালো কাজ 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' বলে শুরু না করা হলে তা বরকত শূন্য হয়।[৯৭]

গ. সুর দিয়ে দিয়ে পড়ার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা: হযরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন-

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ . قَالَ فَقُلْتُ لِابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَرَأَيْتَ إِذَا لَمْ يَكُنْ حَسَنَ الصَّوْتِ قَالَ يُحَسِّنُهُ مَا اسْتَطَاعَ

যে ব্যক্তি সুর দিয়ে কুরআন না পড়ে সে আমার পরিপূর্ণ উম্মত নয়। হাদীসের বর্ণনাকারী বলেন, আমি ইবনে আবী মুলাইকা রাহি. কে জিজ্ঞাসা করলাম, হে আবু মুহাম্মাদ! ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে আপনার অভিমত কী যে সুন্দর আওয়াজে পড়তে না পারে? তিনি বললেন: সে যথা সম্ভব সুন্দর আওয়াজে পড়ার জন্য চেষ্টা করবে।[৯৮]

সুন্দর কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করা উত্তম: বারা ইবনে আযিব রাদি. থেকে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন-

حَسِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ فَإِنَّ الصَّوْتَ الْحَسَنَ يَزِيدُ الْقُرْآنَ حُسْنًا

সুন্দর কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত কর। কেননা সুন্দর কণ্ঠ কুরআনের সৌন্দর্যকে বাড়িয়ে দেয়।[৯৯]

ঘ. একে অপরকে তিলাওয়াত শোনানো: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদি. থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন-

وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ فَلَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَجْوَدُ . . .

রমযানের প্রতি রাতেই জিবরাঈল আ. তার সাথে দেখা করতেন এবং তারা একে অপরকে কুরআন তিলাওয়াত করে শোনাতেন। নিশ্চয় আল্লাহর রাসূল ﷺ রহমতের বায়ু অপেক্ষাও অধিক দানশীল ছিলেন।[১০০]

[৯৭] আল-জামিউস সগীর, হাদীস-৬২৮৪; মাজমাউয যাওয়াইদ, হাদীস-২৬৩৮
[৯৮] সহীহ বুখারী, হাদীস-৭৫২৭; সুনানু আবু দাউদ, হাদীস-১৪৭৩
[৯৯] শুয়াবুল ঈমান, হাদীস-১৯৫৫
[১০০] সহীহ বুখারী, হাদীস-৬; ই.ফা হাদীস-৫

দ্বিতীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য: যাবতীয় মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকা।

যাবতীয় মন্দ, অন্যায় ও গর্হিত কাজের বিবরণ অনেক দীর্ঘ। তারপরও আমরা এখানে প্রাসঙ্গিক কিছু মন্দ, অন্যায় ও গর্হিত কাজের কথা উল্লেখ করছি। যেমন-

১. শিরক, বিদআত এবং কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা: এ বিষয়ে 'হাফিযের প্রতি কুরআনের দাবি' শিরোনামে ৪, ৫, এবং ৬ নং দাবির মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

২. লেখা-পড়ার বিষয়ে অহেতুক বাড়াবাড়ি না করা: হাদীসে এসেছে-

خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ نَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَفِينَا الأَعْرَابِيُّ وَالأَعْجَمِيُّ فَقَالَ اقْرَءُوا فَكُلٌّ حَسَنٌ وَسَيَجِيءُ أَقْوَامٌ يُقِيمُونَهُ كَمَا يُقَامُ الْقِدْحُ يَتَعَجَّلُونَهُ وَلاَ يَتَأَجَّلُونَهُ

(হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন) আমরা কুরআন পড়ছি। এমন সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ বের হয়ে আমাদের নিকট এলেন। তখন আমাদের মধ্যে আরব বেদুইন এবং অনারব লোকজন ছিল। তিনি বললেন: তোমরা পড়ো। সবাই উত্তম। অচিরেই এমন সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটবে যারা কুরআনকে তীরের ন্যায় ঠিক করবে, (তাজবীদ নিয়ে বাড়াবাড়ি করবে)। তারা কুরআন পাঠে তাড়াহুড়া করবে, অপেক্ষা করবে না।[১০১]

নোট: তাজবীদে নিয়ম-কানুন দুই ধরণের। ১. এমন নিয়ম-কানুন যা না মানলে তিলাওয়াত বিশুদ্ধ হবে না। ২. এমন নিয়ম-কানুন যা না মানলে তিলাওয়াত বিশুদ্ধ হবে তবে সুন্দর হবে না। দ্বিতীয় প্রকার নিয়ম-কানুন নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে। তাজবীদ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে মাকতাবাতুল ইসলাম থেকে প্রকাশিত 'কিতাবুত তাজভীদ' বইটি চমৎকার।

৩. দুনিয়ার মানুষকে খুশি করার জন্য নয় বরং আল্লাহকে খুশি করার নিয়তে যাবতীয় কাজ করা: হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يَنْزِلُ إِلَى الْعِبَادِ لِيَقْضِيَ بَيْنَهُمْ وَكُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٌ فَأَوَّلُ مَنْ يَدْعُو بِهِ رَجُلٌ جَمَعَ الْقُرْآنَ وَرَجُلٌ يَقْتَتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَرَجُلٌ كَثِيرُ الْمَالِ فَيَقُولُ اللَّهُ لِلْقَارِئِ أَلَمْ أُعَلِّمْكَ مَا أَنْزَلْتُ عَلَى رَسُولِي؟ قَالَ بَلَى يَا رَبِّ قَالَ فَمَاذَا عَمِلْتَ فِيمَا عَلِمْتَ؟ قَالَ كُنْتُ أَقُومُ بِهِ آنَاءَ . . . .

মহান আল্লাহ মানুষের মাঝে বিচার করার জন্য কিয়ামত দিবসে তাদের সামনে উপস্থিত হবেন। সকল উম্মত তখন নতজানু অবস্থায় থাকবে। তারপর হিসাব-নিকাশের জন্য সর্বপ্রথম যে ব্যক্তিদের ডাকা হবে তারা হলো কুরআনের হাফিয, আল্লাহর পথের শহীদ এবং প্রচুর সম্পদের মালিক। কুরআনের পাঠককে মহান আল্লাহ প্রশ্ন করবেন, আমি আমার রাসূলের নিকট যা প্রেরণ করেছি তা কি

[১০১] সুনানু আবু দাউদ, হাদীস-৮৩০

তোমাকে শিখিয়েছেন? সে বলবে, হে রব! হ্যাঁ, তিনি শিখিয়েছেন। তিনি বলবেন, তুমি যা শিখেছ সে অনুযায়ী কোন কোন আমল করেছ? সে বলবে আমি রাত-দিন তা তিলাওয়াত করেছি। তখন মহান আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছ। ফিরিশতারাও বলবে, তুমি মিথ্যা বলেছ। আল্লাহ তাকে আরও বলবেন, বরং তুমি ইচ্ছা পোষণ করেছিলে যে, তোমাকে বড় ক্বারী সাহেব, হাফিয সাহেব ডাকা হোক। আর তা তো ডাকা হয়েছে। অতঃপর সম্পদওয়ালা ব্যক্তিকে হাযির করা হবে। আল্লাহ তাকে বলবেন, আমি কী তোমাকে সম্পদশালী বানাই নি? এমনকি তুমি কারো মুখাপেক্ষী ছিলে না? সে বলবে, হে রব! হ্যাঁ, আপনি তা বানিয়েছেন। তিনি বলবেন, আমার দেয়া সম্পদ থেকে তুমি কোন কোন (সৎ) আমল করেছ? সে বলবে, আমি এর দ্বারা আত্মীয়তার সম্পর্ক বহাল রেখেছি এবং দান-খয়রাত করেছি। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছ, ফিরিশতারাও বলবে, তুমি মিথ্যাবাদী। আল্লাহ আরও বলবেন, তুমি ইচ্ছা পোষণ করেছিলে যে, মানুষের নিকট তোমার দানশীল-দানবীর নামের প্রসার হোক আর এরূপ তো হয়েছেই। তারপর যে লোক আল্লাহর রাস্তায় শাহাদাত বরণ করেছে তাকে হাযির করা হবে। আল্লাহ তাকে প্রশ্ন করবেন, তুমি কীভাবে নিহত হয়েছ? সে বলবে, আমি তো আপনার রাস্তায় জিহাদ করতে আদিষ্ট ছিলাম। কাজেই আমি জিহাদ করতে করতে শাহাদাত বরণ করেছি। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছ। ফিরিশতারাও বলবে, তুমি মিথ্যাবাদী। আল্লাহ আরও বলবেন, তুমি ইচ্ছাপোষণ করেছিলে লোকমুখে একথা প্রচার হোক যে, অমুক ব্যক্তি খুব সাহসী বীর। আর তা তো বলা হয়েছে। (হাদীসের বর্ণনাকারী বলেন) তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার হাঁটুতে হাত রেখে বললেন: হে আবু হুরায়রা! কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহর সৃষ্টির মধ্য থেকে এই তিনজনের দ্বারা প্রথমে জাহান্নামের আগুনকে প্রজ্বলিত করা হবে।[১০২]

৪. তারাবির নামাযে বেশি দ্রুতগতিতে তিলাওয়াত করা নিন্দনীয়: তারাবীর নামাযে কুরআন খতম করা সুন্নাত। ছোট-ছোট সূরা দিয়ে তারাবী৹র নামায পড়াও জায়েয আছে। কুরআন তিলাওয়াতের ন্যায় তা শোনাও একইরূপ সওয়াব। এজন্য তারাবীহের নামাযে পরিপূর্ণ আদবের সাথে মনোযোগ দিয়ে কুরআন শুনতে হবে। এতে অনেক সওয়াব হবে। হাদীসে এসেছে-

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

'যে ঈমান ও এক্বিনের সাথে সওয়াবের আশায় রমযানের তারাবীহর নামায পড়বে, তার অতীতের সকল (সগীরা) গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।[১০৩]

[১০২] সুনানুত তিরমিযী, হাদীস-২৩৮২

[১০৩] সহীহ বুখারী, হাদীস-৩৭

তৃতীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য: পরিবার ও সমাজের জন্য করণীয়।

মহান আল্লাহ মানুষের হিদায়াতের জন্য প্রত্যেক জাতির মধ্যে নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। তিনি অনেক নবীর বিবরণ জানিয়েছেন। অনেক নবীর বিবরণ জানান নি। এ জন্য নবী-রাসূলগণের সঠিক সংখ্যা বিষয়ে প্রসিদ্ধ গ্রন্থে নির্ভরযোগ্য কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। সাধারনত সংখ্যার বিষয়ে যে সব তথ্য পাওয়া যায় তা পরস্পর বিরোধী। সবচেয়ে বড় কথা হলো, নবী-রাসূলগণের সংখ্যা জানা ইসলামের মূখ্য বিষয় নয়। বরং তাঁদের বিশ্বাস ও আদর্শ পালন করা আসল উদ্দেশ্য। পবিত্র কুরআনে আমাদের নবীর নামসহ মোট ২৫ জন নবীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআনের এ কথাও বলা হয়েছে যে, সকল নবী-রাসূল পুরুষ মানুষ ছিলেন।

নবী-রাসূলগণের মৌলিক দায়িত্ব বনাম হাফিযদের দায়িত্ব ও চেতনাবোধ

মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী-রাসূলগণের প্রতি যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য মৌলিক দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল সে দায়িত্বগুলো হাফিয এবং আলিমদেরও দায়িত্ব। সেগুলো হচ্ছে-

১. মানুষকে মহান আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করে শুনিয়ে দেওয়া। কিতাবের অর্থ শিখিয়ে দেওয়া। কিতাবের শিক্ষা অনুযায়ী হিকমত বা নববী আদর্শ শিক্ষা দেওয়া। কিতাবের শিক্ষা বিরোধী সব কিছু থেকে মানুষেকে পরিশুদ্ধ করা।[১০৪]

২. মানুষকে মানুষের গোলামী থেকে মুক্ত করে মহান আল্লাহর গোলাম বানিয়ে দেয়া। মহান আল্লাহ বলেন-

رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ

রাসূল তোমাদের সামনে পাঠ করেন সুস্পষ্ট আয়াত। যারা ঈমান এনেছে ও সৎ কর্ম করেছে তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে আনার জন্য।[১০৫]

৩. দাওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমে মানুষের কাছে মহান আল্লাহর দ্বীন পৌঁছে দেওয়া। মহান আল্লাহ বলেন-

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ

হে রাসূল! আপনার প্রতি আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা কিছু নাযিল করা হয়েছে, তা তাবলীগ (প্রচার) করুন।[১০৬]

৪. মানুষকে উত্তম চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত করা। মহান আল্লাহ বলেন-

[১০৪] সূরা বাকারা, আয়াত-১২৯; আলে ইমরান, আয়াত-১৬৪; জুমআ, আয়াত-২

[১০৫] সূরা তালাক, আয়াত-১১; সূরা আহযাব, আয়াত-৪৩

[১০৬] সূরা মায়িদা, আয়াত-৬৭

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

অবশ্যই আল্লাহর রাসূলের মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ।[১০৭]

৫. নির্যাতিত, নিপিড়িত ও বঞ্চিত মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম করা। মহান আল্লাহ বলেন-

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا

হে মুসলিমগণ! তোমাদের জন্য কি বৈধ আছে যে, তোমরা আল্লাহর পথে সেই সকল অসহায় নর-নারী ও শিশুদের জন্য লড়াই করবে না। যারা দুআ করছে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এই জনপদ থেকে অন্যত্র সরিয়ে নাও যার অধিবাসীরা জালিম। আমাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে একজন অভিভাবক বানিয়ে দাও এবং আমাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে একজন সাহায্যকারী দাঁড় করিয়ে দাও।[১০৮]

চতুর্থ দায়িত্ব ও কর্তব্য: দেশ-রাষ্ট্রের জন্য করণীয়।

নবী-রাসূলগণ মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে যে সব মৌলিক দায়িত্ব পালন করেছেন আল্লাহর কুরআনের হাফিয সাহেবগণকেও সে দায়িত্ব পালন করতে হবে। আমরা নবী-রাসূলের উপর আল্লাহ প্রদত্ত দায়িত্ব গুলো আলোচনা করছি। যেমন-

১. দেশ ও রাষ্ট্রের কল্যাণ ও নিরাপত্তার জন্য দু'আ করা। মহান আল্লাহ বলেন-

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

(স্মরণ করুন) যখন ইবরাহীম আ. বলেছিল, হে আমার প্রতিপালক! এটাকে এক নিরাপদ নগর বানিয়ে দেন এবং এর বাসিন্দাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখিরাতে ঈমান আনবে তাদেরকে অনেক রকম ফলের রিযিক দান করুন।[১০৯]

২. দেশ ও রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতিকর কোনো কিছু না করা: মহান আল্লাহ বলেন-

وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

পৃথিবীতে ফ্যাসাদ (অশান্তি, বিশৃঙ্খলা, নৈরাজ্য) বিস্তারের চেষ্টা করো না। নিশ্চিত জেনে রাখ! আল্লাহ ফ্যাসাদ সৃষ্টি পছন্দ করেন না।[১১০]

[১০৭] সূরা আহযাব, আয়াত-২১

[১০৮] সূরা নিসা, আয়াত-৭৫

[১০৯] সূরা বাকারা, আয়াত-১২৬; সূরা ইবরাহীম, আয়াত-৩৫

৩. কল-কারখানা, মিল ফ্যাক্টরি ও শ্রমের মাধ্যমে দেশের আর্থিক উন্নতির চেষ্টা করা: মহান আল্লাহ বলেন-

وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ • أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا •

আমি তার (দাউদের) জন্য লোহাকে নরম করে দিয়েছিলাম। যাতে তুমি পূর্ণ মাপের বর্ম তৈরি কর এবং কড়াসমূহ জোড়ার ক্ষেত্রে পরিমাপ রক্ষা কর। তোমরা সকলে সৎকর্ম কর।[১১১]

আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন-

مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الْغَنَمَ فَقَالَ أَصْحَابُهُ وَأَنْتَ فَقَالَ نَعَمْ كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لِأَهْلِ مَكَّةَ

মহান আল্লাহ এমন কোনও নবী প্রেরণ করেন নি, যিনি বকরি না চড়িয়েছেন। তখন তাঁর সাহাবীগণ বলেনঃ আপনি কী চড়িয়েছেন? তিনি বলেনঃ হ্যাঁ, আমি কয়েক কিরাতের (মুদ্রার) বিনিময়ে মক্কাবাসীদের ছাগল চড়াতাম।[১১২]

৪. ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর জন্য কল্যাণকর দল বা জামাতকে সমর্থন ও সহযোগিতা করা: মহান আল্লাহ বলেন-

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ •

তোমরা সৎকর্ম ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে একে অন্যকে সহযোগিতা করবে। গুনাহ ও জুলুমের কাজে একে অন্যের সহযোগিতা করবে না। আল্লাহকে ভয় করে চলো। নিশ্চয়ই আল্লাহর শাস্তি অতি কঠিন।[১১৩]

৫. আল্লাহর মনোনীত দ্বীনকে আল্লাহর জমিনে প্রতিষ্ঠিত করা: আল্লাহ বলেন-

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

আল্লাহ তো হিদায়াত ও সত্য দ্বীনসহ নিজ রাসূলকে প্রেরণ করেছেন। যাতে তিনি অন্য সব দ্বীনের উপর ইসলামকে জয়যুক্ত করেন। তাতে মুশরিকরা যতই অপ্রীতিকর মনে করুক।[১১৪]

৬. ইসলামের বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার নেতৃত্ব দেওয়া: আমাদের মহানবী ﷺ ইসলামের জন্য দাওয়াত ও তাবলিগ করেছেন। এক পর্যায়ে তিনি মহান আল্লাহর কাছে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার জন্য দু'আ করলেন। আল্লাহ বলেন-

وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا

[১১০] সূরা কাসাস, আয়াত-৭৭; সূরা বাকারা, আয়াত-২০৫

[১১১] সূরা সাবা, আয়াত-১০, ১১

[১১২] সহীহ বুখারী, হাদীস-২২৬২

[১১৩] সূরা মায়িদা, আয়াত-২

[১১৪] সূরা তাওবা, আয়াত-৩৩; সূরা ফাতাহ, আয়াত-২৮; সূরা ছফ, আয়াত-৯

আমাকে আপনার নিকট থেকে বিশেষভাবে এমন ক্ষমতা দান করুন, যার সাথে আপনার সাহায্য থাকবে।[১১৫]

আয়াতের ব্যাখ্যা: হাসান বসরি রাহি. বলেন: এই আয়াতে মহান আল্লাহ পারস্য ও রোম সাম্রাজ্য এবং তাদের সম্মান রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দান করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। হযরত কাতাদাহ রাহি. বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ জানতে পারলেন যে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ছাড়া দ্বীনের প্রচার এবং দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। এজন্য তিনি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভের জন্য দুআ করেছিলেন। যেন ইসলামের দণ্ডবিধি, ফরযসমূহ এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা যায়। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ করা মহান আল্লাহর এক বিরাট অনুগ্রহ। যদি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা না হতো তবে একে অপরের সর্বস্ব লুণ্ঠন করতো। সমাজের শক্তিশালীরা দুর্বলদেরকে নিঃস্ব করত। আল্লামা ইবনু জারীর রাহি. উল্লেখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় কয়েকটি মতামত থেকে হাসান বসরি রাহি. এবং হযরত কাতাদাহ রাহি. এর অভিমতকে গ্রহণ করেছেন এবং বলেছেন তাদের অভিমতই বেশি গ্রহণযোগ্য। কারণ, হক ও সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য ক্ষমতার প্রয়োজন। যেন সত্যের বিরোদ্ধচারণকারীদেরকে দমন করে রাখা যায়।[১১৬] বর্তমান সময়ে আমাদের সমাজ এবং রাষ্ট্রে ইসলাম প্রতিষ্ঠার ইসলামি আন্দোলন ও সংগ্রামকে কোনঠাসা করে রাখা হয়েছে। কোনো কোনো সহজ সরল মুমিন বলে থাকে যে, মোল্লা-মৌলভীরা রাজনীতি করবে কেন? মসজিদের ইমাম-মুয়াজ্জিন হয়ে রাজনীতির কথা বলবে কেন? এসব চিন্তা-চেতনা ঈমান-ইসলামের জন্য কতটা ভয়ঙ্কর ক্ষতিকারক তা বুঝতে পারেন না অনেক সরল মুমিনগণ। আমি আপনাদেরকে একটু বুঝিয়ে বলছি।

সূরা বনী ইসরাঈলের ৮০ নং আয়াত থেকে জানা গেছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইসলাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাষ্ট্র ক্ষমতা লাভের জন্য মহান আল্লাহর নিকট বিনীতভাবে দুআ করেছেন। সুতরাং কেউ যদি ইসলাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাষ্ট্র ক্ষমতা লাভের জন্য রাজনীতি করে তাহলে সেটা হবে প্রশংসনীয় এবং অনেক সওয়াবের কাজ। পক্ষান্তরে কেউ যদি ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য রাজনীতি না করে তাহলে সেটা হবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পছন্দনীয় বিষয়কে অপছন্দ করা, যা মুমিনের জন্য একটি ঘৃণিত অপরাধ। তবে যদি কেউ ইসলামি আইন কিংবা ইসলাম প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা কওে তাহলে তার ঈমান থাকবে কিনা আমরা এব্যাপারে 'ঈমানের ক্ষতিকারক বিশ্বাস ও কাজ না করা' শিরোনামে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

[১১৫] সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত-৮০

[১১৬] সূরা বনী ইসরাঈলের ৮০ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে ইবনে কাসীর।

হাফিযের প্রতি কুরআনের দাবি

প্রিয় পাঠক! আপনি কুরআনকে ভালো করে পাঠ করলে বুঝতে পারবেন প্রতিটি মুমিনের কাছে কুরআন কী কী দাবি করে? একজন সাধারণ মুমিনের প্রতি কুরআন যে সব দাবি করে হাফিযের প্রতিও কুরআন একই দাবি করে। সুতরাং সহজেই বুঝতে পারছেন কুরআনের দাবি কী পরিমাণ। আমরা কুরআনের দাবি থেকে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি দাবি আলোচনা করছি। আশা করি কুরআনের নির্ভরযোগ্য তাফসীর থেকে আরও বেশি করে জেনে তা মেনে চলার চেষ্টা করবেন। মহান আল্লাহ সকলকে পুরোপুরি তাওফীক দান করুন।

প্রথম দাবি: কুরআনের হক আদায় করা।

হাফিযের দায়িত্ব ও কর্তব্য শিরোনামে কুরআনের ১০ টি হক আলোচনা করেছি। সেখান থেকে দেখে নিলে ভালো হয়।

দ্বিতীয় দাবি: সঠিক আকিদা ও বিশ্বাস স্থাপন করা।

ঈমান সম্পর্কিত সঠিক আকিদায় বিশ্বাসী হওয়ার আলোচনা অনেক দীর্ঘ। তবে সংক্ষেপে এ কথা বলা যায় যে, ঈমানের ৬টি রুকনে বিশ্বাসী হলে একজন মানুষ সঠিক আকিদার বিশ্বাসী বলে গণ্য হবে। কেননা, কোনো ব্যক্তি নিজেকে তখনই একজন মুমিন বলে দাবি করতে পারবে যখন সে ঈমানের ৬ টি রুকন মনেপ্রাণে বিশ্বাস করবে এবং মুখে তা স্বীকার করবে। এর মধ্যে কোন একটিও অবিশ্বাস কিংবা অস্বীকার করলে ঈমান থাকবে না।[১১৭] এজন্য প্রতিটি মুমিনের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে ঈমানের ৬ টি রুকন ভালোভাবে জেনে তা বিশ্বাস করা ও স্বীকার করা এবং পুরোপুরি মেনে চলা। কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে রুকনগুলো আলোচনা করা হয়েছে। সহীহ মুসলিমে ঈমানের ৬ টি রুকনকে একসাথে আলোচনা করা হয়েছে।[১১৮] আমাদের ক্ষুদ্র বইটিতে ঈমানের রুকনগুলোকে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করব।

---

[১১৭] ঈমানের ৬ টি রুকনের কোনো একটি অবিশ্বাস কিংবা অস্বীকার করলে যেমন ঈমান ভঙ্গ হয়ে যায়, তেমনিভাবে আরও কিছু কারণে ঈমান ভেঙ্গে যায়। আমাদের এই বইয়ে ঈমানের ক্ষতিকারক ১০ টি কারণ শিরোনামে বিস্তারীত আলোচনা করেছি।

[১১৮] হাদিসে এসেছে- أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ (একদিন জিবরাঈল আ. মানব আকৃতিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এলেন। তাঁকে কয়েকটি প্রশ্ন করলেন। এর মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিল 'আপনি আমাকে ঈমান সম্পর্কে অবহিত করুন। তখন তিনি বললেন) আল্লাহর উপর, তাঁর ফিরিশতাগণের উপর, তাঁর কিতাব

ঈমানের ৬ টি রুকনের বিস্তারিত আলোচনা

ঈমানের প্রথম রুকন: আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা। মহান আল্লাহ বলেন-

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ

রাসূল বিশ্বাস রাখেন ঐ সমস্ত বিষয় সম্পর্কে যা তার রবের পক্ষ থেকে তার কাছে অবতীর্ণ হয়েছে এবং মুমিনরাও বিশ্বাস রাখে। সবাই বিশ্বাস রাখে ১. আল্লাহ্‌র প্রতি, ২. তার ফিরিশতাদের প্রতি, ৩. তার গ্রন্থসমূহের প্রতি এবং ৪. তার রাসূলগণের প্রতি।[১১৯]

আল্লাহ সম্পর্কে মুমিনের বিশ্বাস: আল্লাহ এক। তাঁর কোনো শরিক নেই। সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি কারো মুখাপেক্ষি নন। তাঁর কোনো সন্তান নেই। তিনিও কারো সন্তান নন। তিনি আসমান ও জমিনের মালিক। তিনিই সকল ক্ষমতার উৎস। তাঁর এবং তাঁর দেওয়া ধর্ম বিশ্বাস করতে হবে। এর মধ্যে নিরপেক্ষ মতবাদে বিশ্বাস করার সামান্যতম সুযোগও নেই। ধর্মের ব্যাপারে নিরপেক্ষ মানে ধর্মের ব্যাপারে অনাস্থা এবং অবিশ্বাস। ধর্মের ব্যাপারে অন্তরে অনাস্থা এবং অবিশ্বাস লালন করে মৌখিকভাবে জনসম্মুখে ধর্মীয় পরিচয় প্রদান করা গুরুতর অন্যায় এবং অমার্জনীয় অপরাধ।

আল্লাহ সম্পর্কে কাফের, মুশরিক ও হিন্দুদের বিশ্বাস: 'আল্লাহ আছেন। তিনি একা নন। তাঁর অনেক শরিক আছে।' এজন্য কাফের, মুশরিক ও হিন্দুরা বিভিন্ন মূর্তির পূজাঁ করে। তারা এটাও বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ এককভাবে সকল ক্ষমতার মালিক নন। বরং তাঁর সাথে আরও শরিক আছে।

আল্লাহ সম্পর্কে ইহুদিদের বিশ্বাস: উযাইর আল্লাহর পুত্র।[১২০] বাইবেলে তাকে আযরা নামে উল্লেখ করা হয়েছে। যদিও সকল ইহুদিরা উযাইরকে আল্লাহর পুত্র বলে বিশ্বাস করে না। যে সব ইহুদিরা উযাইরকে আল্লাহর পুত্র বলে বিশ্বাস করে না তারা মুহাম্মাদ ﷺ এবং কুরআনকে বিশ্বাস করে না। এখানে উযাইর সম্পর্কে মুসলিমের বিশ্বাস হচ্ছে 'কুরআনে উযাইর এর নাম এসেছে, কিন্তু তিনি নবী কিনা তা বলা হয় নি। কোনো কোনো বিবরণে তাকে একজন নবীও বলা হয়েছে। তবে কোনো কোনো বিবরণে পাওয়া যায়, নবী ﷺ বলেছেন 'উযাইর নবী কিনা তা আমার জানা নেই।'[১২১] তবে তিনি আল্লাহর পুত্র নন।'

সমূহের উপর, তাঁর রাসূলগণের উপর, পরকালের উপর এবং তাকদিরের ভালো-মন্দের উপর ঈমান গ্রহণ করা। সহীহ মুসলিম, হাদীস-১০২; সুনানু আবু দাউদ, হাদীস-৪৬৯৭

[১১৯] সূরা বাকারা, আয়াত-২৮৫

[১২০] সূরা তাওবা, আয়াত-৩০

[১২১] জামিউল উসূল ফী আহাদিসির রাসূল, হাদীস-৭৮২৯; মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস-৩১১৭

আল্লাহ সম্পর্কে খৃষ্টানদের বিশ্বাস: খৃষ্টানদের একদল মসীহ (ঈসা আঃ) ইবনে মারইয়ামকে আল্লাহর পুত্র বলে বিশ্বাস করে।[১২২] আরেক দল ঈসাকেই সরাসরি আল্লাহ বলে বিশ্বাস করে।[১২৩] এখানে মুসলিমের বিশ্বাস হচ্ছে 'হযরত ঈসা আ. মহান আল্লাহর প্রেরিত একজন নবী। তিনি আল্লাহর পুত্র নন।'[১২৪]

ঈমানের দ্বিতীয় রুকন: ফিরিশতাগণের প্রতি ঈমান আনা।[১২৫]

ফিরিশতা শব্দটি ফার্সি। এর আরবী হচ্ছে 'মালাক/মালায়িকা'। বহুল ব্যবহারের বিবেচনায় আমরা ফিরিশতা শব্দ ব্যবহার করছি। ফিরিশতা সম্পর্কে মৌলিক কিছু আকিদার কথা জেনে রাখা ভালো। যেমন- ১. ফিরিশতা মানবীয় দুর্বলতা এবং কামনা বাসনা থেকে মুক্ত। অর্থাৎ পানাহার এবং নারী-পুরুষ হওয়া ও সন্তান জন্ম দেওয়া থেকে পবিত্র। ২. মহান আল্লাহর হুকুম পালনে একনিষ্ঠ এবং তাঁর কোনো নির্দেশ অমান্য করেন না। ৩. চারজন ফিরিশতা ছাড়া অন্য ফিরিশতার নাম জানা যায় না। চারজনের নাম: ক. জিবরাঈল আ., খ. আজরাঈল আ., গ. ইসরাফিল আ., ঘ. মিকাঈল আ.। ৪. তাদের সঠিক সংখ্যাও কারো জানা নেই। তবে একটি হাদীস থেকে কিছু ধারণা পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন-

هَذَا الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ يُصَلِّي فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ إِذَا خَرَجُوا لَمْ يَعُودُوا إِلَيْهِ

(আমি জিবরাঈলকে জিজ্ঞাসা করলাম, এটা কী? তিনি বললেন) এটা বাইতুল মামূর। এখানে প্রতিদিন ৭০ হাজার ফিরিশতা নামায আদায় করেন। একবার বের হলে এখানে আর ফিরে আসেন না।[১২৬]

এই হাদীস থেকে জানা গেল যে ফিরিশতাদের সংখ্যা কারো জানা সম্ভব নয়। ৫. ফিরিশতারা মহান রবের পক্ষ থেকে নবী-রাসূলের কাছে যা নিয়ে এসেছেন তাতে পূর্ণ আমানত ও সততার সাথে তাঁদের কাছে পৌছিয়েছেন। এতে বিন্দু পরিমাণ অলসতা কিংবা ভুল করেন নি। ৬. তাঁরা মহান আল্লাহর কুদরতে যেভাবে ইচ্ছা সেভাবেই আত্মপ্রকাশ করতে পারেন। ৭. তাঁরা সর্বদা মহান রবের বিভিন্ন ইবাদতে ব্যস্ত থাকেন। ৮. তাদেরকে দেখা যায় না। তবে ফিরিশতা নূরের তৈরি। হাদীসে এসেছে-

خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ

[১২২] সূরা তাওবা, আয়াত-৩০
[১২৩] সূরা মায়িদা, আয়াত-৭২
[১২৪] সূরা নিসা, আয়াত-১৭১
[১২৫] সূরা বাকারা, আয়াত-২৮৫
[১২৬] সহীহ বুখারী, হাদীস-৩২০৭

ফিরিশতাকে সৃষ্টি করা হয়েছে নূর থেকে।[১২৭]

৯. দুনিয়া ও আখিরাতের বিভিন্ন কাজে মহান আল্লাহ ফিরিশতাকে নিয়োগ করেছেন। ১০. তাঁরা মহান আল্লাহর কোনও ধরণের অবাধ্যতা করেন না। মহান আল্লাহ বলেন-

عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

(জাহান্নাম) পরিচালনার কাজে কঠোর স্বভাব, কঠিন হৃদয়ের ফিরিশতা নিয়োজিত আছে। যারা আল্লাহর হুকুমের কোনো অবাধ্যতা করে না। তারা সেটাই করে যার নির্দেশ তাদেরকে দেওয়া হয়।[১২৮]

প্রিয় পাঠক! কুরআন-হাদীস থেকে জানা যায় যে, ফিরিশতাদের মৌলিক দায়িত্ব ১০ টি। আমাদের বইয়ের পরবর্তী সংস্করণে লেখার চেষ্টা করব। ইনশাআল্লাহ।

ঈমানের তৃতীয় রুকন: সকল আসমানি কিতাবের প্রতি ঈমান আনা।[১২৯]

মহান আল্লাহ যত আসমানি কিতাব নাযিল করেছেন এর মধ্যে চারটি বড় ও সুপ্রসিদ্ধ। তাওরাত নাযিল করেছেন হযরত মূসা আ. এর উপর। যাবুর নাযিল করেছেন হযরত দাউদ আ. এর উপর। ইঞ্জিল নাযিল করেছেন হযরত ঈসা আ. এর উপর এবং মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর নাযিল করেছেন আলকুরআন।[১৩০]

আসমানি কিতাবের উপর ঈমান আনার মর্ম ও প্রকৃত মুমিনের বিশ্বাস: একজন মুমিনকে অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে যে মহান আল্লাহ তাওরাত, যাবুর এবং ইঞ্জিল নাযিল করেছেন। একথাও মুমিনকে বিশ্বাস করতে হবে যে, সে সব কিতাবের পণ্ডিতগণ তা বিকৃত করেছে এবং নিজেদের সুবিধা মতো সংযোজন ও বিয়োজন করেছে। বর্তমানে সে সব কিতাব মহান আল্লাহ যেভাবে নাযিল করেছিলেন সে অবস্থায় নেই। পবিত্র কুরআনের কয়েকটি স্থানে সে সব পণ্ডিতের দুষ্কর্মের কথাগুলো বলা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন-

وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

তাদের মধ্যে একদল এমন ছিল যারা আল্লাহর কালাম শুনত। অতঃপর তারা তা ভালোভাবে বোঝার পরও জেনে-শুনে তাতে বিকৃতি ঘটাত।[১৩১]

আল-কুরআনের ওপর ঈমান আনার মর্ম ও সতর্কতা: একজন মুমিনের অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে যে, সম্পূর্ণ কুরআন মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। এর

[১২৭] সহীহ মুসলিম, হাদীস-৭৬৮৭
[১২৮] সূরা তাহরীম, আয়াত-৬
[১২৯] সূরা বাকারা, আয়াত-২৮৫
[১৩০] সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত-২; এবং ৫৫; হাদীদ, আয়াত-২৭; যুমার, আয়াত-২
[১৩১] সূরা বাকারা, আয়াত-৭৫; সূরা নিসা, আয়াত-৪৬; সূরা মায়িদা, আয়াত-১৩ ও ৪১

মধ্যে সামান্য পরিমাণ কম-বেশ করা হয় নি। মহান আল্লাহ কুরআনে যা বলেছেন তা সব সত্য। সুতরাং কুরআনের আইন এবং অন্যান্য সকল কথা নিঃসন্দেহে মেনে নিতে হবে। যারা নিঃসন্দেহে না মানবে তাদের ঈমান থাকবে না।সমাজে এমন মানুষও আছে যে কুরআনের বিশ্বাসের দাবি করে কিন্তু কুরআনের আইনের কথা বললে বিশ্বাস করতে চায় না ও মানতে চায় না। তাদের অবস্থা কী হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আমরা 'ঈমানের ক্ষতিকারক বিশ্বাস ও কাজ না করা' শিরোনামে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। সেখান থেকে দেখে নিলে ভালো হয়।

ঈমানের চতুর্থ রুকনঃ আল্লাহর রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনা।[১৩২]

মহান আল্লাহ মানুষের হিদায়াতের জন্য প্রত্যেক জাতির মধ্যে নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন।[১৩৩] তিনি অনেক নবীর বিবরণ জানিয়েছেন। অনেক নবীর বিবরণ জানান নি।[১৩৪] এ জন্য নবী-রাসূলগণের সঠিক সংখ্যা বিষয়ে প্রসিদ্ধ গ্রন্থে নির্ভরযোগ্য কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। সাধারনত সংখ্যার বিষয়ে যে সব তথ্য পাওয়া যায় তা পরস্পর বিরোধী। সবচেয়ে বড় কথা হলো, নবী-রাসূলগণের সংখ্যা জানা ইসলামের মূখ্য বিষয় নয়। বরং তাদের বিশ্বাস এবং আদর্শ পালন করা আসল উদ্দেশ্য। পবিত্র কুরআনে আমাদের নবীর নামসহ মোট ২৫ জন নবীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে।[১৩৫] কুরআনে এ কথাও বলা হয়েছে যে, সকল নবী-রাসূলই পুরুষ ছিলেন।[১৩৬]

নবী-রাসূলগণের মৌলিক দায়িত্ব ও আমাদের চেতনাবোধঃ মহান আল্লাহ প্রদত্ত নবী-রাসূলগণের প্রতি উল্লেখযোগ্য কয়েকটি মৌলিক দায়িত্ব হলো-

১. মানুষকে মহান আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করে শুনিয়ে দেওয়া। কিতাবের অর্থ শিখিয়ে দেওয়া। কিতাবের শিক্ষা অনুযায়ী হিকমত বা নববী আদর্শ শিক্ষা দেওয়া। কিতাবের শিক্ষার বিরোধী সব কিছু থেকে মানুষের জীবনকে ।[১৩৭] ২. মানুষকে মানুষের গোলামী থেকে মুক্ত করে মহান আল্লাহর গোলাম বানিয়ে দেয়া।[১৩৮] ৩. মহান আল্লাহর মনোনীত দ্বীনকে আল্লাহর জমিনে প্রতিষ্ঠিত

[১৩২] সূরা বাকারা, আয়াত-২৮৫

[১৩৩] সূরা ফাতির, আয়াত-২৪; ইউনুস, আয়াত-৪৭; রাদ, আয়াত-৭

[১৩৪] সূরা নিসা, আয়াত-৬৪; সূরা গাফির/মু'মিন আয়াত-৭৮

[১৩৫] আদম, ইদ্রিস, নূহ, হুদ, সালিহ, লুত, ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব, ইউসুফ, আইয়ূব, শুয়াইব, মূসা, হারুন, ইউনুস, দাউদ, সুলাইমান, ইলয়াস, ইলয়াসা, যুলকিফল, যাকারিয়া, ইয়াহইয়া, ঈসা এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহিমুস সালাম।

[১৩৬] সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত-৯৩; কাহাফ, আয়াত-১১০

[১৩৭] সূরা বাকারা, আয়াত-১২৯; আলে ইমরান, আয়াত-১৬৪; জুমআ, আয়াত-২

[১৩৮] সূরা ইবরাহীম, আয়াত-৫; সূরা আহযাব, আয়াত-৪৩

করা।[১৩৯] ৪. দাওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমে মানুষের কাছে মহান আল্লাহর দ্বীন পৌঁছে দেওয়া।[১৪০] ৫. মানুষকে উত্তম চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত করা।[১৪১] ৬. নির্যাতিত, নিপিড়িত ও বঞ্চিত মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম করা।[১৪২] ৭. ইসলামের বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার নেতৃত্ব দেওয়া। তা সম্ভব না হলে ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সহযোগিতা করা। মহান আল্লাহ বলেন-

وَاجْعَلْ لِّي مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا

আমাকে আপনার নিকট থেকে বিশেষভাবে এমন ক্ষমতা দান করুন, যার সাথে আপনার সাহায্য থাকবে।[১৪৩]

আয়াতের ব্যাখ্যাঃ হাফিযের 'চতুর্থ দায়িত্ব ও কর্তব্যঃ দেশ-রাষ্ট্রের জন্য করণীয়' শিরোনামে ৬ নং এর মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

ঈমানের পঞ্চম রুকনঃ আখিরাতের প্রতি ঈমান আনা। মহান আল্লাহ বলেন-

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ

যারা ঈমান রাখে আপনার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে এবং পূর্বে যা নাযিল করা হয়েছে তাতেও। এবং ঈমান রাখে আখিরাতের উপর পরিপূর্ণভাবে।[১৪৪]

পরকাল সম্পর্কিত সঠিক বিশ্বাসঃ মুমিনকে অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে মৃত্যু মানেই জীবনের শেষ নয়। মৃত্যুর পর কবরে দীর্ঘকাল থাকতে হবে। এরপর সেখান থেকে আবার উঠানো হবে। সমবেত করা হবে হাশরের মাঠে। তারপর শুরু হবে বিচার। তখন জীবনের সব কিছুর হিসাব সেখানে নেওয়া হবে। পরকালের বিশ্বাস যার যত কম হবে তার খারাপ কাজ তত বেশি হবে। পরকালের বিশ্বাস মানুষকে সৎপথে চলতে আগ্রহী করে।

পরকাল সম্পর্কিত ভুল বিশ্বাসঃ আমাদের সমাজে হিন্দুদের রীতিনীতির প্রভাবে তাদের কিছু বিশ্বাস কোনো কোনো মুমিনের মধ্যে প্রভাব ফেলেছে। এর মধ্যে একটি হচ্ছে পরকাল সম্পর্কিত বিশ্বাস। হিন্দুরা পুনঃজন্ম বিশ্বাস করে। অর্থাৎ এই পৃথিবীতে কেউ ভালো কাজ করলে মৃত্যুর পর সে আবার ভালো মানুষ হয়ে জন্ম গ্রহণ করবে। এভাবে একজন মানুষ পৃথিবীতে জন্মের পর যতবার ভালো কাজ করবে ততবার সে মানুষ হয়ে জন্ম গ্রহণ করবে। যখন সে পৃথিবীতে

[১৩৯] সূরা তাওবা, আয়াত-৩৩; সূরা ফাতাহ, আয়াত-২৮; সূরা ছফ, আয়াত-৯

[১৪০] সূরা মায়িদা, আয়াত-৬৭

[১৪১] সূরা আহযাব, আয়াত-২১

[১৪২] সূরা নিসা, আয়াত-৭৫

[১৪৩] সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত-৮০

[১৪৪] সূরা বাকারা, আয়াত-৪

অন্যায় কাজ করে মৃত্যুবরণ করবে তখন সে তার কর্ম অনুযায়ী বিভিন্ন পশুর আকৃতিতে জন্ম গ্রহণ করবে। মুমিনের বিশ্বাস হলো, পৃথিবীতে কেউ ভালো কাজ করলে কবরে শান্তিতে থাকবে। হাশরের মাঠে ভালো থাকবে। বিচার শেষে জান্নাতে যাবে। অপরাধী হলে জাহান্নামে যাবে। ঈমান থাকলে জাহান্নামে নির্ধারিত শাস্তি ভোগ করে জান্নাতে যাবে। কিন্তু পুনঃজন্ম হবে না।

ঈমানের ষষ্ঠ রুকন: তাকদিরের (ভাগ্যের) ভালো-মন্দের প্রতি ঈমান আনা। মহান আল্লাহ বলেন-

وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ

(মুনাফিকদের) কোন কল্যাণ এলে, তারা বলে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে। পক্ষান্তরে যদি মন্দ কিছু ঘটে, তবে তারা আপনাকে বলে, এ মন্দটা আপনার কারণেই ঘটেছে। আপনি বলুন, সবকিছুই আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘটে।[১৪৫]

প্রিয় পাঠক! তাকদির বা ভাগ্য সম্পর্কে সুদীর্ঘ আলোচনার প্রয়োজন। কিন্তু সঙ্গত কারণে আমাদের বইয়ের কলেবর ছোট হওয়ার কারণে তাকদির সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করছি না। তবে কয়েকটি মৌলিক কথা বলার চেষ্টা করছি।

তাকদির সম্পর্কে সঠিক বিশ্বাস বনাম ভুল বিশ্বাস

১. ভাগ্যে যা আছে তাই হবে। একথা বলে প্রচেষ্টা ও কাজ-কর্ম থেকে বিরত থাকা ভুল। বরং সঠিক বিশ্বাসের পর পূর্ণ প্রচেষ্টা এবং কাজ-কর্ম করা কর্তব্য। ২. কোনো কাজে সফল হবার পর 'আমার বুদ্ধি এবং চেষ্টায় অমুক কাজে সফল হয়েছি' একথা বলা ভুল। সফলতার পরও 'মহান আল্লাহই আমাকে সফলতা দান করেছেন' বলা উচিত এবং কর্তব্য।[১৪৬] ৩. কোনো সমস্যা বা সংকটের সময়ে 'আমার ভাগ্য খারাপ কিংবা বলল আমার ভাগ্যে কি নিয়ে আসলাম, আমার ভাগ্যে কেন এমন লেখা' এমন কথা বলা অন্যায়। কারণ, কেউ ভাগ্যের মালিক নয়। ভাগ্যের মালিক একমাত্র মহান আল্লাহ। হাদীসে এসেছে-

كَتَبَ اللَّهُ مَقَادِيرَ الْخَلاَئِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ

মহান আল্লাহ আসমান-জমিন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বেই তাঁর সকল সৃষ্টির ভাগ্য (জীবন-মৃত্যু, রিযিক ইত্যাদি) লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন।[১৪৭]

তৃতীয় দাবি: ঈমানের জন্য ক্ষতিকারক কিছু বিশ্বাস ও কাজ না করা।

---

[১৪৫] সূরা নিসা, আয়াত-৭৮

[১৪৬] সূরা নিসা, আয়াত-১১৩; মায়িদা, আয়াত-২০; নামল, আয়াত-১৫; আলাক, আয়াত-৫

[১৪৭] সহীহ মুসলিম, হাদীস- ৬৯১৯

প্রিয় পাঠক! ঈমানের ক্ষতিকারক জিনিস দু'ধরণের। এক. এমন জিনিস, যার দ্বারা ঈমানের কিছুটা ঘাটতি দেখা দেয়, তবে ঈমান ভঙ্গ হয় না। এগুলোর সংখ্যা অনেক। যেমন- শিরকে আসগার বা ক্ষুদ্রতর শিরক, বিদআত, কবীরা গুনাহ, সগীরা গুনাহ ইত্যাদি। এগুলোর আলোচনা বিভিন্ন শিরোনামে করা হয়েছে। তবে সগীরা গুনাহর আলোচনা করা হয় নি। দুই. এমন জিনিস, যার দ্বারা ঈমানের মধ্যে এমন সমস্যা দেখা দেয়, যার দ্বারা ঈমান ভঙ্গ হয়ে যায়। ঈমানের ক্ষতিকারক জিনিসগুলোকে ঈমান ভঙ্গ শব্দ ব্যবহার করে আলোচনা করবো। আমরা অনেকেই ওযু, নামায, রোযা ইত্যাদি ভঙ্গ হওয়ার কারণ জানি। যেভাবে ওযু, নামায, রোযা ইত্যাদি ভঙ্গ হওয়ার কারণ রয়েছে তেমনিভাবে ঈমান ভঙ্গেরও কিছু কারণ রয়েছে। আমরা অনেকেই ঈমান ভঙ্গের কারণগুলো জানি না। সকল মুমিনের জন্য ঈমান ভঙ্গের কারণগুলো ভালো করে জানা আবশ্যক। কারণ ঈমান ভঙ্গ হলে নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত, কুরআন তিলাওয়াত এবং অন্যান্য সকল আমল বাতিল হয়ে যাবে। এসব আমল কোনো কাজে আসবে না। আমরা এখানে ঈমান ভঙ্গের কিছু কারণ সংক্ষেপে আলোচনা করেছি। আমরা সকলেই ঈমান ভঙ্গের কারণগুলো নিজেরা ভালো করে জানব এবং মেনে চলার চেষ্টা করব। অন্যদেরকেও জানাতে চেষ্টা করব। ইনশাআল্লাহ। তবে বিজ্ঞ আলেম ছাড়া সাধারণ কোনো পাঠক এ বিষয়ে কারো ব্যাপারে ফাতওয়া দেওয়া থেকে অবশ্যই বিরত থাকবো।

ঈমান ভঙ্গের প্রথম কারণ: ঈমানের রুকন সম্পর্কিত বিশ্বাস ও কর্ম।

কোনো ব্যক্তি ঈমান গ্রহণের পর কিংবা মুমিন হিসেবে জন্ম গ্রহণের পর ঈমানের ৬ টি রুকন থেকে কোনো একটি রুকনকে অবিশ্বাস করলেই ঈমান ভেঙ্গে যাবে। আমাদের এই বইয়ে ঈমানের ৬ টি রুকনের মধ্যে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। সেখান থেকে পড়ার অনুরোধ করছি।

ঈমান ভঙ্গের দ্বিতীয় কারণ: তাওহিদের বিপরীতে শিরক সম্পর্কিত বিশ্বাস ও কর্ম।

প্রিয় পাঠক! আমাদের এই বইয়ে 'শিরক ঘৃণিত অপরাধ' শিরোনামে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। সেখান থেকে পড়ার অনুরোধ করছি।

ঈমান ভঙ্গের তৃতীয় কারণ: রাসূল এবং তাঁর আদর্শ সম্পর্কিত বিশ্বাস ও কর্ম।

ক. মুহাম্মদ ﷺ-কে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বশেষ নবী ও রাসূল হিসেবে বিশ্বাস না করলে ঈমান ভেঙ্গে যাবে। খ. রাসূলুল্লাহ ﷺ এর আদর্শ, বিচার ব্যবস্থা থেকে অন্য কোনও আদর্শ, জীবন ব্যবস্থাকে প্রাধান্য দেওয়া হলে কিংবা অন্য কোনও পথ ও মতকে অধিক পরিপূর্ণ বা উত্তম বলে বিশ্বাস করলে এবং মেনে

নিলে ঈমান ভেঙ্গে যাবে। গ. রাসূলকে মানুষ বলে বিশ্বাস না করলে ঈমান ভঙ্গ হয়ে যাবে। ঘ. রাসূলের মৃত্যুতে বিশ্বাস না করলেও ঈমান ভঙ্গ হয়ে যাবে।

ক. মুহাম্মদ ﷺ সর্বশেষ নবী ও রাসূল। মহান আল্লাহ বলেন-

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ

(হে মুমিনগণ) মুহাম্মাদ ﷺ তোমাদের কোনও পুরুষের পিতা নন, কিন্তু তিনি আল্লাহর রাসূল এবং নবীদের মধ্যে সর্বশেষ।[১৪৮]

প্রিয় পাঠক! এই আয়াতটিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সর্বশেষ রাসূল বলা হয়েছে। সুতরাং যারা তাঁকে সর্বশেষ নবী ও রাসূল বিশ্বাস না করবে এবং না মানবে তাদের ঈমান থাকবে না। বর্তমান সময়ে কাদিয়ানি নামে একটি সম্প্রদায় রয়েছে। তাদের বিশ্বাস হচ্ছে 'মুহাম্মাদ ﷺ সর্বশেষ নবী নন। তারপর আরও নবী আগমন করবে। তারা গোলাম আহমদ কাদিয়ানিকে নবী বলে বিশ্বাস করে এবং মানে।' উপরে উল্লেখিত আয়াতের আলোকে তারা কোনোভাবেই মুসলিম হতে পারে না। তারা কাফের। যারা তাদেরকে মুসলিম বলবে কিংবা মুসলিম বলে বিশ্বাস করবে তাদেরও ঈমান থাকবে না।

এ ব্যাপারে হানাফি মাযহাবের বিখ্যাত কিতাব আল-ফাতওয়া আল-হিন্দিয়া (ফাতওয়ায়ে আলমগীরি) এর মধ্যে বলা হয়েছে-

إِذَا لَمْ يَعْرِفِ الرَّجُلُ أَنَّ مُحَمَّدًا آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمْ وَعَلَى نَبِيِّنَا السَّلَامُ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ

কোন ব্যক্তি যদি মুহাম্মাদ ﷺ-কে নবীদের মধ্যে শেষ নবী হিসেবে না মানে, যিনি আমাদের মধ্যে প্রেরিত হয়েছেন তাহলে মুসলিম নয়।[১৪৯]

খ. রাসূলের আদর্শ, বিচার ব্যবস্থা থেকে অন্য কোনও আদর্শ, বিচার ব্যবস্থাকে প্রাধান্য কিংবা উত্তম মনে করার পরিণতি: মহান আল্লাহ বলেন-

وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا

কেউ আল্লাহ এবং রাসূলের প্রতি ঈমান না আনলে, (সে জেনে রাখুক) আমি কাফিরদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি জ্বলন্ত আগুন।[১৫০]

রাসূলের প্রতি ঈমান গ্রহণের অর্থ হলো, তাঁর আদর্শ, বিচার ব্যবস্থাসহ বিশ্বাস করা। তাঁর আদর্শ, বিচার ব্যবস্থা থেকে অন্য আদর্শ, বিচার ব্যবস্থাকে প্রাধান্য দেওয়ার অর্থ তাঁর প্রতি পূর্ণ ঈমান গ্রহণের পরিপন্থী। যা ঈমানের জন্য চরম আঘাত। এতে ঈমান থাকবে না। মহান আল্লাহ বলেন-

[১৪৮] সূরা আহযাব, আয়াত-৪০

[১৪৯] আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়া, ১৭/১৪৫

[১৫০] সূরা ফাতাহ, আয়াত-১৩

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ
يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا •
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا

(হে নবী!) আপনি কি তাদেরকে দেখেন নি, যারা দাবি করে 'তারা আপনার প্রতি যে কালাম নাযিল করা হয়েছে তাতেও ঈমান এনেছে এবং আপনার পূর্বে যা নাযিল করা হয়েছিল তাতেও, (কিন্তু) তাদের অবস্থা এই যে, তারা ফায়সালার জন্য তাগুতের (ইসলামি শাসন ব্যবস্থার বিপরীত শাসন ব্যবস্থার) কাছে নিজেদের মোকাদ্দমা নিয়ে যেতে চায়? অথচ তাদেরকে আদেশ করা হয়েছিল, যেন সুস্পষ্টভাবে তাগুতকে অস্বীকার করে। বস্তুত শয়তান তাদেরকে ধোঁকা দিয়ে চরমভাবে গোমরাহ করতে চায়। যখন তাদেরকে বলা হয়, এসো সেই ফায়সালার দিকে যা আল্লাহ নাযিল করেছেন এবং এসো রাসূলের দিকে, তখন মুনাফিকদেরকে দেখবেন আপনার থেকে সম্পূর্ণরূপে মুখ ফিরিয়ে নেয়।[১৫১]

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন-

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا
مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا •

(হে নবী!) আপনার প্রতিপালকের শপথ! তারা ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না নিজেদের পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদের ক্ষেত্রে আপনাকে বিচারক মানে, তারপর আপনি যে রায় দেন সে ব্যাপারে নিজেদের অন্তরে কোনও রূপ কুণ্ঠাবোধ না করে এবং অবনত মস্তকে তা গ্রহণ করে নেয়।[১৫২]

উল্লেখিত তিনটি আয়াত থেকে পরিষ্কারভাবে জানা গেল যে, মুমিন বা মুসলিম হতে হলে ইসলামি শাসন ব্যবস্থাকে অকুণ্ঠভাবে মেনে নিতে হবে এবং তাগুত বা ইসলামি শাসন ব্যবস্থার বিপরীত শাসন ব্যবস্থাকে অস্বীকার করতে হবে। যে ব্যক্তি এই নীতি না মানবে সে মুনাফিক। পরের আয়াতে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহকে বিচারক বা তাঁর বিচার ব্যবস্থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না মানবে ততক্ষণ ঈমানদার হওয়া যাবে না। সুতরাং মুমিন হতে হলে অবশ্যই রাসূলুল্লাহকে বিচারক এবং তার বিচার ব্যবস্থাকে মানতে হবে। না হলে ঈমান ভেঙ্গে যাবে।

গ. রাসূলকে মানুষ বলে বিশ্বাস না করলে ঈমান ভেঙ্গে যাবে। কিছু মানুষ এমনও আছে যারা রাসূলুল্লাহকে সম্মান দেখাতে গিয়ে রাসূলকে আল্লাহ অথবা আল্লাহর সমকক্ষ বলে থাকে। তাদের ঈমান ভেঙ্গে যাবে। মহান আল্লাহ বলেন-

[১৫১] সূরা নিসা, আয়াত-৬০,৬১

[১৫২] সূরা নিসা, আয়াত-৬৫

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

(হে নবী!) আপনি বলুন, আমি তো তোমাদের মতই একজন মানুষ। আমার কাছে ওহী আসে যে, তোমাদের মাবুদ কেবল একজনই মাবুদ। সুতরাং, যে ব্যক্তি তাঁর 'রবের' সাক্ষাতের আশা রাখে সে যেন নেক কাজ করে এবং তার রবের ইবাদতে অন্য কাউকে শরিক না করে।[১৫৩] অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন-

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ

তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পোড়া মাটির ন্যায় শুষ্ক মাটি থেকে।[১৫৪]

ঘ. রাসূলের মৃত্যুতে বিশ্বাস না করলে ঈমান ভেঙ্গে যাবে। আল্লাহ বলেন-

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ

আর মুহাম্মদ ﷺ একজন রাসূল। তাঁর পূর্বেও বহু রাসূল অতিবাহিত হয়েছেন। তাঁর যদি মৃত্যু হয় কিংবা তাঁকে হত্যা করা হয়, তবে কি তোমরা উল্টো দিকে ফিরে যাবে? যে কেউ উল্টো দিকে ফিরে যাবে, সে কখনোই আল্লাহর কিছুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না। আর যারা কৃতজ্ঞ মানুষ, আল্লাহ তাদের পুরস্কার দান করবেন।[১৫৫] অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন-

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ

নিশ্চয় আপনারও মৃত্যু হবে এবং তাদেরও মৃত্যু হবে।[১৫৬] রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মৃত্যু হয়েছে এ কথা মহান আল্লাহর ঘোষণা। সুতরাং কারো কান কথা না শোনে মহান আল্লাহর কথার উপর আস্থা এবং বিশ্বাস স্থাপন করা প্রতিটি মুমিনের অপরিহার্য কর্তব্য।

এ ব্যাপারে আল-ফাতওয়া আল-হিন্দিয়া'র মধ্যে বলা হয়েছে-

وَمَنْ قَالَ: لَا أَدْرِي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِنْسِيًّا، أَوْ جِنِّيًّا يَكْفُرُ كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ

যে বলল, আমি জানি না নবী ﷺ মানুষ ছিলেন নাকি জ্বিন ছিলেন। এ কথায় সে কাফির হয়ে যাবে।[১৫৭] কেননা মুসলিম হওয়ার জন্য আবশ্যকীয় শর্ত হলো

[১৫৩] সূরা কাহাফ, আয়াত-১১০

[১৫৪] সূরা আর রহমান, আয়াত-১৪

[১৫৫] সূরা আল ইমরান, আয়াত-১৪৪

[১৫৬] সূরা যুমার, আয়াত-৩০

[১৫৭] আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়া, ১৭/৮৫

মানব নবীর প্রতি ঈমান গ্রহণ করা। কিন্তু যে জানে না নবী মানুষ নাকি জ্বিন, সে মানব নবীর প্রতি ঈমান গ্রহণ করতে পারে নি। এজন্য সে কাফির হবে।

ঈমান ভঙ্গের চতুর্থ কারণ: আল্লাহ ও তার নিজের মধ্যে মধ্যস্থতা সম্পর্কিত বিশ্বাস ও কর্ম।

যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার নিজের মাঝে অন্য কাউকে মধ্যস্থতা মানবে, তাদেরকে ডাকবে, তাদের কাছে প্রার্থনা করবে, তাদের উপর আস্থা রাখবে এবং ভরসা করবে তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে তার ঈমান ভেঙ্গে যাবে। মহান আল্লাহ বলেন-

أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ

স্মরণ রেখো, খালেছ আনুগত্য তাঁরই প্রাপ্য। যারা তাঁকে ছাড়া অন্যকে অভিভাবক বানিয়ে নিয়েছে, (এই কথা বলে যে) আমরা তাদের (অর্থাৎ মূর্তির) উপাসনা করি কেবল এ জন্য যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেবে।[১৫৮] মহান আল্লাহ আরও পরিষ্কার করে বলেন-

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ • وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ •

আল্লাহকে ছেড়ে এমন কাউকে আহবান করো না যে তোমার কোনও উপকারও করতে পারে না এবং ক্ষতিও করতে পারে না। তারপরও যদি তুমি এরূপ করো তবে তুমি জালিমদের অন্তর্ভূক্ত হবে। আল্লাহ যদি তোমাকে কোনও কষ্ট দিতে চান তবে তিনি ছাড়া এমন কেউ নেই যে তা দূর করবে এবং তিনি যদি তোমার কোনও মঙ্গল করতে চান তবে এমন কেউ নেই যে তার অনুগ্রহ ফেরাবে। তিনি নিজ মানুষের মধ্যে যাকে ইচ্ছা করেন অনুগ্রহ দান করেন। তিনি বড়ই ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।[১৫৯]

আরবের মুশরিকরা আল্লাহকে বিশ্বাস করতো। কিন্তু তারা এটাও বিশ্বাস করতো যে, সরাসরি আল্লাহকে পাওয়া যাবে না, বরং কোনো ওসীলা বা মাধ্যম তৈরী করতে হবে। এই জন্য তারা আল্লাহ ও তাদের নিজেদের মধ্যে মূর্তিকে ওসীলা বা মাধ্যম তৈরী করত। আরবের মুশরিকরা মূর্তিকে মাধ্যম বানিয়ে তারা মুশরিক হয়েছে। যারা মাযারের কোনও পীরকে আল্লাহ পাবার মাধ্যম বলে বিশ্বাস করবে এবং পীরের নৈকট্য অর্জনের মাধ্যমে আল্লাহ পাবার বিশ্বাস করবে তাদেরও

[১৫৮] সূরা যুমার, আয়াত-৩

[১৫৯] সূরা ইউনূস, আয়াত-১০৬,১০৭

ঈমান থাকবে না। তবে নেক আমলকে ওসীলা বানাতে কোনও দোষ নেই বলে হাদীসে উল্লেখ আছে।[১৬০]

<u>ঈমান ভঙ্গের পঞ্চম কারণ</u>: যাদু করা, যাদুকরের নিকট গমন করা সম্পর্কিত বিশ্বাস, কথা ও কর্ম।

যাদু করা, যাদুর উপর সন্তুষ্ট থাকা এবং মনেপ্রাণে যাদুকে পছন্দ ও বিশ্বাস করার দ্বারা ঈমান ভেঙ্গে যায়। মহান আল্লাহ বলেন-

وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

তারা এমন জিনিস শিখত যা তাদের পক্ষে ক্ষতিকর ছিল এবং কোনও উপকারী ছিল না। আর তারা এটাও ভালো করে জানত যে, যে কেউ যাদু অবলম্বন করবে পরকালে তার কোন অংশ থাকবে না।[১৬১]

এই আয়াতে একটি অন্তবর্তী কথা হিসেবে একটি মূলনীতি বিষয়ক ক্রুটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। তা এই যে, যাদুতে বিশ্বাসীগণ মনে করত যাদু স্বয়ংসম্পূর্ণ শক্তির অধিকারী। আল্লাহর হুকুম ছাড়া আপনা-আপনি তা থেকে কাঙ্ক্ষিত ফল প্রকাশ পায়। অর্থাৎ মহান আল্লাহ ইচ্ছা করুন আর না-ই করুন যাদু তার কাজ করবেই। এটা মূলত একটা কুফুরি আকিদা ছিল।[১৬২]

হযরত ইবনে মাসউদ রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

مَنْ أَتَى عَرَّافًا أَوْ سَاحِرًا أَوْ كَاهِنًا فَسَأَلَهُ فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি কোনও জ্যোতিষী, যাদুকর এবং গণকের নিকট গমন করে এবং তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করে তাকে সত্য বলে স্বীকার করে নেয় সে যেন মুহাম্মাদ ﷺ এর আনীত দ্বীনকে অস্বীকার করল। হাদীসটির বর্ণনাকারী সকলেই নির্ভরযোগ্য।[১৬৩]

<u>ঈমান ভঙ্গের ষষ্ঠ কারণ</u>: নিজেকে শরীয়তের উর্ধ্বে কিংবা বাইরে দাবি করা সম্পর্কিত বিশ্বাস ও কর্ম।

কেউ নিজেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর শরীয়তের উর্ধ্বে কিংবা বাইরে দাবি করলে ঈমান ভেঙ্গে যাবে। মহান আল্লাহ বলেন-

[১৬০] সহীহ বুখারী, হাদীস-২২১৫; ২২৭২; ২৩৩৩; ৩৪৬৫; ৫৯৭৪
[১৬১] সূরা বাকারা, আয়াত-১০২
[১৬২] আল্লামা তকি ওসমানী দা.বা. রচিত তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন (বাংলা) খন্ড-৩ পৃ.-৮১
[১৬৩] মুসনাদু আবী ইয়ালা, হাদীস-৫৪০৮; মাজমাউয যাওয়াইদ, হাদীস-৮৪৯০

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ•

(হে নবী! আপনি তাদেরকে বলুন) এটা (ইসলাম) সরল সঠিক পথ। সুতরাং এর অনুসরণ করো, অন্য কোনো পথের অনুসরণ করো না। অন্যথায় তা তোমাদেরকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। হে মানুষ, এ বিষয়ে আল্লাহ তোমাদেরকে গুরুত্বের সাথে আদেশ করেছেন। যাতে তোমরা মুত্তাকি হতে পারো।[১৬৪]

এই আয়াতে মহান আল্লাহ স্পষ্টভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো পথ অনুসরণ করা যাবে না। তারপরও কেউ যদি ভিন্ন পথ অনুসরণ করে তাহলে সে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। সুতরাং কেউ যদি নিজেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর শরীয়তের উর্ধ্বে কিংবা বাইরে দাবি করে তাহলে তার ঈমান ভেঙ্গে যাবে। যারা নিজেকে শরীয়তে মুহাম্মদী বা মুহাম্মাদ ﷺ এর আনীত শরীয়তের বাইরে দাবি করে তাদের কেউ কেউ এই দাবিও করে যে, সাধনা করতে করতে আল্লাহর মারিফত অর্জন হলে নামায, রোযা এবং অন্য কোনও ইবাদত করতে হয় না। তারা নিজেদেরকে 'মারফতি' বলে পরিচয় দিয়ে থাকে। এ সব প্রতারকদের দাবির পক্ষে সাধারণত তিনটি দলিল উপস্থান করা হয়ে থাকে। আমরা প্রথমে তাদের দাবির পক্ষের তিনটি দলিল ও দলিলের জবাব উল্লেখ করব। তারপর তাদের ব্যাপারে ইসলামের সিদ্ধান্ত জানব, ইনশাআল্লাহ।

প্রথম দলিল: তারা বলে, মহান আল্লাহ বলেছেন-

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ

তোমার রবের ইবাদত করতে থাকো তোমার কাছে ইয়াকীন আসা পর্যন্ত।[১৬৫]

মারিফতিরা বলে যে, এই আয়াতে 'ইয়াকীন' শব্দের অর্থ হচ্ছে 'আল্লাহর নৈকট্য, সান্নিধ্য এবং মারিফত ইত্যাদি অর্জন হওয়া। সুতরাং উল্লেখিত আয়াতের অর্থ হচ্ছে 'তোমার রবের ইবাদত করতে থাকো তোমার কাছে 'আল্লাহর নৈকট্য, সান্নিধ্য এবং মারিফত ইত্যাদি অর্জন হওয়ার আগ পর্যন্ত'। আমরা মহান আল্লাহর নৈকট্য, সান্নিধ্য এবং মারিফত ইত্যাদি অর্জন করেছি। অতএব এখন থেকে আমাদের জন্য আর নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদি

[১৬৪] সূরা আনয়াম, আয়াত-১৫৩
[১৬৫] সূরা হিজর, আয়াত-৯৯

কোনও ইবাদত লাগবে না। আমরা শরীয়তে মুহাম্মদী বা মুহাম্মাদ ﷺ এর আনীত শরীয়তের বাইরে।

জবাব: এই দলিলের অনেক জবাব আছে। আমরা সংক্ষেপে দু'টি জবাব দেব।

ক. উল্লেখিত আয়াতে 'ইয়াকীন' শব্দের অর্থ এবং ব্যাখ্যা 'আল্লাহর নৈকট্য, সান্নিধ্য এবং মারিফত অর্জন করা নয়। সুতরাং নামধারী মারিফতি দলের দলিল সঠিক নয়। যাদের দলিল সঠিক নয় তাদের দাবিও সঠিক নয়। কেননা সকল তাফসীরের কিতাবে উল্লেখিত আয়াতে 'ইয়াকীন' শব্দের অর্থ এবং ব্যাখ্যা করা হয়েছে 'মৃত্যু'। তখন আয়াতের অর্থ হবে 'তোমার রবের ইবাদত করতে থাকো তোমার কাছে 'মৃত্যু' আসার আগ পর্যন্ত। বিস্তারিত জানার জন্য যে কোনো নির্ভরযোগ্য তাফসীর দেখতে পারেন।

খ. এ কথা তো সকল মুমিন স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর চেয়ে মহান আল্লাহর নৈকট্য, সান্নিধ্য এবং মারিফত আর কোনো মানুষ বেশি অর্জন করতে পারে নি এবং পারবেও না। ভবিষ্যতেও পারার বিন্দুমাত্রও সম্ভাবনা নেই। সুতরাং রাসূলুল্লাহ ﷺ যেহেতু মহান আল্লাহর সবচেয়ে বেশি নৈকট্য, সান্নিধ্য এবং মারিফত অর্জন করার পরও নামায, রোযা এবং শরীয়তের অন্যান্য বিধান পালন করেছেন, অতএব বর্তমানে কেউ মহান আল্লাহর নৈকট্য, সান্নিধ্য এবং মারিফত অর্জনের দাবি করলেও তাকে অবশ্যই নামায, রোযা এবং শরীয়তের অন্যান্য বিধান পালন করতে হবে। যদি নামায, রোযা এবং শরীয়তের অন্যান্য বিধান পালন না করে তাহলে সেটা অবশ্যই ইসলামের নামে ভন্ডামী, প্রতারণা এবং ধোকা। ইসলামের নামে ভন্ড, প্রতারক এবং ধোকাবাজ থেকে মহান আল্লাহ সহজ সরল সকল মুমিনকে রক্ষা করুন। আমীন।

দ্বিতীয় দলিল: খিযির আ. এর সঙ্গে নবী মূসা আ. এর সাক্ষাত হয়েছিল। তিনি মূসা আ. এর শরীয়তের অনুসরণ করেন নি। কারণ তিনি মহান আল্লাহর নৈকট্য, সান্নিধ্য এবং মারিফত ইত্যাদি অর্জন করেছিলেন। এ জন্য খিযির আ. নবী মূসা আ. এর শরীয়তের ঊর্ধ্বে ছিলেন। এভাবে আমরাও মহান আল্লাহর নৈকট্য, সান্নিধ্য এবং মারিফত ইত্যাদি অর্জন করার কারণে শরীয়তে মুহাম্মদী বা মুহাম্মাদ ﷺ এর আনীত শরীয়তের বাইরে। এখন আমাদের জন্য নামায, রোযা ইত্যাদি কোনও ইবাদত লাগবে না।

জবাব: খিযির ও মূসা আ. এর ঘটনা দিয়ে নিজেকে শরীয়তে মুহাম্মদী বা মুহাম্মাদ ﷺ এর আনীত শরীয়তের বাইরে রাখার চেষ্টা করা অন্যায় এবং অপরাধ। কারণ, খিযির আ. নবী মূসা আ. এর শরীয়তের বাইরে কোনও কিছু করেন নি। যদি খিযির আ. নবী মূসা আ. এর শরীয়তের বাইরে কোনও কিছু

করতেন তাহলে অবশ্যই নবী মূসা আ. তাকে বাঁধা দিতেন। যখন খিযির আ. নবী মূসা আ. এর সঙ্গে সফরের অস্বাভাবিক ঘটনার পরবর্তীতে তার কার্যক্রমের বিবরণ দিতে লাগলেন তখন নবী মূসা আ. খিযির আ. এর কথা মেনে নিয়েছিলেন এবং কোনো বাঁধা দেন নি। এতে প্রমাণ হয় খিযির আ. নবী মূসা আ. এর শরীয়তের বাইরে কোনও কিছু করেন নি। সুতরাং নবী মূসা এবং খিযির আ. এর ঘটনার দোহাই দিয়ে নিজেকে শরীয়তে মুহাম্মদী বা মুহাম্মাদ ﷺ এর আনীত শরীয়তের বাইরে রাখার চেষ্টা করা অন্যায় এবং অপরাধ।

তৃতীয় দলিল: মনসুর হাল্লাজ মহান আল্লাহর মারিফত অর্জন করেছিলেন। এই জন্য তিনি বলেছিলেন- (اَنَا الْحَقُّ) 'আনাল হক' অর্থাৎ আমি খোদা। তাঁর এই কথা প্রমাণ করে তিনিও শরীয়তে মুহাম্মদী বা মুহাম্মাদ ﷺ এর আনীত শরীয়তের বাইরে ছিলেন।

জবাব: এই দলিলের অনেক জবাব আছে। আমরা সংক্ষেপে দু'টি জবাব দেব।

ক. মনসুর হাল্লাজকে ৩০৯ হিজরীতে মৃত্যু দেওয়া হয়েছিল। 'তৎকালীন খলিফা মুক্তাদির বিল্লাহর সামনে কথা বলার সময় তাঁর মুখ থেকে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে শরীয়ত বিরোধী কথা বের হয়ে যায়। তখন খলিফা কিছু আলিমদেরকে ডেকে তাঁর ব্যাপারে ফাতওয়া জিজ্ঞাসা করেন। অবশেষে আলিমদের ফাতওয়া মতে তাঁকে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হয়।' তবে এ সব কথার নির্ভরযোগ্য কোনো সূত্র নেই। সুতরাং এমন অনির্ভরযোগ্য কথায় কখনো ইসলামি শরীয়তের বিপক্ষে অবস্থান নেয়া মানেই হচ্ছে ইসলাম নিয়ে তামাশা করা। যা কখনো মেনে নেয়া যায় না।

খ. ইসলামের তিনটি সোনালী যুগের পর আর কারো কোনও আমল দলিল হতে পারে না। তারপরও কেউ যদি এমন আমলকে নিজের দাবির পক্ষে দলিল বানাতে চায় তাহলে আমরা বলব মানসুর হাল্লাজের পূর্বপুরুষ ইয়ামেন দেশের বিখ্যাত ব্যাক্তি হযরত ওয়াইস আল-কারনীর কথা। তিনি ওহুদ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর দাঁত শহীদ হওয়ার সংবাদ পেয়ে নিজ হাতে নিজের দাঁত ভেঙ্গে ছিলেন। বর্তমান সময়ে মারফতি দাবিদারের কেউ কি আছে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর দু'আ প্রাপ্ত ওয়াইস আল-কারনীর মতো নিজ হাতে নিজের দাঁত ফেলে দেওয়ার মতো। জানি, এখানে নিজের দাঁত ভেঙ্গে ফেলার মতো কোনো মারফতি দাবিদারকে খোঁজে পাওয়া যাবে না। কারণ, এখানে স্বার্থের উপর চরম আঘাত হবে। সুতরাং মারফতি নাম দিয়ে নিজেকে শরীয়তে মুহাম্মদী বা মুহাম্মাদ ﷺ এর আনীত শরীয়তের বাইরে রাখার দোহাই দিয়ে সহজ সরল মুমিনের ঈমান আমল নষ্ট করার ষড়যন্ত্র করবেন না। করলে এ দেশের তাওহিদি জনতা তা মেনে নেবে না।

ভন্ড মারিফতিদের ব্যাপারে ইসলামের সিদ্ধান্তঃ যে সব মারফতি দাবিদাররা নিজেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর শরীয়তের ঊর্ধ্বে কিংবা বাইরে দাবি করবে তাদের কোনো ঈমান নেই। উপরে আলোচনা হয়েছে।

ঈমান ভঙ্গের সপ্তম কারণঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আনীত দ্বীন-ধর্ম সম্পর্কিত বিশ্বাস ও কর্মের উপর আপত্তি ও অভিযোগ করা।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর আনীত দ্বীন-ধর্মের কোনো একটি বিষয়ে আপত্তি করা, বিদ্বেষ পোষণ করা এবং ঘৃণা করা চরম অন্যায়। ইসলাম ধর্মের অকাট্যভাবে প্রমাণিত কোনও একটি বিষয়ে আপত্তি করলে, বিদ্বেষ পোষণ করলে কিংবা ঘৃণা করলে ঈমান ভঙ্গ হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ বলেন-

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ

রাসূল বিশ্বাস রাখেন ঐ সমস্ত বিষয় সম্পর্কে যা তার রবের পক্ষ থেকে তার কাছে অবতীর্ণ হয়েছে এবং মুমিনরাও বিশ্বাস রাখে। সবাই বিশ্বাস রাখে ১. আল্লাহ্‌র প্রতি, তার ২. ফিরিশতাদের প্রতি, তার ৩. গ্রন্থসমূহের প্রতি এবং তার ৪. রাসূলগণের প্রতি।[১৬৬]

উল্লেখিত আয়াত থেকে এ কথা জানা গেল যে, মুমিন হওয়ার জন্য আয়াতে বর্ণিত বিষয় এবং অন্যান্য আয়াতে বর্ণিত বিষয়গুলো কোনও আপত্তি ছাড়া বিশ্বাস করতে হবে এবং মেনে নিতে হবে। কেউ যদি কোনও একটি বিষয় অস্বীকার করে কিংবা ঘৃণা করে তাহলে সে কাফির হবে। এব্যাপারে হানাফি মাযহাবের বিখ্যাত কিতাব আলফাতওয়া আলহিন্দিয়া (ফাতওয়ায়ে আলমগীরি) এর মধ্যে বলা হয়েছে-

مَنْ أَنْكَرَ الْقِيَامَةَ. أَوِ الْجَنَّةَ. أَوِ النَّارَ. أَوِ الْمِيزَانَ. أَوِ الصِّرَاطَ. أَوِ الصَّحَائِفَ الْمَكْتُوبَةَ فِيهَا أَعْمَالُ الْعِبَادِ يَكْفُرُ. وَلَوْ أَنْكَرَ الْبَعْثَ فَكَذَلِكَ

যে ব্যক্তি কিয়ামত, জান্নাত, জাহান্নাম মিজান এবং পুলসিরাত মানুষের কর্মকাণ্ড লিখিত আমলনামা অস্বীকার করলে কাফির হয়ে যাবে। এমনিভাবে মৃত্যুর পরবর্তী জীবনকে অস্বীকার করলেও কাফির হয়ে যাবে।[১৬৭]

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, আমাদের মুসলিম সমাজে এমনও কিছু মানুষ রয়েছে যারা মুমিনের সন্তান হওয়ার পরও শিক্ষাব্যবস্থা কিংবা পরিবেশগত কারণে ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষী হয়ে ওঠে। আমরা তাদেরকে নাস্তিক হিসেবে জেনে থাকি। কিছু নাস্তিকের নাম জনসম্মুকে প্রকাশিত হলেও অনেক নাস্তিকের

[১৬৬] সূরা বাকারা, আয়াত-২৮৫

[১৬৭] আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়া, ১৭/২২৮

নাম থেকে যায় পর্দার আড়ালে। তাদের নাম থাকে অপ্রকাশিত, অপরিচিত। নাস্তিক্যবাদীরা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর আনীত যে সব বিষয়ে আপত্তি, বিদ্বেষ এবং ঘৃণা করে এর মধ্যে কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করে তার জবাব দেওয়ার চেষ্টা করছি।

এক. (ক) সীমিত সময়ের অপরাধের শাস্তি অসীমিত বা দীর্ঘ সময়ের জন্য হবে কেন? (খ) দুনিয়াতে একজন মুসলমান ও কাফেরের কৃতকর্ম হয় ক্ষণস্থায়ী বা সীমিত সময়ের জন্য। সুতরাং কর্ম যেমন ক্ষণস্থায়ী বা সীমিত সময়ের জন্য তাহলে এর ফলাফলও ক্ষণস্থায়ী বা সীমিত সময়ের জন্য হওয়া উচিত। সেই হিসেবে পরকালে তাদের শান্তি বা শাস্তি ক্ষণস্থায়ী বা সীমিত সময়ের জন্য হওয়া উচিত। সুতরাং একজন মুমিনকে ক্ষণস্থায়ী বা সীমিত সময়ের জন্য জান্নাতে না দিয়ে তাকে চিরস্থায়ী সময়ের জন্য জান্নাতে কেন দেওয়া হবে? একজন অমুসলিমকে ক্ষণস্থায়ী বা সীমিত সময়ের জন্য জাহান্নামে না দিয়ে তাকে চিরস্থায়ী সময়ের জন্য জাহান্নামে কেন দেওয়া হবে?

জবাবঃ পরকালীন শান্তি ও শাস্তির সম্পর্ক শুধু মানুষের বাহ্যিক কৃতকর্মের সাথেই নয়। বরং এখানে নিয়তেরও অনেক প্রভাব রয়েছে। কারণ মানুষের যাবতীয় কর্ম নিয়তের সাথে সম্পৃক্ত। যেমন, কোন ব্যক্তি ধোকায় পড়ে পানি মনে করে মদ পান করেছে। কিন্তু মদ পান করার আদৌও তার ইচ্ছা ছিল না। তাই মদ পান করার নিয়ত না থাকার কারণে সে মদ পান করার পরও তার কোনো গুনাহ হবে না। পক্ষান্তরে কোন ব্যক্তি মদ পানের জন্য দোকানে গিয়ে মদ চাইল। কিন্তু দোকানী তাকে মদের পরিবর্তে হালাল শরবত দিয়ে দিল। আর সে তা মদ মনে করে পান করল। সে হালাল শরবত পান করেও মদ পান করার গুনাহ করল।

মানুষের যাবতীয় কর্ম নিয়তের ভালো-মন্দের সাথে সম্পৃক্ত থাকে। এই বিষয়টি বুঝে থাকলে প্রশ্নের জবাবটা বুঝতে সহজ হবে। মূলত বাহ্যিকভাবে যদিও একজন অমুসলিমের কুফুরি সীমিত, পক্ষান্তেরে তার কুফুরি অসীমিত। কারণ সে যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন সে এই কুফুরির উপরই বেঁচে থাকার সিদ্ধান্তে অটল। এ জন্য তার নিয়তের উপর ভিত্তি করে পরকালীন চিরস্থায়ী ঠিকানা হিসেবে জাহান্নাম ঘোষণা করা হয়েছে।

তাছাড়া শাস্তি অপরাধের সমান হতে হবে, এর চেয়ে বেশি হতে পারবে না এটা অযৌক্তিক। কারণ কেউ দুই ঘন্টা ডাকাতি করার পর পুলিশের হাতে ধরা পড়লে তাকে আদালত শুধু দুই ঘন্টার শাস্তি দেওয়া ন্যায় বিচার নয়। বরং আদালত ইচ্ছা করলে কম-বেশি করতে পারে। এটাই ন্যায় বিচার। ওপরে উল্লেখিত

আপত্তিকর দুটি প্রশ্নের উত্তর একসাথে দেওয়া হলো। এই অদ্ভুদ আপত্তির জবাব প্রদান করেছেন হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রাহি.।[১৬৮]

দুই. ইসলাম ধর্মের একটি বিধান হলো, 'উত্তরাধিকার আইনে মেয়ে যা পাবে ছেলে তার দ্বিগুণ পাবে।' আমাদের দেশে নামধারী প্রগতিশীল কিছু নাস্তিকেরা ইসলাম ধর্মের এই আইনের উপর আপত্তি, বিদ্বেষ এবং ঘৃণা পোষণ করে থাকে। তারা বলে ইসলামের এই আইনে নারীর প্রতি অন্যায় করা হয়েছে।

যারা ইসলামের এই আইনের উপর আপত্তি এবং বিদ্বেষ পোষণ করে তারা অজ্ঞ এবং চরম মূর্খ। কারণ ইসলামের এই আইনে নারীর প্রতি অন্যায় করা হয় নি। আমরা স্থুল দৃষ্টিতে যদিও দেখতে পাই যে, নারীকে পুরুষের তুলনায় উত্তরাধিকার অর্ধেক দেয়া হয়েছে, আসলে কম দেওয়া হয় নি, বরং গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, নারীকে পুরুষের তুলনায় বেশি দেওয়া হয়েছে। আমি আপনাদের সামনে একটি উদাহরণ দিচ্ছি। আমি আশা করব এতে খুব সহজেই বিষয়টি বুঝতে পারবেন।

উদাহরণ: এক ব্যক্তির দু'টি সন্তান ছিল। ছেলের নাম আবদুল্লাহ। মেয়ের নাম আমিনা। সে মৃত্যুর সময় তিন লক্ষ টাকা রেখে গেল। ইসলামি আইনে ছেলে আবদুল্লাহ পেল দুই লক্ষ টাকা। আর মেয়ে আমিনা পেল এক লক্ষ টাকা। এখানে আমরা স্থুল দৃষ্টিতে দেখতে পেলাম আবদুল্লাহ বেশি পেয়েছে। আর আমিনা অর্ধেক পেয়েছে, কম পেয়েছে। মূলত আবদুল্লাহ কম পেয়েছে আর আমিনা বেশি পেয়েছে। কিন্তু কীভাবে? একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করে দেখুন, আবদুল্লাহ বিয়ে করার সময় তার স্ত্রীকে দেন মোহর এবং অন্যান্য খরচ বাবদ সর্বমোট এক লক্ষ টাকা নগদ আদায় করেছে। এখন তার কাছে আরও এক লক্ষ টাকা রয়েছে। এবার তার বিয়ের ওলীমা বা বৌভাত অনুষ্ঠানসহ বিভিন্ন কাজে আরো পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। এখন তার কাছে আছে মাত্র পঞ্চাশ হাজার টাকা। তাহলে সে উত্তরাধিকার সূত্রে দুই লক্ষ টাকা পেয়েও খরচের পর তার অবশিষ্ট রইল মাত্র পঞ্চাশ হাজার টাকা। আর আমিনার বিষয়টি লক্ষ্য করে দেখুন, আমিনা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিল এক লক্ষ টাকা। আবার আমিনার বিয়ের সময় দেন মোহর বাবদ একটা টাকাও তার খরচ করতে হয় নি। বরং সে তার স্বামীর কাছ থেকে দেন মোহর বাবদ নগদ পেয়েছে আরো এক লক্ষ টাকা। এখন সে মোট দুই লক্ষ টাকার মালিক। এবার আপনারাই বলুন তো দেখি আবদুল্লাহ আর আমিনা এই দুই ভাই-বোনের মধ্যে বিয়ের পর কার সম্পত্তি বেশি। অনায়াসেই বলতে হবে যে, আমিনাই বেশি টাকার মালিক। তাহলে যুক্তিসঙ্গতভাবে কাকে উত্তরাধিকার বেশি দেওয়ার প্রয়োজন। এখানেও বলতে

[১৬৮] মাহাসিনে ইসলাম, পৃ.-২০

হবে আবদুল্লাহকে আরো বেশি দেওয়ার প্রয়োজন। এখনও কী কেউ বলবেন ইসলামে উত্তরাধিকার আইনে নারীকে বাবার সম্পত্তি থেকে অর্ধেক দিয়ে নারীর প্রতি অন্যায় করা হয়েছে? শুভবুদ্ধির কবে উদয় হবে?

এব্যাপারে হানাফি মাযহাবের বিখ্যাত কিতাব আলফাতওয়া আলহিন্দিয়া (ফাতওয়ায়ে আলমগীরি) এর মধ্যে বলা হয়েছে-

فَقِيرٌ قَالَ فِي شِدَّةِ فَقْرِهِ: فُلَان هُمْ بِنِدِّهِ است باجندان نِعْمَتْ وَمِنْ هُمْ بِنِدِّهِ

درجندين رنج بَارِي اينجنين عَدْل باشد كَفَرَ

কোনও ফকির ব্যক্তি দরিদ্রতার কষ্টে এ কথা বলল, হে আল্লাহ! অমুক ব্যক্তি আপনার বান্দা। সে অনেক নিয়ামতে জীবন-যাপন করছে। আমিও আপনার বান্দা। আমি অনেক দুঃখ-কষ্টে জীবন-যাপন করছি। এটা কী আপনার ইনসাফ (বা ন্যায় বিচার)? এমন আপত্তিকর কথা বলার কারণে তার ঈমান ভঙ্গ হয়ে যাবে, সে কাফির হয়ে যাবে।[১৬৯]

যেহেতু মহান আল্লাহর কোনও নির্দেশকে উপহাস করলে কিংবা তাঁর আইনকে অবিচার বা অযৌক্তিক কিংবা আপত্তিকর বললে কাফির হয়ে যায় সুতরাং কেউ যদি তাঁর কুরআনে ঘোষিত শাস্তি সম্পর্কে আপত্তি কিংবা উপহাস করে কিংবা তাঁর আইনকে অবিচার বা অযৌক্তিক বলে তাহলে তাঁর ঈমান ভঙ্গ হয়ে যাবে, সেও কাফির হয়ে যাবে।

ঈমান ভঙ্গের অষ্টম কারণ: ইসলাম থেকে মুখ ফেরানো, বিরোধিতা এবং ইসলাম নিয়ে ঠাট্টা ও মশকরা করা সম্পর্কিত কথা ও কর্ম।

ক. ইসলামের শিক্ষা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া এবং এর বিরোধিতা করলে ঈমান ভেঙ্গে যায়। খ. কুরআনে বর্ণিত দ্বীন ও ধর্মের কোন বিষয় নিয়ে এবং ভালো কাজের প্রতিদান এবং মন্দ কাজের পরিণাম নিয়ে ঠাট্টা ও মশকরা করলেও ঈমান ভেঙ্গে যায়। গ. ফাতওয়া নিয়ে ঠাট্টা মশকরা করলে ঈমান ভেঙ্গে যায়।

ক. মহান আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদত করার জন্য। তাঁর দ্বীন মেনেই তাঁর ইবাদত করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন হলো ইসলাম শিক্ষা করা। সুতরাং ইসলাম শিক্ষা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া যাবে না। এর বিরোধিতা করার তো প্রশ্নই আসে না। যদি কোনও ব্যক্তি ইসলাম শিক্ষা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং কুরআন নির্দেশিত শিক্ষার বিরোধিতা করে তাহলে তার ঈমান ভেঙ্গে যাবে। মহান আল্লাহ বলেন-

[১৬৯] আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়া, ১৭/১৩৬

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ

আমি জিন ও মানুষের মধ্য হতে বহুজনকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি। তাদের অন্তর আছে, কিন্তু তা দ্বারা তারা অনুধাবন করে না। তাদের চোখ আছে, কিন্তু তা দ্বারা দেখে না এবং তাদের কান আছে, কিন্তু তা দ্বারা শোনে না। তারা চতুষ্পদ জন্তুর মতো, বরং এর চেয়েও বেশি বিভ্রান্ত। এরাই গাফেল।[১৭০]

মহান আল্লাহ আরও বলেন-

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ •

সেই ব্যক্তি অপেক্ষা জালিম আর কে হতে পারে, যাকে তার রবের আয়াতসমূহ দ্বারা নসীহত করা হলে সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। আমি অবশ্যই এমন জালিমদের থেকে বদলা নিয়ে ছাড়ব।[১৭১]

হানাফি মাযহাবের বিখ্যাত কিতাব আল-ফাতওয়া আল-হিন্দিয়া (ফাতওয়ায়ে আলমগীরি) এর মধ্যে বলা হয়েছে-

إِذَا أَنْكَرَ الرَّجُلُ آيَةً مِنَ الْقُرْآنِ، أَوْ تَسَخَّرَ بِآيَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ أَوْ عَابَ كَفَرَ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّةِ

কোনও ব্যক্তি যদি কুরআনের কোনো একটি আয়াত অস্বীকার করে কিংবা উপহাস করে অথবা বিদ্বেষ করে তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে। ফাতওয়ায়ে তাতারখানিয়াতে এমনই বলা হয়েছে।[১৭২]

খ. যে ব্যক্তি কুরআনে বর্ণিত বা ইসলাম ধর্মের অকাট্যভাবে প্রমাণিত কোনো বিষয় নিয়ে এবং ভালো কাজের প্রতিদান এবং মন্দ কাজের পরিণাম নিয়ে ঠাট্টা মশকরা করে তার ঈমান ভঙ্গ হয়ে যাবে।

গ. সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত কুরআনের ঘোষিত ফাতওয়া নিয়ে ঠাট্টা মশকরা করলেও ঈমান ভেঙ্গে যাবে।

মুনাফিকরা বলত মুহাম্মাদ আমাদেরকে ইতালির রোম বিজয়ের স্বপ্ন দেখায়। সে জানে না রোমের সৈন্য আরব সৈন্যদের মতো নয়। মুনাফিকদের এক নেতা বলল, আরে! মুহাম্মাদ তো রোমের সৈন্যদেরকে আরবের সৈন্যদের মতো মনে করেছে। আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি যে, আগামীকাল মুসলমানদেরকে পরাজিত অবস্থায় এক রশিতে বাঁধতে দেখব। সে আরও বলল, এই পুস্তক (কুরআন) পাঠকারী মুসলিমরা অনেক লোভী, পেটুক এবং মিথ্যাবাদী। তারা

[১৭০] সূরা আরাফ, আয়াত-১৭৯

[১৭১] সূরা সাজদা, আয়াত-২২

[১৭২] আল-ফাতওয়া আল-হিন্দিয়া- ১৭/১৭৮

কীভাবে রোম সৈন্যদের সাথে যুদ্ধ করবে। তার এই মন্তব্য রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কানে চলে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ উটের উপর চড়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। তিনি তাদেরকে ডেকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। মন্তব্যকারী মুনাফিক লোকটি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে গিয়ে বলল-

إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ

(হে আল্লাহর রাসূল!) আমরা শুধু আমোদ-ফূর্তি করার জন্য এমন কথা বলেছি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: তোমাদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন-

أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ • لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ

তোমরা কি আল্লাহ, আল্লাহর হুকুম এবং তাঁর রাসূলকে নিয়ে ঠাট্টা-মশকরা করেছিলে? এখন তোমরা (দোষ থেকে মুক্ত থাকার জন্য বাজে) অজুহাত দেখিও না। তোমরা ঈমান প্রকাশ করার পর কুফুরিতে লিপ্ত হয়েছ।[১৭৩]

এই আয়াতে ইসলাম ধর্মের অকাট্যভাবে প্রমাণিত বিষয় এবং তাবুক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার মতো ভালো কাজ নিয়ে মুনাফিকরা ঠাট্টা করার কারণে তাদের কাজকে মহান আল্লাহ কুফুর বলেছেন। তিনি তাদেরকে একথাও বলেছেন 'তোমরা ঈমান প্রকাশ করার পর কুফুরিতে লিপ্ত হয়েছ'।

যদি কেউ খারাপ চিন্তা চেতনা ছাড়াই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং আল্লাহর হুকুম নিয়ে শুধু মুখে ঠাট্টা মশকরা করে তাহলেও বড় ধরণের কুফুর বলে গণ্য হবে।[১৭৪]

গ. কুরআনে ঘোষিত সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত ফাতওয়া নিয়ে ঠাট্টা মশকরা করলে ঈমান ভেঙ্গে যাবে। মহান আল্লাহ বলেন-

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ

(হে নবী!) লোকেরা আপনার কাছে নারীদের সম্পর্কে ফাতওয়া (ইসলামের আইন, বিধান) জিজ্ঞেস করে, আপনি তাদেরকে বলুন, আল্লাহ তাদের সম্পর্কে তোমাদেরকে ফাতওয়া জানাচ্ছেন।[১৭৫]

এব্যাপারে আল-ফাতওয়া আল-হিন্দিয়া'র মধ্যে বলা হয়েছে-

يَكْفُرُ إِذَا وَصَفَ اللَّهَ تَعَالَى بِمَا لَا يَلِيقُ بِهِ أَوْ سَخِرَ بِاسْمٍ مِنْ أَسْمَائِهِ أَوْ بِأَمْرٍ مِنْ أَوَامِرِهِ أَوْ نَكَرَ وَعْدَهُ وَوَعِيدَهُ، أَوْ جَعَلَ لَهُ شَرِيكًا، أَوْ وَلَدًا، أَوْ زَوْجَةً

[১৭৩] সূরা তাওবা, আয়াত-৬৫,৬৬

[১৭৪] শাইখুল ইসলাম আল্লামা শাব্বির আহমদ ওসমানি রাহি. রচিত 'তাফসীরে ওসমানি'।

[১৭৫] সূরা নিসা, আয়াত-১২৭

কেউ যদি মহান আল্লাহর ব্যাপারে এমন কথা বলে যা তাঁর ইজ্জত-সম্মানের পরিপন্থী অথবা আল্লাহর কোনও নামের কিংবা তাঁর কোনও নির্দেশের ব্যাপারে ঠাট্টা বা উপহাস করে অথবা ইসলাম ধর্মের অকাট্যভাবে প্রমাণিত কোনো বিষয় নিয়ে এবং ভালো কাজের প্রতিদান এবং মন্দ কাজের পরিণাম নিয়ে ঠাট্টা মশকরা করে অথবা তাঁর সাথে কাউকে শরিক করে, অথবা তাঁর সন্তান কিংবা স্ত্রী আছে বলে দাবি করে তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে।[১৭৬]

হানাফি মাযহাবের বিখ্যাত কিতাব ফাতওয়া শামীতে বলা হয়েছে-

وَالْحَاصِلُ: أَنَّ مَنْ تَكَلَّمَ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ هَازِلًا أَوْ لَاعِبًا كُفْرٌ عِنْدَ الْكُلِّ وَلَا اِعْتِبَارَ بِاِعْتِقَادِهِ

মূল কথা: যে ব্যক্তি ঠাট্টা, তামাশা, কৌতুক বা রসিকতা করে অথবা মশকরা করে কুফুরি কথা বলে তাহরে তার কথা কুফুর হওয়ার ব্যাপারে সবাই একমত। এখানে তার অন্তরের বিশ্বাস বিবেচিত হবে না। সামান্য শব্দগত ব্যবধানে একই কথা বলা হয়েছে ফাতাওয়া আলমগীরিতে।[১৭৭]

এখানে এ কথা সুস্পষ্টভাবে জানা গেল যে, ফাতওয়া দিয়েছেন মহান আল্লাহ। সুতরাং কুরআনের ঘোষিত সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত ফাতওয়া নিয়ে ঠাট্টা মশকরা করা মানে আল্লাহর আইন নিয়ে ঠাট্টা মশকরা করা। কেউ যদি আল্লাহর আইন নিয়ে ঠাট্টা মশকরা করে তাহলে কুরআনের আয়াত এবং বিখ্যাত ফাতওয়ার আলোকে প্রমাণিত হলো যে, এমন অপরাধের কারণে ঈমান ভঙ্গ হয়ে যাবে। কাফির হয়ে যাবে।

ঈমান ভঙ্গের নবম কারণ: মুসলমানদের বিরুদ্ধে অমুসলিমকে সাহায্য সহযোগিতা করা সম্পর্কিত বিশ্বাস, কথা ও কর্ম:

মুসলমানদের বিরুদ্ধে অমুসলিমকে সাহায্য সহযোগিতা এবং তাদের সাথে সহমত পোষণ করলে কিংবা বড় মনে করলে ঈমান ভেঙ্গে যায়। আল্লাহ বলেন-

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ •

মুমিনগণ যেন মুমিনদেরকে ছেড়ে কাফিরদেরকে নিজেদের বন্ধু ও সাহায্যকারী না বানায়। যে এরূপ করবে আল্লাহর সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। তবে তাদের জুলুম থেকে বাঁচার জন্য যদি আত্মরক্ষামূলক কোনো পন্থা অবলম্বন কর

[১৭৬] আল-বাহরুর রায়িক, ১১/৩২৮; আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়া, ১৭/৮৫

[১৭৭] বিস্তারিত: রাদ্দুল মুহতার (ফাতওয়া শামী) ১৬/২৫৮; আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়া, ১৭/২৫২

সেটা ভিন্ন কথা। আল্লাহ তোমাদেরকে নিজ (শাস্তি) হতে রক্ষা করেন আর তাঁরই দিকে (সকলকে) ফিরে যেতে হবে।[১৭৮]

এই আয়াতে 'তবে তাদের জুলুম থেকে বাঁচার জন্য যদি আত্মরক্ষামূলক কোনো পন্থা অবলম্বন কর সেটা ভিন্ন কথা।' এর ব্যাখ্যা হচ্ছে অমুলিমদের সাথে বাহ্যিক সৌহার্দ-সহমর্মিতা এবং সাধারণ সহযোগিতা করা যাবে, যদি এমন করার কারণে মুসলমানদের কোনো অমর্যাদা অথবা স্বার্থ নষ্ট না হয়।

যে সব অমুসলিম ইসলাম ও মুসলিম উম্মার বিরুদ্ধে বিদ্বেষ এবং শত্রুতা পোষণ করে তাদেরকে সাহায্য, সহযোগিতা এবং তাদের সাথে সহমত পোষণ করার মানেই মুসলিমদের বিরুদ্ধে অবস্থান করা। আর মুসলিমদের বিরুদ্ধে অমুসলিমকে সাহায্য, সহযোগিতা এবং তাদের সাথে সহমত পোষণ করলে কিংবা তাদেরকে বড় মনে করলে ঈমান ভেঙ্গে যায়। মহান আল্লাহ বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ •

হে মুমিনগণ! তোমরা ইহুদি ও খৃষ্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা নিজেরাই একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাদেরকে বন্ধু বানাবে, সে তাদেরই মধ্যে গণ্য হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ জালিমদেরকে হিদায়াত দান করেন না।[১৭৯]

আয়াতটি নাযিল হয়েছে মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই প্রসঙ্গে। ইহুদিদের সাথে তার গভীর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। তার ধারণা ছিল, নবী ﷺ এর দল যদি পরাজিত হয়, তবে ইহুদিদের সাথে তার বন্ধুত্ব কাজে আসবে। পরবর্তী আয়াতে এই ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। ইহুদিদের সাথে মুনাফিকদের সখ্যতার লক্ষ্য ছিল তারা যেমন ইসলামের শত্রু ইহুদিরাও ইসলাম এবং মুসলিম উম্মাহর নিকৃষ্ট শত্রু। কেউ যদি মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহর চিন্তা চেতনা নিয়ে ইসলামের শত্রু ইহুদি, খৃস্টান কিংবা অন্য কোনো অমুসলিমের সাথে বন্ধুত্ব করে তাহলে সে যে কাফির, তাতে কি সন্দেহ থাকতে পারে।[১৮০]

[১৭৮] সূরা আলে ইমরান, আয়াত-২৮

[১৭৯] সূরা মায়িদা, আয়াত-৫১

[১৮০] শাইখুল ইসলাম শাব্বির আহমদ ওসমানি রাহি. রচিত 'তাফসীরে ওসমানিতে' দ্র.।

ঈমান ভঙ্গের দশম কারণ: অমুসলিম এবং তাদের ধর্ম সম্পর্কিত বিশ্বাস ও কর্ম।
ক. অমুসলিমকে মুসলিম হিসেবে বিশ্বাস করা। খ. কোনও অমুসলিমের ধর্মকে সঠিক বলে বিশ্বাস করা। গ. তাদের অমুসলিম হবার ব্যাপারে সন্দেহ করা। এই তিনটির কোনও একটি মেনে নিলে ঈমান ভেঙ্গে যাবে। মহান আল্লাহ বলেন:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ

মুমিনগণ যেন মুমিনদেরকে ছেড়ে কাফিরদেরকে নিজেদের বন্ধু এবং সাহায্যকারী না বানায়। যে এরূপ করবে আল্লাহর সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই।[১৮১]
অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ •

হে মুমিনগণ! ইহুদি ও খৃস্টানদেরকে বন্ধু বানাবে না। তারা নিজেরাই একে অন্যের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাদেরকে বন্ধু বানাবে, সে তাদেরই মধ্যে গণ্য হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ জালিমদেরকে হিদায়াত দান করেন না।[১৮২]
অন্য আয়াতে তিনি আরো বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ •

হে মুমিনগণ! তোমাদের পিতা ও ভাই যদি ঈমানের বিপরীতে কুফরকে শ্রেষ্ঠ মনে করে, তবে তাদেরকে নিজেদের অভিভাবক বানিও না। যারা তাদেরকে অভিভাবক বানাবে তারা জালেম সাব্যস্ত হবে।[১৮৩]
মহান আল্লাহ আরো বলেন-

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

নিশ্চয় আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য দ্বীন একমাত্র ইসলামই।[১৮৪]
মহান আল্লাহ বলেন-

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ •

---
[১৮১] সূরা আলে ইমরান, আয়াত-২৮
[১৮২] সূরা মায়েদা, আয়াত-৫১
[১৮৩] সূরা তাওবা, আয়াত-২৩
[১৮৪] সূরা আলে ইমরান, আয়াত-১৯

যে ব্যক্তিই ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দ্বীন গ্রহণ করতে চাইবে, তার থেকে সে দ্বীন কবুল করা হবে না। সে আখেরাতে মহা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত হবে।[১৮৫]
হানাফি মাযহাবের বিখ্যাত ফাতওয়ার কিতাবে বলা হয়েছে-

وَمَنْ اعْتَقَدَ أَنَّ الْإِيمَانَ وَالْكُفْرَ وَاحِدٌ فَهُوَ كَافِرٌ وَمَنْ لَا يَرْضَى بِالْإِيمَانِ فَهُوَ كَافِرٌ

যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে ঈমান ও কুফুর একই সে কাফির। এমনিভাবে যে ব্যক্তি ঈমানে সন্তুষ্ট নয় সেও কাফির।[১৮৬]
কিতাবটির অন্যত্রে আরও বলা হয়েছে-

وَيَكْفُرُ إِنْ اعْتَقَدَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَرْضَى بِالْكُفْرِ

কোন মুমিন যদি বিশ্বাস করে যে, মহান আল্লাহ কুফুরকে গ্রহণ করবেন, তাহলে তার এমন বিশ্বাসের কারণে সে কাফির হয়ে যাবে। আল বাহরুর রায়িক, ১১/৩২৯; ফাতাওয়া হিন্দিয়া, ১৭/৮৫
কুরআনের আয়াত এবং বিখ্যাত ফাতওয়ার কিতাব থেকে জানা গেল যে, অমুসলিমকে মুসলিম হিসেবে বিশ্বাস করা। কোনো অমুসলিমের ধর্মকে সঠিক বলে বিশ্বাস করা। তাদের অমুসলিম হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করার দ্বারা মুমিনের ঈমান ভেঙ্গে যাবে এবং এমন বিশ্বাসের কারণে মুমিন ব্যক্তি কাফির হয়ে যাবে।

চতুর্থ দাবি: ঈমানকে শিরক থেকে মুক্ত রাখা।
শিরকের আলোচনা একটি জটিল বিষয়। এ বিষয়ে সাধারণত আলোচনা হয় না বললেই চলে। যার কারণে আমরা শিরক সম্পর্কে তেমন কিছু জানি না। অথচ এটি একটি ভয়াবহ এবং ঘৃণিত অপরাধ। আমরা এই ভয়াবহ এবং ঘৃণিত অপরাধের আলোচনা না করে ইসলামের সাধারণ বিষয় নিয়ে ফাতওয়া দিয়ে সমাজে বিশৃঙ্খলা এবং নৈরাজ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি করছি। নামাযে সূরা ফাতিহার শেষে আমীন আস্তে নাকি জোড়ে? যিকির আস্তে নাকি জোড়ে? সম্মিলিতভাবে মুনাজাত সুন্নাত নাকি বিদআত ইত্যাদি। অথচ এ সব বিষয়ে উভয় মতের পক্ষে হাদীসের দলিল আছে। এগুলো নিয়ে বাড়াবাড়ি করে নিজেদের কী পরিমান ক্ষতি করা হয়েছে তা ভাবতেই গা শিউরে উঠে। এসব সাধারণ বিষয় নিয়ে আলোচনা না করে কুফুর, শিরক ও বিদআতের আলোচনা করা বেশি প্রয়োজন। এজন্য আমরা এখানে শিরক সম্পর্কে কিছু মৌলিক আলোচনা করব ।
শিরকের অর্থ ও পরিচিতি এবং প্রাসঙ্গিক কথা:

---
[১৮৫] সূরা আলে ইমরান, আয়াত-১৯
[১৮৬] আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়া, ১৭/৭৭

শিরকের শাব্দিক পরিচয়: শিরক (الشِّرْكُ) শব্দটি আরবী। এর অর্থ হচ্ছে- অংশীদার হওয়া। (to share, participate, be partner, associate)। সাধারণভাবে 'শিরক' শব্দটিকে আরবীতে 'সহযোগী বানানো' বা অংশীদার করা' অর্থে ব্যবহার করা হয়।

শিরকের পারিভাষিক পরিচয়: (ক) ইসলামি পরিভাষায় আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত বিষয়ে অন্যকে অংশীদার কিংবা সহযোগী করাকে শিরক বলা হয়।
(খ) মহান আল্লাহর সত্তা, নাম, গুণের ক্ষেত্রে কাউকে তাঁর সমতুল্য মনে করা, অথবা মহান আল্লাহর জন্য যে ইবাদত করা হয় তা অন্যকে প্রদান করা, অথবা মহান আল্লাহকে যে ভয় এবং ভক্তি প্রদর্শন করা হয় তা অন্যকে করার নাম শিরক। মহান আল্লাহ বলেন-

فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

তোমরা জেনেশুনে কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ করো না।[১৮৭]
শিরক ঘৃণিত অপরাধ। মহান আল্লাহ বলেন-

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না, যে লোক তাঁর সাথে শরিক করে। তিনি ক্ষমা করেন এর নিম্ন পর্যায়ের পাপ, যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করল, সে অপবাদ আরোপ করল।[১৮৮]

শিরকের প্রকারভেদ ও একটি সংশয়ের নিরসন
শিরকের প্রকার সম্পর্কে সাধারণত কয়েকটি মতামত পাওয়া যায়।
প্রথম মতামত: আল্লামা ইবনুল কায়্যিম রাহি. এবং আল্লামা শামসুদ্দীন যাহাবী রাহি. প্রমূখ আলিম বলেন, শিরক দুই প্রকার।
১. শিরকে আকবার (বৃহত্তর শিরক বা প্রকৃত শিরক)।
২. শিরকে আসগার (ক্ষুদ্রতর শিরক)।
দ্বিতীয় মতামত: অনেক আলিম বিশেষ করে বর্তমান আরব-আমিরাতের অনেক আলিম বলেন, শিরক তিন প্রকার।
১. শিরকে আকবার (বৃহত্তর শিরক বা প্রকৃত শিরক)।
২. শিরকে আসগার (ক্ষুদ্রতর শিরক)।

[১৮৭] সূরা বাকারা, আয়াত-২২
[১৮৮] সূরা আন-নিসা, আয়াত-৪৮

৩. শিরকে খফি (গোপন শিরক)।
তৃতীয় মতামত: গবেষক অনেক আলিম বলেন, শিরক তিন প্রকার।
১. শিরক ফির রবুবিয়্যাহ।
২. শিরক ফিল উলুহিয়্যাহ।
৩. শিরক ফিল আসমা ওয়াস সিফাত।
সংশয় ও নিরসন: ওপরের কয়েকটি মতামতের কারণে একটি সংশয় সৃষ্টি হয়েছে যে, আসলে শিরক কত প্রকার? শিরক মূলত বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ভাগ করা হয়। যেমন, ভয়াবহতার দৃষ্টিকোণ থেকে শিরক দুই প্রকার। ১. শিরকে আকবার (বৃহত্তর শিরক বা প্রকৃত শিরক)। ২. শিরকে আসগার (ক্ষুদ্রতর শিরক)। এভাবে ভাগ করেছেন আল্লামা ইবনুল কায়্যিম রাহি. এবং আল্লামা শামসুদ্দীন যাহাবী রাহি. প্রমূখ আলিম। শিরকের কার্যক্রমের প্রতি লক্ষ্য করলে শিরক তিন প্রকার। ১. শিরক ফির রবুবিয়্যাহ। ২. শিরক ফিল উলুহিয়্যাহ। ৩. শিরক ফিল আসমা ওয়াস সিফাত। এভাবে ভাগ করেছেন বর্তমান সময়ের গবেষক ওলামায়ে কিরাম। এভাবে শিরককে আরও অনেক ভাগ করা যায়। তবে শিরক মূলত তিন প্রকারই। আমরা শিরকের তিন প্রকারের ভেতরে অন্যান্য প্রকার আলোচনা করবো। ইনশাআল্লাহ।

তিন প্রকার শিরকের বিস্তারিত আলোচনা

প্রথম: শিরক ফির রবুবিয়্যাহ, (আল্লাহর সৃষ্টি বা প্রতিপালনে শিরক)
শিরক ফির রবুবিয়্যাহ'র পরিচয়: আল্লাহ ছাড়া কোনো কিছু সৃষ্টি করা বা প্রতিপালন করার বিষয়ে তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরিক বা অংশীদার করা। যেমন, কেউ বিশ্বাস করল 'অমুক সৃষ্টি করতে পারে, প্রতিপালন করতে পারে, জীবন-মৃত্যু দান করতে পারে, রিযিক দান করতে পারে, বিশ্বপরিচালনা করার ক্ষমতা রাখে। অমুক মঙ্গল-অমঙ্গল করতে পারে, আপদ-বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারে, রোগ থেকে আরোগ্য করতে পারে, জেল থেকে মুক্তি দিতে পারে। অমুক ব্যক্তি মনের কামনা বাসনা পূরণ করতে পারে, নিঃসন্তানকে সন্তান দিতে পারে, অভাবীর অভাব দূর করতে পারে ইত্যাদি বিশ্বাস করা শিরক ফির রবুবিয়্যাহ বা আল্লাহর সৃষ্টি ও প্রতিপালনে নিশ্চিতভাবে শিরক করা। এমন বিশ্বাসের কারণে ঈমান ভেঙ্গে যায়। আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সৃষ্টিকর্তা বিশ্বাস করলে যেভাবে ঈমান ভেঙ্গে যায় তেমনিভাবে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে আইনদাতা, বিধানদাতা, হুকুমদাতা বিশ্বাস করলেও শিরক ফির রবুবিয়্যাহ বা আল্লাহর সৃষ্টি ও প্রতিপালনে নিশ্চিতভাবে শিরক হবে এবং ঈমান ভেঙ্গে যাবে। কেননা আইন, বিধান এবং হুকুমের নিরঙ্কুশ মালিক মহান আল্লাহ। তিনি বলেন-

أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

সাবধান! সৃষ্টি তাঁর, আইন ও হুকুমও তাঁরই। আল্লাহ বরকতময়, যিনি বিশ্বের প্রতিপালক। *সূরা আরাফ, আয়াত-৫৪*

আলফাতওয়া আলহিন্দিয়া'র মধ্যে বলা হয়েছে-

يَكْفُرُ إِذَا وَصَفَ اللَّهَ تَعَالَى بِمَا لَا يَلِيقُ بِهِ أَوْ سَخِرَ بِاسْمٍ مِنْ أَسْمَائِهِ أَوْ بِأَمْرٍ مِنْ أَوَامِرِهِ أَوْ نُكِرَ وَعْدَهُ وَوَعِيدَهُ، أَوْ جَعَلَ لَهُ شَرِيكًا، أَوْ وَلَدًا، أَوْ زَوْجَةً

কেউ যদি মহান আল্লাহর ব্যাপারে এমন কথা বলে যা তাঁর ইজ্জত-সম্মানের পরিপন্থী অথবা আল্লাহর কোনও নামের কিংবা তাঁর কোনও নির্দেশের ব্যাপারে ঠাট্টা বা উপহাস করে অথবা ইসলাম ধর্মের অকাট্যভাবে প্রমাণিত কোনো বিষয় নিয়ে এবং ভালো কাজের প্রতিদান এবং মন্দ কাজের পরিণাম নিয়ে ঠাট্টা মশকরা করে অথবা তাঁর সাথে কাউকে শরিক করে, অথবা তাঁর সন্তান কিংবা স্ত্রী আছে বলে দাবি করে তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে।[১৮৯]

দ্বিতীয়: শিরক ফিল উলুহিয়্যাহ, (আল্লাহর ইবাদত পালনে শিরক)

শিরক ফিল উলুহিয়্যাহ'র পরিচয়: শিরক ফিল উলুহিয়্যাহ'র আরেক নাম শিরক ফিল ইবাদাহ। ইবাদত পালনে আল্লাহর সাথে অন্য কারো নাম নেওয়াকে শিরক ফিল উলুহিয়্যাহ বা শিরক ফিল ইবাদাহ বলা হয়। এই ধরণের শিরক জাহেলি যুগের প্রচলিত শিরক। ইমাম কুরতুবি রাহি. বলেন শিরক ফিল ইবাদাহ হচ্ছে ঘৃণিত অন্যায় এবং অপরাধ। কারণ হচ্ছে জাহেলি যুগের মুশরিকরা আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা বিশ্বাস করতো আবার তাঁর ইবাদতের মধ্যে শিরক করতো। তারা মনে করতো আল্লাহ এককভাবে সৃষ্টিকর্তা নন। তিনি এককভাবে রিযিকদাতা, জীবন ও মৃত্যুদাতা নন। বরং আল্লাহর সাথে আরো সৃষ্টিকর্তা এবং রিযিকদাতা, জীবন ও মৃত্যুদাতা আছে। আরবের মুশরিকরা এগুলো বিশ্বাস করতো এবং পুরোপুরি মেনে চলতো।

আমরা যদি একটু সচেতন দৃষ্টিতে লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পারি যে, আমাদের আশেপাশে এমন অনেকেই আছেন যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করেন কিন্তু আল্লাহকে এককভাবে রিযিকদাতা, জীবনদাতা, মঙ্গল-অমঙ্গলকারী, আইনদাতা, বিধানদাতা, হুকুমদাতা ইত্যাদি পুরোপুরি মেনে চলেন না। বরং তারা আল্লাহর সাথে সাথে অমুক মাযার কিংবা অমুক পীরকে রিযিকদাতা, জীবনদাতা, মঙ্গল-অমঙ্গলকারী, আইনদাতা, সন্তানদাতা, সম্পদদাতা, বিপদ থেকে উদ্ধারকারী

[১৮৯] আল-বাহরুর রায়িক, ১১/৩২৮; আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়া, ১৭/৮৫

ইত্যাদিতে বিশ্বাস করেন। আরবের মুশরিকদের ভুল বিশ্বাসের কারণে যেমন তাদের ঈমান নেই, তেমনিভাবে যারা ঈমানের দাবি করার পরও অমুক মাযার কিংবা অমুক পীরের ব্যাপারে এমন বিশ্বাস করবে বা মেনে নিবে তাদেরও ঈমান থাকবে না।

প্রশ্ন: শিরক ফির রবুবিয়্যাহ এবং শিরক ফিল উলুহিয়্যা'র মধ্যে পার্থক্য কী?
উত্তর: শিরক ফির রবুবিয়্যাহ'র সম্পর্ক হচ্ছে বিশ্বাসের সাথে। শিরক ফিল উলুহিয়্যার সম্পর্ক হচ্ছে মেনে নেওয়ার সাথে বা কর্মের সাথে। অর্থাৎ আল্লাহর সাথে অন্যকে রিযিকদাতা, জীবনদাতা, মঙ্গল-অমঙ্গলকারী, আইনদাতা, বিধানদাতা, হুকুমদাতা ইত্যাদি বিশ্বাস করার নাম শিরক ফির রবুবিয়্যাহ। আল্লাহর সাথে অন্যকে রিযিকদাতা, জীবনদাতা, মঙ্গল-অমঙ্গলকারী, আইনদাতা, বিধানদাতা, হুকুমদাতা ইত্যাদি মেনে নেওয়ার নাম শিরক ফিল উলুহিয়্যাহ বা শিরক ফিল ইবাদাহ।

শিরক ফিল উলুহিয়্যাহ বা ইবাদাহ দুই প্রকার

১. শিরকে আকবার: (বৃহত্তর শিরক বা প্রকৃত শিরক)। ২. শিরকে আসগার: (ক্ষুদ্রতর শিরক)।

শিরকে আকবার বা বৃহত্তর শিরকের পরিচয় ও বিস্তারিত বিবরণ

যেভাবে আল্লাহকে বিশ্বাস করা, তাঁকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করা এবং তাঁকে মানা, ডাকা, তাঁর কাছে সাহায্য, সম্পদ ও সন্তান ইত্যাদি প্রার্থনা করা হয় সেভাবে তা অন্য কারো কাছে প্রার্থনা করাকে শিরকে আকবার বলা হয়। যেমন-

১. মহান আল্লাহকে যেভাবে বিশ্বাস করা, ভালোবাসা ও ভক্তিশ্রদ্ধা করা হয় সেভাবে কোনো মানুষকে বিশ্বাস করা, ভালোবাসা ও ভক্তিশ্রদ্ধা করা শিরকে আকবার। মহান আল্লাহ বলেন-

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ

মানুষের মধ্যে এমন কিছু লোকও আছে যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে এমনভাবে তার অংশীদার সাব্যস্ত করে যে তাদেরকে তারা ভালোবাসে আল্লাহর ভালোবাসার মতো। আর যারা ঈমান এনেছে তারা আল্লাহকেই সর্বাপেক্ষা বেশি ভালোবাসে। *সূরা বাকারা, আয়াত-১৬৫*

বাদশা আলমগীরের শাসনামলে সম্মিলিত ওলামায়ে কিরামে তত্ত্বাবধানে রচিত 'আলফাতাওয়া আলহিন্দিয়া' (ফাতওয়ায়ে আলমগীরি)তে বলা হয়েছে-

وَلَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى يَكْفُرُ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ

কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে, তুমি আমার কাছে আল্লাহ থেকে অধিক প্রিয়, তাহলে কুফুর হবে। খুলাসাতুল ফাতওয়াতে এমনই বলা হয়েছে। *আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়া, ১৭/৯৬*

২. আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে বিশ্বাস করে তার কাছে রিযিক, সম্পদ এবং সন্তান চাওয়া শিরকে আকবার। কারণ এগুলো আল্লাহ ছাড়া আর কেউ দেওয়ার শক্তি নেই। মহান আল্লাহ বলেন-

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ • أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব একমাত্র মহান আল্লাহরই। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন, যাকে ইচ্ছা কন্যা-সন্তান এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র-সন্তান দান করেন। অথবা তাদেরকে দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে দেন। নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ, ক্ষমতাশীল। *সূরা শুরা, আয়াত-৪৯,৫০*

শিরকে আকবার মানুষকে ঈমান থেকে বের করে দেয়। অর্থাৎ যারা শিরকে আকবার করবে তাদের ঈমান বাতিল হয়ে যাবে। তাদের ঈমান থাকবে না।

শিরকে আসগার বা ক্ষুদ্রতর শিরকের পরিচয় ও বিস্তারিত বিবরণ

যে সব বিশ্বাস, কথা বা কাজ বাহ্যিকভাবে শিরকের মতো হলেও সেটা প্রকৃত শিরক পর্যন্ত পৌঁছে নি তাকে শিরকে আসগার (ক্ষুদ্রতর শিরক) বলা হয়। যেমন-

১. মানুষকে দেখানোর জন্য ইবাদত করা শিরকে আসগারঃ আল্লাহ বলেন-

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ • الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ • الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ

অতএব দুর্ভোগ সেসব নামাযির, যারা তাদের নামায সম্বন্ধে বে-খবর। যারা নামায পড়ে লোক-দেখানোর জন্য। *সূরা মাউন, আয়াত-৪,৫,৬*

ক. মানুষের নিকট থেকে দানবীর উপাধী পাবার জন্য কোনো কাজে দান করা।

খ. মানুষের নিকট থেকে বীর, শহীদ, গাজী এসব উপাধী পাবার জন্য যুদ্ধ করা।

গ. মানুষের নিকট থেকে আলিম উপাধী পাবার জন্য ইলম অর্জন করা।

ঘ. মানুষের নিকট থেকে হাফিয উপাধী পাবার জন্য কুরআন মুখস্ত করা।

প্রিয় পাঠক! এ সব বিষয়ে হাদীসে এসেছে, যারা মানুষকে দেখানোর জন্য এমন আমল করেছে মহান আল্লাহ তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।[১৯০]

এছাড়াও ইসলামের যে কোনো আমল মানুষকে দেখানোর নিয়তে করলে এর বিনিময়ে কোনো সওয়াব হবে না। বরং তাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে। কারণ,

[১৯০] সহীহ মুসলিম, হাদীস-৫০৩২

মানুষকে দেখানোর জন্য আমল করলে তা শিরকে আসগার বা ক্ষুদ্রতর শিরকে পরিগণিত হয়।

২. বিভিন্ন উপকরণে বিশ্বাস বিষয়ক শিরক এবং তা বোঝার মূলনীতি

মহান আল্লাহ পৃথিবীর সব কিছুকে একটি নির্ধারিত নিয়মে পরিচালনা করেন। যেমন, পানিতে ভিজলে ঠাণ্ডা এবং সর্দি লাগা। আগুনে পুড়ে যাওয়া। বিষপানে মৃত্যু হওয়া। ঝড়-তুফানে ঘর-বাড়ি এবং গাছপালার ক্ষতি হওয়া। নষ্ট খাবার গ্রহণ করলে পেটে সমস্যা হওয়া ইত্যাদি। এখানে একজন মুমিন ব্যক্তি বিশ্বাস করেন এ সব কিছু হয় মহান আল্লাহর ইচ্ছায়। তিনি ইচ্ছা করলে এগুলোর কার্যক্ষমতা নষ্ট করে দিতে পারেন। তখন পানিতে ভিজলে ঠাণ্ডা এবং সর্দি লাগবে না। আগুনে পুড়বে না। বিষপানে মৃত্যু হবে না। ঝড়-তুফানে ঘর-বাড়ি এবং গাছপালার ক্ষতি হবে না। নষ্ট খাবার গ্রহণ করলেও পেটে সমস্যা হবে না। একজন মুমিন তার অন্তরে শতভাগ এমন বিশ্বাস রেখে উপরে উল্লেখিত কথাগুলো বললে কোনো অসুবিধা নেই। তবে কেউ যদি বিশ্বাস করে যে, আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়াই পানি, আগুন, বিষ, ঝড়-তুফান ইত্যাদির নিজস্ব ক্ষমতা আছে তাহলে শিরকে আকবার বা বৃহত্তর শিরক বলে গণ্য হবে। প্রাচীনকালের লোকেরা বিশ্বাস করতো গ্রহ-নক্ষত্র, চন্দ্র-সূর্য এবং রাশির প্রভাবে জলে-স্থলে এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে ভালো-মন্দ অবস্থার সৃষ্টি হয়। কোনো মুমিন যদি বলেন 'এরূপ হয় শুধু মহান আল্লাহর ইচ্ছায়।' তাহলে কোনো ধরণের শিরক হবে না। তবে কোনো মুমিন ব্যক্তি যদি বিশ্বাস করেন যে 'মহান আল্লাহর ইচ্ছাতেই এরূপ হয়, তবে মহান আল্লাহ অমুক রাশি উপলক্ষ্যে এরূপ করেছেন।' তাহলে তা শিরকে আসগার হবে। আর যদি প্রকৃতই বিশ্বাস করেন যে গ্রহ-নক্ষত্র, চন্দ্র-সূর্য এবং রাশির নিজস্ব প্রভাবে জলে-স্থলে এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে ভালো-মন্দ অবস্থার সৃষ্টি হয়। তাহলে সে শিরকে আকবার বা বৃহত্তর শিরকে লিপ্ত হয়ে অবশ্যই মুশরিক বলে গণ্য হবে। হাদীসে এসেছে-

قَالَ أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ

(যাইদ ইবনু খালিদ রাদি. বলেন, হুদাইবিয়া নামক মাঠে অবস্থান করার সময়ে রাত্রিকালে কিছু বৃষ্টিপাত হয়। সকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীগণকে নিয়ে ফজরের নামায আদায় করলেন। এরপর তিনি উপস্থিত লোকদের দিকে থাকিয়ে বললেন, তোমরা কি জানো, তোমাদের রব কি বলেছেন? তারা বললেন, আল্লাহ এবং তার রাসূল ভালো জানেন'। তখন তিনি বললেন, মহান আল্লাহ বলেছেন- 'আমার বান্দাদের মধ্য থেকে কেউ আমার প্রতি ঈমান নিয়ে সকাল করেছে।

কেউ আমার প্রতি কুফুরি করেছে। যে ব্যক্তি বলেছে আমরা আল্লাহর অনুগ্রহ এবং দয়ায় বৃষ্টি পেয়েছি সে আমার প্রতি ঈমান নিয়ে সকাল করেছে এবং নক্ষত্র-রাশির প্রভাবকে অস্বীকার করেছে। আর যে ব্যক্তি বলেছে আমরা অমুক অমুক নক্ষত্র-রাশির প্রভাবে বৃষ্টি পেয়েছি তারা কুফুরি নিয়ে সকাল করেছে এবং নক্ষত্র-রাশির প্রতি ঈমান এনেছে। *সহীহ বুখারী, হাদীস-৮১০, ৯৯১*

৩. আল্লাহ যা চান এবং আপনি যা চান বলা শিরক সম্পর্কিত কিছু উক্তি ও তা বুঝার মূলনীতি

আমরা এমন অনেক কথা মাঝে মধ্যে বলে থাকি, যে সব কথায় আমাদের অজান্তেই শিরকে আসগার কিংবা শিরকে আকবার (ক্ষুদ্রতর কিংবা বৃহত্তর শিরক) হয়ে যায়। এখানে এই ধরণের কিছু শিরকি কথা এবং তা জানা ও বুঝার মূলনীতি আলোচনা করব, ইনশাআল্লাহ।

ক. কেউ যদি বলে 'শুধু আল্লাহর ইচ্ছায় ও দয়ায় ভালো ফসল হয়েছে।' তাহলে কোনো ধরণের শিরক হবে না। এটা মুমিনের প্রকৃত বিশ্বাস। এমনটাই বলতে হবে। কেউ যদি বলে আল্লাহর ইচ্ছায় ও ভালো সারের কারণে ভালো ফসল হয়েছে। তাহলে শিরকে আসগার বলে গণ্য হবে। কেউ যদি বলে 'আল্লাহর ইচ্ছায় এবং ভালো সার দু'টি আলাদা আলাদা কারণ। ভালো সারের কারণেই ভালো ফসল হয়েছে।' তাহলে শিরকে আকবার বলে গণ্য হবে।

খ. কেউ যদি বলে 'শুধু আল্লাহর ইচ্ছায় ও দয়ায় আমার উপর থেকে বিপদ কেটে গেছে।' তাহলে কোনো ধরণের শিরক হবে না। এটা মুমিনের প্রকৃত বিশ্বাস। এমনটাই বলতে হবে। কেউ যদি বলে 'আল্লাহ এবং আপনি না থাকলে আমার উপর থেকে বিপদ দূর হত না'। তাহলে তার বিশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে হয় তো শিরকে আসগার নতুবা শিরকে আকবার বলে গণ্য হবে।

গ. কেউ যদি বলে ১. 'উপরে আল্লাহ এবং জমিনে আপনি ছাড়া আমার আর কেউ নেই'। অথবা বলে ২. 'আমার জন্য আল্লাহ আর আপনি ছাড়া কেউ নেই'। অথবা বলে ৩. 'বাসের চালক কিংবা বিমানের পাইলট যদি এমন এমন না করতেন তাহলে আজকে রক্ষা ছিল না'। অথবা বলে ৪. 'আপনি না হলে অমুক কাজটি সফল হতো না' ইত্যাদি। এমন কথা কেউ যদি কথার কথায় বলে তাহলে শিরকে আসগার হবে। আর যদি কেউ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের পাশাপাশি ঐ ব্যক্তির প্রতি প্রকৃতই এরূপ বিশ্বাস করে তাহলে শিরকে আকবার বলে গণ্য হবে। বিশেষ প্রয়োজনে এধরণের কথা বলতে হলে এভাবে বলা 'শুধু আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট। শুধু আল্লাহই রক্ষা করেছেন। শুধু আল্লাহই সফলতা দান করেছেন'।

ঘ. কেউ যদি বলে 'হে নেতা!, মন্ত্রী!, বাদশাহ!, মহান আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন অতঃপর/এরপর আপনি যা ইচ্ছা করেন'। এভাবে বললে শিরক হবে না। উত্তম হলো 'শুধু মহান আল্লাহ যা চাইবেন তাই হবে' বলা। এটা মুমিনের প্রকৃত বিশ্বাস। এমনটাই হতে হবে। কেউ যদি বলে 'হে নেতা!, মন্ত্রী!, বাদশাহ!, মহান আল্লাহ যা চান এবং আপনি যা চান তাই হবে'। তাহলে তার বিশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে হয় তো শিরকে আসগার নতুবা শিরকে আকবার বলে গণ্য হবে। হাদীসে এসেছে-

عَنْ قُتَيْلَةَ إِمْرأَةٍ مِنْ جُهَيْنَةَ أَنَّ يَهُوْدِيًّا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ اِنَّكُمْ تُنَدِّدُوْنَ وَاِنَّكُمْ تُشْرِكُوْنَ تَقُوْلُوْنَ : مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ ؛ وَتَقُوْلُوْنَ وَالْكَعْبَةِ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم اِذَا أَرَادُوْا أَنْ يَحْلِفُوْا أَنْ يَقُوْلُوْا : وَرَبِّ الْكَعْبَةِ وَيَقُوْلُوْنَ : مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ شِئْتَ

জুহাইনা গোত্রের কুতাইলা থেকে বর্ণিত: এক ইহুদি আমাদের নবী ﷺ এর নিকট এসে বলল, আপনারা তো আল্লাহর সমকক্ষ করেন এবং শিরক করেন। আপনারা বলে থাকেন, 'আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন আর তুমি যা ইচ্ছা কর'। আপনারা আরও বলে থাকেন, 'কাবার কসম'। (এভাবে বলা শিরক।) তখন নবী ﷺ সাহাবীগণকে নির্দেশ দিলেন 'যখন তোমরা কসম করার ইচ্ছা করবে, তখন বলবে: কাবার রবের কসম। আর বলবে: আল্লাহ যা চেয়েছেন, অতঃপর তুমি যা চেয়েছ। *সুনানুন নাসাঈ, হাদীস-৩৭৭৩*

সাহাবী হুযাইফা রাদি. থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে-

لَا تَقُوْلُوْا مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ فُلَانٌ وَلَكِنْ قُوْلُوْا مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ شَاءَ فُلَانٌ

তোমরা বলবে না 'আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন এবং অমুক যা ইচ্ছা করেন'। বরং তোমরা বলবে 'আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন অতঃপর অমুক যা ইচ্ছা করেন।[১৯১]

হযরত আয়েশা রাদি. থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে-

لَا تَقُوْلُوْا مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ قُوْلُوْا مَا شَاءَ اللهُ وَحْدَهُ

তোমরা বলবে না 'আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন এবং মুহাম্মাদ ﷺ যা ইচ্ছা করেন'। বরং তোমরা বলবে 'শুধুই আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন। মাজ. যাও., হা.-১১৯০১

হযরত ইবনে আব্বাস রাদি. থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে-

أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَجَعَلْتَنِي وَاللَّه عَدْلًا بَلْ مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ

[১৯১] সুনানু আবু দাউদ, হাদীস-৪৯৮২

এক ব্যক্তি নবী ﷺ-কে বললেন, আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন এবং আপনি যা ইচ্ছা করেন, নবী ﷺ তাকে বললেন: তুমি কি আমাকে আল্লাহর সমকক্ষ বানিয়ে দিলে? তুমি বলো, শুধু আল্লাহই যা ইচ্ছা করেন।[১৯২]

আল্লাহ যা চান এবং আপনি যা চান বলা শিরক সম্পর্কিত মূলনীতি

প্রিয় পাঠক! আমরা উপরে উল্লেখিত কয়েকটি হাদীসের উপর একটু লক্ষ্য করলে সহজেই বুঝতে পারি যে, কথা বলার সময় শব্দ এবং বাক্য ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন না করলে অনেক ক্ষেত্রে নিজেদের অজান্তেই শিরকী কথা চলে আসে আবার সামান্য সতর্কতা অবলম্বন করলে শিরক নামক ভয়াবহ অপরাধ থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব। যেমন- কেউ যদি বলে 'আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন এবং অমুক যা ইচ্ছা করেন' এভাবে বলা শিরক। এই বাক্যটিতে দুজনের ইচ্ছার মধ্যে 'এবং' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। তবে যদি কেউ বলে 'আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন অতঃপর অমুক যা ইচ্ছা করেন' এভাবে বললে শিরক হবে না। এই বাক্যটিতে দুজনের ইচ্ছার মধ্যে 'অতঃপর/এরপর' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। সুতরাং উপরে উল্লেখিত যে সব বাক্যে শিরকের কথা বলা হয়েছে সে সব বাক্য বলার সময় প্রথম কর্তব্য হলো 'শুধুই আল্লাহ করেছেন বলা' এবং বিশেষ প্রয়োজনে অতঃপর/এরপর শব্দ যোগ করে বলা। মহান আল্লাহ আমাদেরকে সতর্কতার সাথে শিরক মুক্ত কথা বলার তাওফীক দান করেন।

৪. কুযাত্রা, অযাত্রা, কুলক্ষণ, অশুভ এবং অমঙ্গল শিরক সম্পর্কিত কিছু উক্তি ও মূলনীতি

ইসলামে কুযাত্রা, অযাত্রা, কুলক্ষণ, অশুভ এবং অমঙ্গল ইত্যাদিতে বিশ্বাসের কোনো স্থান নেই। সুতরাং কেউ যদি এ সব বিশ্বাস করে তাহলে শিরক হবে। কেউ যদি কথার কথায় কিংবা অনিচ্ছায় এ সব বলে তাহলে শিরকে আসগার হবে। কিন্তু কেউ যদি এগুলোতে প্রকৃতভাবে বিশ্বাস করে তাহলে শিরকে আকবার বা বৃহত্তর শিরক হবে এবং ঈমান ভেঙ্গে যাবে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন-

الطِّيَرَةُ شِرْكٌ الطِّيَرَةُ شِرْكٌ ثَلاَثًا وَمَا مِنَّا إِلاَّ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ

কোনো বস্তুকে কুলক্ষণ, অশুভ, অমঙ্গল ইত্যাদি বিশ্বাস করা শিরক। কোনো বস্তুকে কুলক্ষণ, অশুভ, অমঙ্গল ইত্যাদি বিশ্বাস করা শিরক। তিনি একথা

[১৯২] মুসনাদু আহমাদ, হাদীস-১৮৩৯; আস-সুনানুন নাসাঈ, হাদীস-১০৮২৪

তিনবার বলেছেন। আমাদের কারো মনে এমন কিছু হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু আল্লাহর উপর ভরসা করলে তিনি তা দূর করে দেন।[১৯৩]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনুল আমর রাদি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন-

مَنْ رَدَّتْهُ الطِّيَرَةُ مِنْ حَاجَةٍ فَقَدْ أَشْرَكَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كَفَّارَةُ ذَلِكَ قَالَ أَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمْ
اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ وَلَا طَيْرَ إِلَّا طَيْرُكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ

কুলক্ষণ, অশুভ, অমঙ্গল ইত্যাদি মনে করে যে ব্যক্তি তার কাজ বা যাত্রা করা থেকে বিরত থাকল সে শিরক করল। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এর কাফফারা কী? তিনি বললেন, সে একথা বলবে, হে আল্লাহ! আপনার কল্যাণ ছাড়া আর কোনো কল্যাণ নেই। আপনার শুভ অশুভ ছাড়া আর কোনো শুভ অশুভ নেই। আপনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই।[১৯৪]

এ সম্পর্কিত কথা ও কাজে শিরক থেকে রক্ষার মূলনীতি

ইসলামে কুযাত্রা, অযাত্রা, কুলক্ষণ, অশুভ এবং অমঙ্গল ইত্যাদিতে বিশ্বাসের কোনো স্থান নেই। সুতরাং এ সব কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে। এ ধরণের শিরক থেকে বেঁচে থাকার জন্য দুটি কাজ করতে হবে। প্রথমতঃ কথা বলা ও কাজের সময় সতর্কতা অবলম্বন করা। দ্বিতীয়তঃ কখনো এ ধরণের কিছু বললে রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক নির্দেশিত দুআ পড়া। আরবীতে পড়া উত্তম। আরবীতে না পারলে বাংলাতেও বলা যাবে। দুআটি হচ্ছে-

اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ وَلَا طَيْرَ إِلَّا طَيْرُكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা লা খাইরা ইল্লা খাইরুকা। ওয়া ত্বাইরা ইল্লা ত্বাইরুকা। ওয়ালা ইলাহা গাইরুক। অর্থ: ওপরের হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।

৫. ভাগ্য গণনা, গাইবী সংবাদ, যাদু, ভ্রান্ত তাবিয-কবজ, রাশি বিষয়ক শিরক:

ইসলামে ভাগ্য গণনা, গাইবী সংবাদ, যাদু, ভ্রান্ত তাবিয-কবজ রাশি ইত্যাদিতে বিশ্বাসের কোনো স্থান নেই। সুতরাং কেউ যদি এ সব বিশ্বাস করে তাহলে শিরক হবে। কেউ মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখার পরও এসব বিশ্বাস করলে কিংবা ভাগ্য গণনা, গাইবী সংবাদ, যাদু, ভ্রান্ত তাবিয-কবজ, রাশি, হস্তরেখাবিদের নিকট গমন করলে শিরকে আসগার হবে। কিন্তু কেউ যদি এগুলোর প্রভাবকে প্রকৃতভাবে বিশ্বাস করে এবং সত্য বলে স্বীকার করে তাহলে শিরকে আকবার বা বৃহত্তর শিরক হবে। একজন মুমিনের বিশ্বাস এমন হওয়া উচিত যে, ভাগ্য গণনা, গাইবী সংবাদ, যাদু, ভ্রান্ত তাবিয-কবজ, রাশি এবং

[১৯৩] সুনানু আবু দাউদ, হাদীস-৩৯১২

[১৯৪] মুসনাদে আহমদ, হাদীস-৭০৪৫; মাজমাউয যাওয়াইদ, হাদীস-৮৪১২

হস্তরেখা ইত্যাদির কোনো প্রভাব নেই। সবকিছুর মালিক একমাত্র আল্লাহ। তিনিই সবকিছু করেন।

হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন রাদি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন-

لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ أَوْ تُطِيِّرَ لَهُ أَوْ تَكَهَّنَ أَوْ تُكِهِّنَ لَهُ أَوْ سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ وَمَنْ عَقَدَ عُقْدَةً أَوْ قَالَ: مَنْ عَقَدَ عُقْدَةً وَمَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ

ঐ ব্যক্তি আমার দলভুক্ত নয় (পরিপূর্ণ উম্মত নয়) যে ব্যক্তি শুভ অশুভ নির্ণয় করে অথবা যার জন্য তা নির্ণয় করা হয়। অথবা যে ব্যক্তি ভাগ্য গণনা করে অথবা যার জন্য ভাগ্য গণনা করা হয়। যে ব্যক্তি যাদু করে অথবা যার জন্য যাদু করা হয়। যে ব্যক্তি গিট দেয় (সুতা, তাগায় ইত্যাদিতে)। যে ব্যক্তি জ্যোতিষী বা গণকের কাছে যায় এবং সে যা বলে তা বিশ্বাস করে তবে ঐ ব্যক্তি মুহাম্মাদ ﷺ এর উপর নাযিলকৃত ইসলামের সাথে কুফুরি করল।[১৯৫]

রাসূলুল্লাহর স্ত্রী সাফিয়্যা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন-

مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً

যে ব্যক্তি কোনো জ্যোতিষী, গাইবী সংবাদদাতা, হস্তরেখাবিদ, গণকের নিকট গমন করে এবং তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করে তাহলে চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার নামায কবুল হবে না। *সহীহ মুসলিম, হাদীস-৫৯৫৭*

তৃতীয়: শিরক ফিল আসমা ওয়াস সিফাত: (নাম, গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যে শিরক)

কুরআন-হাদীসে মহান আল্লাহর অনেক নাম, পূর্ণতার গুণাবলী এবং বৈশিষ্ট্য রয়েছে। মহান আল্লাহর নাম, পূর্ণতার গুণাবলীর মাধ্যমে তাকে ডাকতে বলা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন-

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

উত্তম নামসমূহ আল্লাহরই। সুতরাং তাঁকে সেই সব নামেই ডাকবে। যারা তাঁর নামে অন্য পথ অবলম্বন করে তাদেরকে বর্জন কর। তারা যা কিছু করছে তাদেরকে তার বদলা দেওয়া হবে। *সূরা আরাফ, আয়াত-১৮০*

মহান আল্লাহর নামের সাথে অন্য কারো নাম নিতে মহান আল্লাহ নিজেই নিষেধ করেছেন। তারপরও যদি কেউ তাঁর নামের সাথে অন্য কোনও পীর অথবা পীরবাবা কিংবা ওলী বা অন্য কারো নাম নেয় তার কী পরিণাম হবে তাও মহান আল্লাহ কুরআনে উল্লেখ করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন-

وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

[১৯৫] মুসনাদুল বাযযার, হাদীস-৩৫৭৮; মাজমাউয যাওয়াইদ, হাদীস-৮৪৮০

আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মাবূদকে আহ্বান করো না, তিনি ছাড়া কোনো মাবূদ নেই। সবকিছু ধ্বংসশীল, কেবল আল্লাহর সত্তাই ব্যতিক্রম। শাসন কেবল তাঁরই এবং তাঁরই কাছে তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে। *সূরা কাসাস, আয়াত-৮৮*

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন-

أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

তবে কে তিনি, যিনি স্থল ও সমুদ্রের অন্ধকারে তোমাদেরকে পথ দেখান এবং যিনি নিজ রহমতের (বৃষ্টির) আগে বাতাস পাঠান, যা তোমাদেরকে (বৃষ্টির) সুসংবাদ দেয়। (তবুও কি তোমরা বলছো) আল্লাহর সঙ্গে অন্য প্রভু আছে? (না বরং) তারা যে শিরকে লিপ্ত আছে আল্লাহ তা থেকে বহু উর্ধ্বে।[১৯৬]

আয়াতে লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবেন যে, আরবের মুশরিকরা মহান আল্লাহর সাথে অন্যদেরকে আহ্বান করতো। কারণ তারা বিশ্বাস করতো মহান আল্লাহ ছাড়া আরও সাহায্যকারী আছে। আমাদের দেশেও কিছু সহজ সরল মুমিন আছে যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে এবং আরবের মুশরিকদের মতো কখনো বিপদে পড়লে বিভিন্ন মাযারে কিংবা পীরের বাড়িতে গিয়ে পীরকে, কথিত বাবাকে সাহায্যকারী বলেই বিশ্বাস করে এবং তার কাছে বিভিন্ন বিষয়ে সাহায্য প্রার্থনা করে। মহান আল্লাহ আয়াতটিতে আরবের মুশরিকদের কার্যক্রমকে শিরক বলেছেন। সুতরাং এখনো কোনও মুমিন ব্যক্তি মাযারে কিংবা পীরের বাড়িতে গিয়ে পীরকে, কথিত বাবাকে সাহায্যকারী বিশ্বাস করলে এবং তার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলে অবশ্যই শিরক হবে। এতে কোনো সন্দেহ নেই।

কুরআন-হাদীসে মহান আল্লাহর নাম ও পূর্ণতার গুণাবলী উল্লেখ করা হয়েছে। একটি হাদীসে মহান আল্লাহর ৯৯টি নাম বলা হয়েছে। সেসব নাম নিয়ে তাঁকে আহ্বান করতে বিভিন্ন হাদীসে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। আমরা মহান আল্লাহকে সেভাবে আহ্বান করব যেভাবে মহানবী ﷺ আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। তাঁকে আহ্বান করতে সতর্ক থাকতে হবে যেন শিরক না হয়। কেননা মহান আল্লাহর এ সকল নাম, পূর্ণতার গুণাবলী এবং বৈশিষ্ট্যের সাথে কোনো মানুষকে কিংবা তাঁর কোনো সৃষ্টিকে তুলনা করাকে শিরক ফিল আসমা ওয়াস সিফাত বলা হয়। যেমন-

১. মহান আল্লাহর পূর্ণতার গুণাবলী এবং বৈশিষ্ট্য থেকে অন্যতম একটি গুণ ও বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তিনি 'আলিমুল গাইব' অর্থাৎ কোনো মাধ্যম ছাড়াই তিনি অদৃশ্যের সংবাদ জানেন। এই গুণ এবং বৈশিষ্ট্য একমাত্র মহান আল্লাহর।

[১৯৬] সূরা নামল, আয়াত-৬৩

সুতরাং কেউ যদি বিশ্বাস করেন যে, অমুক ওলী কিংবা পীর অথবা অমুক ব্যক্তি ‘গায়েবের খবর’ জানেন তাহলে শিরক ফিল আসমা ওয়াস সিফাত বলে গণ্য হবে। এমনিভাবে মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সর্বত্র বিদ্যমান বিশ্বাস করা শিরক ফিল আসমা ওয়াস সিফাত বলে গণ্য হবে। এধরণের বিশ্বাস মহান আল্লাহর সাথে শিরক। এই ধরণের শিরকের নাম শিরকে আকবার বা বৃহত্তর শিরক।

২. মহান আল্লাহর পূর্ণতার গুণাবলী এবং বৈশিষ্ট্য থেকে আরেকটি অন্যতম গুণ ও বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তিনি ‘সাহায্যকারী, উদ্ধারকারী, ত্রাণকর্তা’। প্রতিটি মুমিন এ কথা বিশ্বাস করেন যে একমাত্র মহান আল্লাহই ‘সাহায্যকারী, উদ্ধারকারী এবং ত্রাণকর্তা’। সুতরাং কোনো মুমিন আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ‘সাহায্যকারী, উদ্ধারকারী এবং ত্রাণকর্তা’ বলে বিশ্বাস করতে পারে না। অত্যন্ত দুঃখজনক বিষয় হলো আমরা মহান আল্লাহকে এভাবেই বিশ্বাস করি, কিন্তু কিছু সরল মুমিন না জানার কারণে কিংবা না বুঝার কারণে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ওলী বা পীরকে ‘সাহায্যকারী, উদ্ধারকারী, ত্রাণকর্তা’ বলে থাকেন। যেমন, ত্রাণকর্তা মানে গাউস। গাউস (غَوْثٌ) শব্দটি আরবী। এর অর্থ ত্রাণকর্তা। আর গাউসুল আযম (غَوْثُ الْاَعْظَمْ) অর্থ হলো মহাত্রাণকর্তা। মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ত্রানকর্তা কিংবা মহাত্রাণকর্তা বিশ্বাস করা এবং বলা শিরক।

এই ধরণের শিরকের ভয়াবহতার ব্যাপারে সহজে বুঝা যাবে আলফাতওয়া আলহিন্দিয়া (ফাতওয়ায়ে আলমগীরি) থেকে। কিতাবটিতে বলা হয়েছে-

رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَلَمْ يَحْضُرْ الشُّهُودُ قَالَ خدايرا وَرَسُول راكواه كردم ، أَوْ قَالَ: خداي راوفرشتكان راكواه كردم ، كَفَرَ.

কোনো এক ব্যক্তি এক মহিলাকে বিয়ে করল। কিন্তু কোনও সাক্ষী উপস্থিত নেই। তখন সে ব্যক্তি বলল, আমরা এই বিয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সাক্ষী রেখেছি। অথবা বলল, আমরা এই বিয়ে দুইজন ফিরিশতাকে সাক্ষী রেখেছি। তাহলে এমন কাজের কারণে কুফুর হবে। *আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়া,* ১৭/১৭৬

আমরা শিরকের তৃতীয় প্রকার ‘শিরক ফিল আসমা ওয়াস সিফাত’ এর আলোচনায় দেখেছি যে মহান আল্লাহর নাম, গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যে শিরক করা গুরুতর অন্যায় এবং অপরাধ। এতে সাধারণত ঈমান ভেঙ্গে যায়। সুতরাং আজ থেকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, কখনো যেন মহান আল্লাহর সাথে কোনও ধরণের শিরক না হয়। কেননা শিরকের রয়েছে ভয়ঙ্কর পরিণাম।

শিরকের ভয়ঙ্কর পরিণাম

১. শিরক মুমিনের ঈমান ও আমলকে ধ্বংস করে দেয়। মহান আল্লাহ বলেন-

لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

আপনি যদি শিরক করেন, তবে আপনার সমস্ত কর্ম নিষ্ফল হবে এবং আপনি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত হবেন। *সূরা যুমার, আয়াত-৬৫*

২. শিরক সবচেয়ে বড় এবং ভয়ঙ্কর অপরাধ। মহান আল্লাহ বলেন-

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

এবং সেই সময়কে স্মরণ করুন যখন লুকমান আ. তাঁর ছেলেকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছিলেন, হে আমার আদরের ছেলে! আল্লাহর সাথে শিরক করো না। নিশ্চয় শিরক চরম অন্যায়।[১৯৭] হাদীসে এসেছে-

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْكَبَائِرِ قَالَ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ

আনাস রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী صلى الله عليه وسلم -কে কবীরা গুনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছে, তিনি বললেন; আল্লাহর সাথে শিরক করা, পিতা-মাতার সাথে নাফরমানি করা, আত্মহত্যা করা এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া।[১৯৮]

৩. শিরক অমার্জনীয় অপরাধ। মহান আল্লাহ বলেন-

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

নিশ্চয় আল্লাহ এ বিষয়কে ক্ষমা করেন না যে, তাঁর সঙ্গে কাউকে শরিক করা হবে। এর চেয়ে নিচের যে কোনও বিষয়ে যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন।[১৯৯]

৪. মুশরিকের জন্য জান্নাত চিরতরে হারাম। মহান আল্লাহ বলেন-

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরিক করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন। তার ঠিকানা জাহান্নাম। এমন জালেমের জন্য কোনও সাহায্যকারী নেই। *সূরা মায়িদা, আয়াত-৭২*

৫. মুশরিকের জন্য চিরদিনের জন্য জাহান্নাম। মহান আল্লাহ বলেন-

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ

[১৯৭] সূরা লুকমান, আয়াত-১৩

[১৯৮] সহীহ বুখারী, হাদীস-২৬৫৩

[১৯৯] সূরা নিসা, আয়াত-১৩

মুশরিকরা এ কাজের উপযুক্ত নয় যে, তারা আল্লাহর মসজিদসমূহ আবাদ করবে। যখন তারা নিজেরাই নিজেদের কুফরের সাক্ষী। তাদের সমস্ত কর্মই নিষ্ফল হয়ে গেছে এবং তারা চিরকাল জাহান্নামেই থাকবে। *সূরা তাওবা, আয়াত-১৭*

৬. শিরক অবশ্যই নিন্দাযোগ্য অপরাধ: মহান আল্লাহ বলেন-

لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا

আল্লাহর সঙ্গে অন্য কাউকে মাবূদ বানিও না। অন্যথায় তুমি নিন্দাযোগ্য ও নিঃসহায় হয়ে পড়বে। *সূরা বনি ইসরাঈল, আয়াত-২২*

৭. শিরক করলে শাস্তি পেতেই হবে: মহান আল্লাহ বলেন-

فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ

আল্লাহর সঙ্গে অন্য কাউকে মাবূদ মানবে না। তাহলে তুমি তাদের অন্তর্ভূক্ত হবে যারা শাস্তিপ্রাপ্ত। *সূরা শুয়ারা, আয়াত-২২*

শিরকের কয়েকটি ভয়ঙ্কর পরিণামের কথা কুরআন থেকে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও আরও অনেক ভয়ঙ্কর পরিণামের কথা উল্লেখ রয়েছে। আমরা শিরক থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করব। মহান আল্লাহ আমাদেরকে শিরক থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দান করেন।

YouTube Video Link:
https://youtu.be/06lfZIo7Fn8

ইসলামে তাবিজ কবজ এবং ঝাড়ফুক জায়েয নাকি শিরক? কুরআন-হাদীসের রেফারেন্স এবং সমকালীন ফাতওয়াসহ জানতে পাশের কোটটি স্ক্যান করুন। এছাড়া বইটিতে হাদীসের দুআ, আমলের সঠিক উচ্চরণ এবং কুরআন-হাদীসের রেফারেন্সসহ ইসলামিক ভিডিও, মাসআলা এবং সঠিক তথ্যের জন্য স্মার্টফোনের প্লেস্টোর থেকে QR Code নামে যে কোন একটি এপস ইনস্টল করে তা দিয়ে আমাদের QR Code স্ক্যান করলে সরাসরি চ্যানেলে গিয়ে সাবক্রাইব করে আপনার পছন্দের ভিডিও দেখুন। শেয়ার করে ইসলাম প্রচারে আপনিও শরীক হোন। জাযাকাল্লাহ।

পঞ্চম দাবি: ঈমান ও আমলকে বিদআত থেকে মুক্ত রাখা।

প্রিয় পাঠক! আমরা বিদআতের আলোচনাকে সাধারণ পাঠকের কথা বিবেচনা করে চারটি শিরোনামে উপস্থাপন করব।

১. বিদআত সম্পর্কিত কিছু প্রাসঙ্গিক কথা

আমাদের জীবন ক্ষণস্থায়ী। পূর্বের উম্মতের তুলনায় আমাদের হায়াত অনেক কম। তাদের মতো দীর্ঘ সময় ইবাদত করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। তাই সংক্ষিপ্ত সময়ের ইবাদত যেন হয় সুন্নাহর আলোকে। অসতর্ক বা অজ্ঞতার কারণে যদি এ সামান্য ইবাদত বাতিল হয়ে যায় তাহলে তো সেটা হবে সীমাহীন দুর্ভাগ্য। এখানে সকল পাঠককে মনে রাখতে হবে যে, বিদআতের আলোচনা একজন হাফিযকে কেন্দ্র করে লেখা হলেও বিদআত থেকে বেঁচে থাকা সবার জন্য আবশ্যক এবং কর্তব্য। বিশেষ করে আলিম-ওলামা এবং সকল দ্বীনদার মুমিনকে অবশ্যই বিদআত থেকে বেঁচে থাকতে হবে। কারণ অসাবধানতার সুযোগে শয়তান আমাদেরকে সওয়াবের প্রলোভন দেখিয়ে বিদআতের মধ্যে লাগিয়ে দিতে পারে। সে মানুষকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য সুক্ষ্ম ষড়যন্ত্রের জাল পেতেছে। মানুষকে নেক আমলের নামে বিদআত ও কুসংস্কারে নিমজ্জিত করছে। আমাদেরকে হিদায়াত থেকে দূরে সরিয়ে অন্ধকারে নিমজ্জিত করার জন্য সে তার পূর্ণ শক্তি ব্যয় করছে। মহান আল্লাহ বলেন-

ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ

(শয়তান বলল) আমি মানুষের কাছে আসব, তাদের সম্মুখ এবং পেছন দিক থেকে, ডান এবং বাম দিক থেকে। (তাদেরকে পথভ্রষ্ট করার জন্য।)[২০০]

আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করার জন্য শয়তানের সবচেয়ে বড় সিস্টেম হলো সে আমাদেরকে সওয়াবের প্রলোভন দিয়ে বিদআতের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেয়। মহান আল্লাহ তাঁর কুরআনে শয়তানের গভীর চক্রান্তের কথা আমাদেরকে সুন্দরভাবে বলে দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বিদআতের পরিচয় এবং ভয়াবহতা তাঁর উম্মতকে পুরোপুরিভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। আমাদের উচিত হল কুরআন-সুন্নাহর আলোকে বিদআতকে চেনা এবং এ থেকে নিজেকে রক্ষা করা এবং অপরকে রক্ষা করা। নিম্নে বিদআতের কয়েকটি মূলনীতি এবং বিদআত ও কুসংস্কারের আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে। আমরা কিছু বিদআতকে এর পরিচয়সহ তোলে ধরছি। কিছু বিদআতকে পরিচয় ব্যতীত শুধু বিদআতকে আলোচনা করছি। আমাদের বইটির কলেবর বৃদ্ধির আশাঙ্কা বিবেচনা করে এখানে উল্লেখযোগ্য দলিল-প্রমাণ উল্লেখ করা হয় নি। তবে পাঠকের চাহিদা

[২০০] সূরা আল-আরাফ, আয়াত-১৭

এবং সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে পরবর্তী সংস্করণে প্রত্যেকটি বিদআতকে দলিলসহ আলোচনা করার ইচ্ছা রয়েছে।

২. বিদআতের পরিচয় ও বিদআত পরিচয়ের কয়েকটি মূলনীতি

বিদআতের আভিধানিক অর্থ: 'কোনও কাজ নতুনভাবে সৃষ্টি করা'।
বিদআতের পারিভাষিক অর্থ: 'আলমুসতালাহাতুল ফিকহিয়্যা'তে বলা হয়েছে-

الْإِتْيَانُ بِشَيْئٍ جَدِيْدٍ وَإِدْخَالُهُ فِي الْأَحْكَامِ الْإِلٰهِيَّةِ مَعَ كَوْنِهِ لَيْسَ مِنْهَا

নতুন কোনো বিষয়কে আল্লাহর বিধানের অন্তর্ভুক্ত করা যা মূলত তার বিধান নয়।

ফাতহুল বারীতে বলা হয়েছে-

وَالْبِدْعَةُ أَصْلُهَا مَا حَالًا عَلٰى غَيْرِ مِثَالٍ سَابِقٍ وَتُطْلَقُ فِي الشَّرْعِ فِي مُقَابِلِ السُّنَّةِ فَتَكُوْنُ مَذْمُوْمَةً

বিদআতের মূল হলো, যার পূর্ব দৃষ্টান্ত নেই। পরিভাষায় বিদআত বলা হয়, যা সুন্নতের বিপরীতে ব্যবহৃত হয়। এটি অত্যন্ত নিন্দনীয়।[২০১]

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন-

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

যে ব্যক্তি আমাদের এই দ্বীনে নতুন করে কিছু আবিষ্কার করে তা বর্জনীয়।[২০২]

বিদআতের উল্লেখিত সংজ্ঞা এবং হাদীসের আলোকে বিদআতের কিছু মূলনীতি জানা যায়। সে সব মূলনীতিতে আমাদের সমাজ জীবনে প্রচলিত কিছু বিদআতের আলোচনা করার চেষ্টা করছি। এর আগে সকল মুমিনকে একথা সব সময় মনে রাখতে হবে, আমাদের প্রিয় নবী ﷺ যেই আমল যেভাবে এবং যখন যেই বাক্যের মাধ্যমে পালন করেছেন সেই আমল সেভাবে এবং ঐ সময়ে পালন করাই সব চেয়ে উত্তম এবং বরকতময়। কারণ আমি আমার জ্ঞানের উপর বা অন্য কারো জ্ঞানের উপর এতোবেশি আস্থাশীল হতে পারি না যত বেশি আস্থাশীল হতে পারি নবী ﷺ এবং তাঁর সাহাবীগণের উপর। এজন্য আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তাঁর সাহাবীগণের হুবহু অনুসরণ এবং অনুকরণকেই সবচেয়ে বেশি নিরাপদ মনে করি। একে পরকালীন নাজাতের পথ বলে বিশ্বাস করি। যারা এ মতের বিশ্বাসী এবং অনুসারী তাদের জন্য আমাদের এই সংক্ষিপ্ত আয়োজন এবং বিদআত সম্পর্কিত মূলনীতি।

[২০১] ফাতহুল বারী, ১৫/৪৩৬
[২০২] সহীহ বুখারী, হাদীস-২৬৯৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৪৫৮৯

প্রথম মূলনীতি: রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন যে আমল যেভাবে করেছেন এবং উম্মতকে করতে বলেছেন সেই সময়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পদ্ধতি মতো সেই আমল না করে ভিন্নভাবে করলে তা বিদআত হবে।

দ্বিতীয় মূলনীতি: রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাহাবায়ে কিরাম যে আমল করেন নি, সে আমলকে সওয়াবের নিয়তে করলেও তা বিদআত হবে।

তৃতীয় মূলনীতি: ইসলাম যে আমল একাকী করার অনুমোদন করেছে সে আমল জামাত বা দলবদ্ধভাবে করা বিদআত।

চতুর্থ মূলনীতি: ইসলাম যে আমলকে যে সময়ের মধ্যে করতে বলেছে সে আমলকে সে সময়ে পালন না করে ভিন্ন সময়ে পালন করাকে নিয়মে পরিণত করলে বিদআত হবে।

পঞ্চম মূলনীতি: ইসলাম যে আমলকে কোনও সময়ের সাথে নির্দিষ্ট করে নি, সে আমলকে কোনও সময়ের সাথে নির্দিষ্ট করে পালন করাও বিদআত।

৩. পরিবার ও সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন বিদআত

প্রিয় পাঠক! আমরা এখানে পরিবার ও সমাজে প্রচলিত কিছু বিদআতের আলোচনা করছি। এছাড়াও আরও অনেক বিদআত রয়েছে।

জন্ম-মৃত্যু এবং বিভিন্ন দিবস সম্পর্কিত বিদআত

১. শিশুর জন্মদিন বা 'বার্থডে' পালন করা। 'হ্যাপি বার্থডে' বলা।

২. কল্যাণের আশায় 'হ্যাপি নিউ ইয়ার' বলা।

৩. **কুলখানি প্রসঙ্গ:** আমাদের সমাজে একটা কুপ্রথা আছে যে, কেউ মারা গেলে আত্মীয়-স্বজন তিনদিন পর্যন্ত সওয়াব রেসানির জন্য অপেক্ষা করে তৃতীয় দিন সওয়াব রেসানির নামে কুলখানির আয়োজন করে থাকে। এসব আয়োজনে বড় বড় ডেক পাতিলে খানা পাকানো হয়। এতে মহল্লার ছোট-বড়, ধনী-গরিব প্রায় সকলকে নিমন্ত্রণ করা হয়। ধুমধামে পালিত হয় মৃত ব্যক্তির কুলখানি। এরপর মৃত্যুর দশম কিংবা বিশতম অথবা চল্লিশতম দিনে উদযাপিত হয় এ ধরনের কুলখানি। মৃত্যুবার্ষিকীর দিনেও চলে কুলখানি।

এ ব্যাপারে ইসলামের ভাষ্য হলো, মৃতকে উপলক্ষ্য করে এভাবে নির্ধারিত তারিখে অনুষ্ঠান করতেই হবে এমন বিশ্বাস রাখা বিদআত এবং গর্হিত কাজ। এভাবে ঈসালে সওয়াবের জন্য তিন দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করার কোন প্রয়োজন নেই। কেননা পরজগতে মৃত ব্যক্তির অতি তাড়াতাড়ি মাগফেরাত প্রয়োজন। তাহলে তিন দিন, দশ দিন কিংবা চল্লিশতম দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করার কোন মানে হয় না। ঈসালে সওয়াবের নামে কুলখানি পূজার অনুষ্ঠান করলে তাতে লোক দেখানো হয়। কেননা ভোজ অনুষ্ঠানের আয়োজকদেরকে যদি বলা হয় যে, তোমরা এই টাকা-পয়সা গোপনে গরিব মিসকিন এবং ফকিরদেরকে দান

করে ঈসালে সওয়াব করে নাও, তাহলে তারা এতে কখনো সম্মত হবে না। বরং তারা একথা বলবে, একটু ভোজ অনুষ্ঠান না করলে মানুষ আমাদেরকে ধিক্কার দেবে।' আর মানুষ আমাদেরকে বলতে থাকবে অমুকের বাবা মারা গেল কিন্তু তার সন্তানেরা তার জন্য ঈসালে সওয়াবও করে নি। সুতরাং বলা যায় এ ধরনের অনুষ্ঠান মানুষের নিন্দা, ধিক্কার থেকে বাঁচা এবং মানুষের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই করা হয়। আর এর নামই রিয়া বা লৌকিকতা। তাতে কারো দ্বিমত নেই। আর যে সমস্ত আমলের মধ্যে লৌকিকতা হয় তা দিয়ে আমলকারী নিজেই সওয়াব পায় না। বরং তার গুনাহ হয়। সুতরাং এমন আমল দ্বারা মৃতব্যক্তির রূহের মাগফিরাতের উদ্দেশ্যে ঈসালে সওয়াব করা কীভাবে সম্ভব?

টাকা-পয়সা দান করার মাধ্যমে যেমন ঈসালে সওয়াব করা যায়, তদ্রুপ নফল নামাজ, রোযা, যিকির এবং ইস্তিগফার দ্বারাও ইসালে সওয়াব করা যায়। তবে কোনো অবস্থাতেই যেন মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্য না হয় সেদিকে ভালোভাবে লক্ষ্য রাখা উচিত। এসব কাজ একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই করতে হবে। তাহলেই মৃত ব্যক্তির উপকার হবে বলে আশা করা যায়। এছাড়া বর্তমানে মানুষের উদ্ভাবিত যে সমস্ত কুপ্রথা রয়েছে তা পরিহার করে চলতে হবে।

৪. এগারো শরীফ: জুমাদাল আখিরাহ। আরবী বর্ষপঞ্জির ষষ্ঠ মাস। এ মাসের এগারো তারিখে বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী রাহি. এর উপর ঈসালে সওয়াবের নামে অনেকে ভোজ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। আবার অনেকে প্রতি আরবী মাসের এগারো তারিখেও এধরনের ভোজ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। এটা সম্পূর্ণ বিদআত।

৫. আতশবাজী: আমাদের দেশে বিভিন্ন দিবসে আতশবাজী করা হয়ে থাকে। অনেকে আতশবাজীকে নেক আমল মনে করে থাকে। আতশবাজীতে সওয়াব হবে তো দূরের কথা এতে অনেক গুনাহ হবে। কারণ-

ক. আতশবাজীতে অর্থের অপচয় হয়। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে 'অপচয়কারী শয়তানের ভাই'।[২০৩]

খ. আতশবাজীতে অহেতুকভাবে আমাদের জীবনের মূল্যবান সময় নষ্ট হয়। সময়ের অপব্যয় অবশ্যই গুনাহের কাজ। অপব্যয় করা যে শয়তানে কাজ সেটা তো আর নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই।

গ. আতশবাজীর কারণে সমাজের সুস্থ-অসুস্থ সকল মানুষ ভোগান্তির স্বীকার হন। কারণ আতশবাজীর প্রচন্ড আওয়াজে সুস্থ মানুষ উদ্বিগ্ন থাকে। এছাড়া

২০৩ সূরা রূম, আয়াত-৪১

অসুস্থ মানুষ মানষিকভাবে চরম কষ্ট পেয়ে থাকে। আর আমরা একথাও জানি, যে কাজের দ্বারা অন্যরা কষ্ট পায় তা ইসলামে অনুমোদন নেই।

ঘ. আতশবাজী ইবাদতে বিঘ্নতা সৃষ্টি করে। যে সব দ্বীনদার মানুষ এ রাতে নিরিবিলি ইবাদত করতে চায়, তারা নিরিবিলি ইবাদত করতে পারে না। মনোযোগ সহকারে প্রভুর প্রেমে সাড়া দিতে পারে না। সুতরাং আতশবাজী সমাজ, দেশ এবং ইসলামের ক্ষতি করে। এসব ক্ষতি থেকে নিজেকে বাঁচানো এবং অন্যকে বাঁচানো আমাদেরই দায়িত্ব।

৬. আলোকসজ্জা: আমাদের বাংলাদেশের কোনো কোনো এলাকাতে মধ্য শাবানের রাত উপলক্ষ্যে মসজিদ, কবরস্থান ও বাসা-বাড়ী, দোকানপাট আলোকসজ্জা করা হয়ে থাকে। এটা মোটেও ঠিক না। কারণ, এর দ্বারা যেমনভাবে অর্থের অপচয় হয়, তেমনিভাবে বিজাতীয়দের কালচারের অনুসরণ হয়। এ বিষয়ে সুপ্রসিদ্ধ হাদীসের কিতাব মিশকাত শরীফের ভাষ্যকার আল্লামা মোল্লা আলী আল-ক্বারী রাহি. লিখেছেন 'আলোকসজ্জার প্রচলনটি প্রথম বারামিকা জাতি থেকে শুরু হয়েছে। তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পরও খৃষ্ট ধর্মের আলোকসজ্জার প্রথা বাদ দেয় নি।'[২০৪]

এখান থেকে একথা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, খৃষ্টানরা সরাসরি আগুনের পূজা করে। আর তারা মুসলমানদেরকে আলোকসজ্জার নামে পরোক্ষভাবে আগুনের পূজায় লিপ্ত করেছে। যারা আগুনের পূজা করে তারা যেমন জাহান্নাম থেকে বাঁচতে পারবে না। তেমনিভাবে যারা আলোকসজ্জার নামে পরোক্ষভাবে আগুনের পূজা করে তারাও জাহান্নাম থেকে সহজে বাচাঁর কথা নয়। সুতরাং মসজিদ, কবরস্থান, দোকানপাট এবং বাসাবাড়ীতে আলোকসজ্জা করার নিগূঢ় রহস্য জানার পর আমাদের জন্য উচিত হচ্ছে এ সব বিদআত এবং কুসংস্কার থেকে নিজেরা বেঁচে থাকা এবং আমাদের মুসলমান ভাই-বোনদেরকে বাঁচানোর জন্য প্রচেষ্টা করা।

৭. হালুয়া-রুটি ও মিষ্টি বিতরণ: আমাদের সমাজে কিছু মুসলমান এ কথা মনে করে যে, হালুয়া-রুটি ছাড়া শবেবরাত পালন করা হয় না। আমাদের দেশে কিছু অজ্ঞ, মুর্খ লোকেরা একথাও বলে থাকে যে উহুদ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর দাঁত ভেঙ্গে যাওয়ার পর তিনি হালুয়া খেয়েছিলেন। এ জন্য শবেবরাতে হালুয়া বানিয়ে খেতে হয়। এই তথ্যটি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নামে চরম মিথ্যা কথা। কারণ, উহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল শাওয়াল মাসে। আর শবেবরাত হলো শাবান মাসে। এ সব মিথ্যা এবং বিদআত বাদ দিয়ে সুন্নাহর আলোকে জীবন

২০৪ মিরকাতুল মাফাতীহ, ৩/১৯৮

সাজাতে হবে। মনে রাখতে হবে এ বরকতময় রজনীতে হালুয়া-রুটি ও মিষ্টি বিতরণের কাজে লাগিয়ে মুসলমানদেরকে ইবাদত থেকে দূরে রাখাই হলো শয়তানের রহস্যজনক ষড়যন্ত্র। শবেবরাতের হালুয়া সম্পর্কে যেহেতু কুরআন হাদীসে এবং ফিকহের কিতাবে কোন দলিল-প্রমাণ নেই, তাই শবেবরাত উপলক্ষে হালুয়া তৈরি করা এবং বিতরণ করা বিদআত হবে।

৮. সন্ধ্যার পর গোসল অত্যাবশ্যক মনে করা:

আমাদের সমাজে ব্যাপকভাবে প্রচলিত আছে শবেবরাতে সন্ধ্যার পর গোসল করার কথাটি। অথচ মধ্য শাবানের রাতে সন্ধ্যার পর ইবাদতের নিয়তে গোসল করা বিদআত। অনেকে মনে করে 'যে ব্যক্তি শবেবরাতে সন্ধ্যার পর ইবাদতের নিয়তে গোসল করে তাকে গোসলের পানির প্রতিটা ফোঁটার বিনিময়ে সাতাশ রাকাত নফল নামাযের সওয়াব দেওয়া হয়।' এটি একটি ভিত্তিহীন কথা। আরও আশ্চর্যের বিষয় হলো কোনো কোনো ছোট-ছোট পুস্তকে গোসলের ফযিলত উল্লেখ করা থাকে। লেখা থাকে 'যে ব্যক্তি শবেবরাতে এবাদতের উদ্দেশ্যে সন্ধ্যায় গোসল করবে, তার গোসলের পানির প্রতিটি ফোটা পানির পরিবর্তে তার আমল নামায় ৭০০ (সাতশত) রাকাত নফল নামাযের সওয়াব লিখে দেওয়া হইবে। গোসল করিয়া দুই রাকাত তাহিয়্যাতুল অজুর নামায পড়িবে।' এমন কথা কুরআন-হাদীসের কোথাও উল্লেখ নেই। এটিও একটি ভিত্তিহীন ও মনগড়া কথা। তবে কেউ যদি শারীরিক পবিত্রতার সন্দেহ করে, তাহলে গোসল করলে কোন অসুবিধা নেই। এছাড়া গোসল করাকে অত্যাবশ্যক কিংবা ইবাদতের অংশ মনে করলে গুনাহ হবে।

৯. মিলাদ ও মিলাদ মাহফিলে কিয়াম: মিলাদ অর্থ জন্মদিবস। কিয়াম অর্থ দাঁড়ানো। তবে এখানে কিয়াম অর্থ সম্মানার্থে দাঁড়ানো। শরীয়তের ভাষ্যকার মহানবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ কারো সম্মানার্থে কিয়াম করা পছন্দ করতেন না। হাদীসে এসেছে-

عن أَنَسٍ قَالَ لَمْ يَكُنْ شَخْصٌ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَكَانُوا إِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُومُوا لِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ كَرَاهِيَتِهِ لِذَلِكَ

হযরত আনাস রাদি. বলেন কোন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে সাহাবায়ে কিরামের চেয়ে অধিক ভালোবাসেন না। তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আসতে দেখলে কখনো দাঁড়াতেন না। কেননা তারা জানতেন যে রাসূলুল্লাহ ﷺ এটাকে অপছন্দ করেন।[২০৫]

[২০৫] সুনানুত তিরমিযী, হাদীস-২৭৫৪ ইমাম তিরমিযী রাহি. এই হাদীসটিকে বিশুদ্ধ বলেছেন।

সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জন্মোৎসব পালনের জন্য কিংবা আল্লাহর কাছে সওয়াব ও বরকত লাভের প্রত্যাশায় অথবা যে কোনো কাজে আল্লাহর সাহায্য লাভের উদ্দেশ্যে মিলাদ পড়া বিদআত।

১০. টাকার বিনিময়ে মৃত ব্যক্তির জন্য কুরআন খতম করা: নিন্দনীয় বিদআত। হাদীসে এসেছে-

مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَلْيَسْأَلِ اللهَ بِهِ فَإِنَّهُ سَيَجِيءُ أَقْوَامٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ يَسْأَلُونَ بِهِ النَّاسَ

যে কুরআন পড়েছে সে যেন শুধু আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে। অচিরেই এমন এক সম্প্রদায় আসবে যারা কুরআন পড়ে মানুষের কাছে প্রার্থনা করবে।[২০৬]

এজন্য ফাতওয়ায়ে শামীতে বলা হয়েছে-

إِنَّ الْقُرْآنَ بِالْأُجْرَةِ لَا يَسْتَحِقُّ الثَّوَابَ لَا لِلْمَيِّتِ وَلَا لِلْقَارِئِ.

আর্থিক বিনিময়ে কুরআন পড়লে কোন সওয়াব হবে না। মৃত ব্যক্তি এবং কুরআন পাঠকেরও কোনও সওয়াব হবে না।[২০৭]

ওযু, আযান ও নামায এবং রোযা ও হজ্জ সম্পর্কিত বিদআত

১. ওযুর শুরুতে বিসমিল্লাহ অথবা বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম ব্যতীত অন্য কোনো দুআ পড়া।

২. ওযূ শরু করার পর অন্যান্য অঙ্গ ধৌত করার সময় বিভিন্ন দুআ পড়া।

৩. আযান শোনে চোখে আঙ্গুল বুলিয়ে চুম্বন করা।

৪. আযানের আগে দুরুদ ও সালাম দেওয়া।

৫. নফল নামাযের জন্য আযান দেওয়া। পাঁচ ওয়াক্ত নামায ও জুমা ছাড়া অন্যান্য নামাযের জন্য আযান দেওয়া বিদ'আত। যেমন, জানাযার নামায ও দুই ঈদের নামাযের জন্য আযান দেওয়া। কেননা নফল নামাযের জন্য আযান দেওয়া শরী'আত সম্মত নয়। আযান শুধু ফরয নামাযের জন্যই নির্দিষ্ট।

৬. বিপদাপদ ও ঝড়-তুফান এলে ঘরে বা ছাদে আযান দেওয়া বিদআত। কেননা বিপদাপদে কী পাঠ করা উচিৎ বা কী আমল করা উচিৎ তা হাদীসে বলা হয়েছে। কিন্তু এসব সময়ে আযানের কথা কোনও হাদীসে নেই।

৭. ফরয নামাযের আযানের আগে মাইকে দুরূদ পাঠ। কেননা আযানের উদ্দেশ্য হল লোকদেরকে জামাআতে নামায আদায়ের প্রতি আহ্বান করা, মাইকে দরূদ পাঠের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই।

৮. ঈদের নামাযের পূর্বে খুতবা পড়া।

৯. শবে বরাত, সালাতুত তাসবীহ, ইশরাক চাশত ইত্যাদি নামায জামাতের

[২০৬] সুনানুত তিরমিযী, হাদীস-২৯১৭

[২০৭] ফাতওয়া শামী, ৬/৩৪০

সাথে আদায় করা।

১০. রমযানের শেষ জুমাকে জুমাতুল বিদা বলা ও পালন করা।

১১. রোযার জন্য মুখে নিয়ত করাকে জরুরী মনে করা।

১২. হজ্বের সময় জামারায় বড় বড় পাথর নিক্ষেপ করা, এ কারণে যে, এগুলো ছোট পাথরের চেয়ে পিলারে জোরে আঘাত হানবে এবং এটা এ উদ্দেশ্যে যে, শয়তান এতে বেশি ব্যাথা পাবে। এটা বিদ'আত। এজন্য যে, শরী'আতের নির্দেশ হলো ছোট পাথর নিক্ষেপ করা।

১৩. বেশি সওয়াবের আশায় বড় বড় কংকর নিক্ষেপ করা।

১৪. বেশি সওয়াবের আশায় অতিরিক্ত কংকর নিক্ষেপ করা।

১৫. জামারাতে জুতা নিক্ষেপ করা।

১৬. মক্কায় বিভিন্ন পাহাড়ের মধ্যে বরকতের বিশ্বাস করা।

জানাযা ও কবর সম্পর্কিত বিদআত

১. জানাযাকে সামনে রেখে লোকটি কেমন ছিল, ভালো ছিল বলা বিদআত।

২. জানাযার পর হাত তুলে সম্মিলিতভাবে দুআ করা।

৩. কবর পাকা করা।

৪. কবরের দেয়ালে খোদাই করে মৃত ব্যক্তির নাম ও বিভিন্ন দুআ লিখে রাখা।

৫. মাজার থেকে বের হওয়ার সময় পিঠ করে বের হওয়াকে গুনাহ মনে করা।

৬. কবর বা মাযারের দিকে মুখ করে দুআ করা।

৭. পীর বা অন্য কারো কবর বা মাযারের মাটি গায়ে লাগানো।

বিয়ে ও অন্যান্য বিষয়ে প্রচলিত বিদআত

১. নির্দিষ্ট কোনও মাসকে বিবাহের ক্ষেত্রে অশুভ মনে করা।

২. বিয়ের সিদ্ধান্ত বাতিল হওয়ার পর প্রদত্ত হাদিয়া ফেরত লওয়া।

৩. বিয়ের জন্য হাতে রঙ্গিন বা অন্য কোনও সুতা পরিধান করা।

৪. দর কষাকষি করে বরযাত্রী নিয়ে মেয়ের বাড়িতে গিয়ে খাওয়া।

৫. বিয়ের দিনে মায়ের হাতে দুধ ভাত খাওয়া।

৬. ওকীল বাবা কর্তৃক বউকে কিছু দিয়ে বাবা হওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করা।

৭. ওকীল বাবা বানানো এবং ওকীল বাবা ডাকা ও সম্মান করা।

৮. বিয়ের মোহরের মধ্যে বিজোড় টাকা প্রদানের বিশ্বাস করা।

৯. সাক্ষীর জন্য ছেলে ও মেয়ের পক্ষ থেকে হওয়াকে জরুরি মনে করা।

১০. বিয়ে বাড়িতে গান ও আতশবাজির আয়োজন করা।

১১. সালামের পর বুকে হাত লাগানো।

১২. গুড মর্নিং বা গুড আফটারনুন বলা।

১৩. কদমবুসী বা পা ধরে সালাম করা।

১৪. ইয়া মুহাম্মাদ, ইয়া আলী বলে যিকির করা।

১৫. কোনো ওলী-পীরের নাম উচ্চারণ করে যিকির করা।

১৬. হেলে দুলে যিকির করা।

১৭. হা হু অথবা কুরআন-হাদীসে নেই এমন শব্দ দিয়ে যিকির করা।

১৮. 'হানিমুন' বা ম্যারিজডে কিংবা বিবাহ বার্ষিকী পালন করা।

১৯. নবজাতককে চল্লিশের পূর্বে ঘর থেকে বের করা নিষেধ মনে করা।

২০. শিশুর কপালে কালির টিঁপ দেওয়া।

২১. শিশুকে রোগ থেকে হিফযতের জন্য বিভিন্ন সংখ্যা লিখিত তাবিয ব্যবহার করা। এটি চরম অন্যায় এবং গর্হিত কাজ।

৪. বিদআতের পরিণামঃ

বিদআত একটি ভয়াবহ অপরাধ। বিদআত আসমানি গযবকে ডেকে আনে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুপারিশ থেকে বঞ্চিত করে। কিছু ভয়াবহতার কথা আলোচনা করছি।

১. বিদআতি ও বিদআতিকে আশ্রয়দাতার উপর মহান আল্লাহর লানত।

২. বিদআতি ও বিদআতিকে আশ্রয়দাতার উপর ফিরিশতার লানত।

৩. বিদআতি ও বিদআতিকে আশ্রয়দাতার উপর সকল মানুষের লানত।

৪. বিদআতির ফরয ও নফল কোনও আমল কবুল হবে নাঃ হাদীসে এসেছে-

فَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ

হযরত আলী রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ . . . যে কেউ দ্বীনের ব্যাপারে বিদআত চালু করবে কিংবা কোনও বিদআতিকে আশ্রয় দিবে তার উপর মহান আল্লাহ, ফিরিশতা এবং সকল মানুষের লানত। তার কোনও ফরয কিংবা নফল আমল কবুল হবে না।[২০৮]

৫. রাসূলুল্লাহ বিদআতিকে হাওযে কাওসার থেকে সরিয়ে দিবেনঃহাদীসে এসেছে-

أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ فَمَنْ وَرَدَهُ شَرِبَ مِنْهُ وَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَهُ أَبَدًا لَيَرِدُ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ قَالَ إِنَّهُمْ مِنِّي فَيُقَالُ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا بَدَّلُوا بَعْدَكَ فَأَقُولُ سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ بَدَّلَ بَعْدِي

আমি হাউযের কাছে তোমাদের আগে উপস্থিত থাকব। যে সেখানে উপস্থিত হবে সে সেখান থেকে পান করার সুযোগ পাবে। আর যে একবার সে হাউয থেকে

[২০৮] সহীহ বুখারী, হাদীস-৩১৭৯

পান করবে সে কখনো পিপাসিত হবে না। অবশ্যই এমন কিছু দল আমার কাছে উপস্থিত হবে যাদেরকে আমি আমার উম্মত বলে চিনতে পারব এবং তারা আমাকে চিনতে পারবে। কিন্তু এর পরই তাদের ও আমার মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে দেওয়া হবে। আমি বলব: তারা আমার উম্মত। তখন বলা হবে, নিশ্চয় আপনি জানেন না যে, আপনার পরে তারা ধর্মের মধ্যে কী পরিবর্তন করেছিল। এ কথা শুনে আমি বলব: যারা আমার পরে পরিবর্তন করেছে, তারা দূর হোক, দূর হোক।[২০৯]

৬. বিদআতিরা পথভ্রষ্ট

৭. বিদআতির ঠিকানা জাহান্নাম: হাদীসে এসেছে-

وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ .....

সাবধান! (ধর্মে) নতুন আবিষ্কার সম্পর্কে! কেননা প্রতিটি নতুন আবিষ্কার হলো বিদআত। প্রতিটি বিদআত পথভ্রষ্টতা। প্রতিটি পথভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম।[২১০]

৮. বিদআত চালু করলে চিরদিনের জন্য সুন্নত বিদায় হয়: হাদীসে এসেছে-

مَا ابْتَدَعَ قَوْمٌ بِدْعَةً فِي دِينِهِمْ إِلاَّ نَزَعَ اللَّهُ مِنْ سُنَّتِهِمْ مِثْلَهَا ثُمَّ لاَ يُعِيدُهَا إِلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

জনগণ তাদের দ্বীনের মধ্যে যে বিদআতই চালু করে আল্লাহ তাদের নিকট থেকে অনুরূপ একটি সুন্নত তুলে নেন। তারপর কিয়ামত পর্যন্ত তা আর ফিরিয়ে আনেন না।[২১১]

৯. বিদআত চালু করলে সুন্নত মিটে যায়: হাদীসে এসেছে-

مَا أَتَى عَلَى النَّاسِ عَامٌ إِلَّا أَحْدَثُوا فِيهِ بِدْعَةً وَأَمَاتُوا فِيهِ سُنَّةً حَتَّى تَحْيَى الْبِدَعُ وَتَمُوتُ السُّنَنُ

লোকেরা যখনই একটি বিদআত শুরু করেছে, তখনই তারা একটি সুন্নতের মৃত্যু ঘটিয়েছে। এভাবেই বিদআত জেগে উঠেছে এবং সুন্নাত মিটে গেছে।[২১২]

১০. বিদআতির তাওবা কবুল করা হয় না: হাদীসে এসেছে-

اِنَّ اللهَ حَجَبَ التَّوْبَةَ عَنْ صَاحِبِ كُلِّ بِدْعَةٍ

অবশ্যই মহান আল্লাহ কোনও বিদআতির তাওবা কবুল করেন না।[২১৩]

[২০৯] সহীহ বুখারী, হা.-৭০৫০; সহীহ মুসলিম, হা.-৬১১৪

[২১০] সুনানু আবু দাউদ, হাদীস-৪৬০৯; সহীহ ইবনু খুযাইমা, হাদীস-১৭৮৫

[২১১] সুনানুদ দারামী, হাদীস-৯৮

[২১২] মুয়জামুত তাবরানী, হাদীস-১০৬১০; বর্ননাকারীগণ সবাই নির্ভরযোগ্য

[২১৩] আল-মুয়জামুল আওসাত, হাদীস-৪২০২; মাজমাউয যাওয়াইদ, হাদীস-১৭৪৫৭

১১. বিদআতিকে সম্মান করা মানে ইসলাম ধ্বংসের পথ সুগম করা: হাদীসে এসেছে-

مَنْ وَقَّرَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ فَقَدْ أَعَانَ عَلَى هَدْمِ الإِسْلاَمِ

যে কোনও বিদআতিকে সম্মান করল সে ইসলাম ধ্বংসে সাহায্য করল।[২১৪]

আজ থেকে আমরা সকল বিদআত বর্জন করে কুরআন-হাদীসের আলোকে নিজেদের ঈমান-আমলের জন্য মেহনত করবো। তবেই ঈমান ও আমলের সঠিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হবে। মহান আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক দান করেন। আমীন! ছুম্মা আমীন!!

ষষ্ঠ দাবি: সকল কবীরা গুনাহ থেকে নিজেকে রক্ষা করা

আমরা এখানে ৭০ টি কবীরা গুনাহর আলোচনা করেছি। তবে কবীরা গুনাহ শুধু ৭০টি নয়। এর সংখ্যা অনেক। হাদীস শাস্ত্রের অন্যতম ব্যক্তিত্ব আল্লামা শামসুদ্দীন আয-যাহাবী রাহি. তাঁর 'কিতাবুল কাবায়ির' নামক কিতাবে ৭০ টি কবীরা গুনাহর কথা আলোচনা করেছেন। আমরা তাঁর 'কিতাবুল কাবায়ির'কে সামনে রেখেই কবীরা গুনাহর কথা আলোচনা করেছি। তবে বর্তমানে আমাদের দেশে সাধারণত যে গুনাহ হওয়ার আশঙ্কা নেই সে গুলো আলোচনা করি নি। যেমন- রেশমি পোশাক পরিধান করা, গোলাম পালিয়ে যাওয়া ইত্যাদি। আমরা এগুলোর পরিবর্তে কুরআন-হাদীস থেকে অন্যান্য কবীরা গুনাহর কথা আলোচনা করেছি। সেগুলো হচ্ছে যথাক্রমে- ৬, ৩৬, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, এবং ৬৯ নং। মহান আল্লাহ আমাদেরকে উল্লেখিত কবীরা গুনাহ এবং অন্যান্য সকল কবীরা ও সগীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দান করুন। আমীন!

আকিদা-বিশ্বাস ও ইবাদত সম্পর্কিত কবীরা গুনাহর বিবরণ

১. শিরক করা: 'ঈমানকে শিরক থেকে মুক্ত রাখা' শিরোনামে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

২. যাদু করা: 'ঈমান ক্ষতিকারক বিশ্বাস ও কাজ না করা' শিরোনামে পঞ্চম কারণের মধ্যে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

৩. গণক বা জ্যোতিষীর কথা বিশ্বাস করা: 'ঈমানকে শিরক থেকে মুক্ত রাখা' শিরোনামে শিরক ফিল উলূহিয়্যা বা ইবাদাহ শিরোনামে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৪. যে পিতা নয় তাকে পিতা বলে পরিচয় দেয়া: হাদীসে এসেছে-

مَنْ اِدَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيْهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيْهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ

[২১৪] শুয়াবুল ঈমান, হাদীস-৯৪৬৪; ইমাম তাবরানী এটিকে আবদুল্লাহ ইবনে বুসর থেকে বর্ণনা করেছেন, তবে ইবনুল জাওযী এটিকে মওযু বলেছেন।

যে ব্যক্তি অন্যকে নিজের পিতা বলে দাবি করে অথচ সে জানে যে ঐ ব্যক্তি তার প্রকৃত পিতা নয়, তার জন্য জান্নাত হারাম।[২১৫]

ইসলামের দৃষ্টিতে পিতা সংস্কৃতি: একজন মুমিনের পিতা কত জন? এ বিষয়ে ইসলামের বক্তব্য অত্যন্ত পরিষ্কার। এক জন মুমিনের পিতা তিন জন। ১. আদি পিতা, হযরত আদম আ.। ২. জাতির পিতা, হযরত ইবরাহীম আ.। ৩. জন্মদাতা পিতা, নিজ পিতা। তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে রুহানি পিতা বলা হয়। সূরা আহযাবের ৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে 'তাঁর (মুহাম্মাদ ﷺ-এর) স্ত্রীগণ তোমাদের মাতা।' সুতারাং তিনি মুমিনের পিতা হবেন। কিন্তু সূরা আহযাবের ৪০ নং আয়াতে বলা হয়েছে 'মুহাম্মাদ ﷺ তোমাদের কারো পিতা নন।' এ জন্য কোনো সাহাবী তাঁকে পিতা বলে কোনো দিন সম্বোধন করেন নি। তাহলে এ কথা জানা গেল যে মুহাম্মাদ ﷺ কারো পিতা নন। তবে তাঁর স্ত্রীদেরকে মাতা বলা হয়েছে কেন? কারণ হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রীগণকে অন্য কেউ বিয়ে করতে পারবে না। তাঁর স্ত্রীগণকে বিয়ে করা সকল উম্মতের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

শশুরকে পিতা বলে সম্বোধন করা হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ স্ত্রীর পিতাকে পিতা, আব্বা বলে সম্বোধন করতে বলছেন। এতে শশুরকে পিতার মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু শশুর পিতার সমতুল্য হলেও আসলে তিনি পিতা নন। কারণ, শশুরের যে মেয়েকে বিয়ে করার কারণে তিনি পিতার মর্যাদা পেয়ে থাকেন সেই মেয়ে যদি স্ত্রীর মর্যাদা থেকে বের হয়ে যায় তাহলে শশুরকে আর পিতা বলে সম্বোধন করা যায় না। তাকে পিতার মর্যাদা দেওয়া যায় না। যেমন- কারো স্ত্রী মৃত্যু বরণ করলে কিংবা স্ত্রীকে পূর্ণ তালাক দেওয়া হলে স্ত্রীর পিতাকে তখন আর পিতা বলে সম্বোধন করা যায় না। তবে যতদিন শশুরের মেয়ে স্ত্রী হিসেবে থাকবে ততদিন তিনি পিতার মর্যাদা পাবেন। তাহলে এতোক্ষণে বুঝা গেল যে, পিতা শুধু তিন জনই। ১. আদি পিতা, যেমন- হযরত আদম আ.। ২. জাতির পিতা, যেমন- হযরত ইবরাহীম আ.। ৩. জন্মদাতা পিতা, যেমন- নিজ পিতা। এর বাইরে আর কেউ পিতা হতে পারে না। যেমন-

ক. ওকিল বাবা: বিয়ের মধ্যে যিনি বিয়ের কাজে মধ্যস্থতা করেন তাকে ওকিল বাবা বলা হয় এবং তাকে বাবা বলে সম্বোধন করা হয়। এটা কবীরা গুনাহ।

খ. পীর বাবা: আমাদের এশিয়া মহাদেশে বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে ধর্মীয় ব্যক্তিকে পীর বাবা বলে সম্বোধন করা হয়। যথা, খাজা বাবা, শের আলী বাবা, শাহ আলী

---

[২১৫] সহীহ বুখারী, হাদীস-৬৭৬৬

বাবা, শাহ জালাল বাবা, শাহ পরান বাবা, আট রশি বাবা, ফরিদ পুরী বাবা, অমুক বাবা, তমুক বাবা ইত্যাদি। এভাবে ইসলামের নির্দেশিত পিতা ছাড়া অন্যদেরকে বাবা বলা এবং বাবা বলে সম্বোধন করা কবীরা গুনাহ।

গ. হযরত ইবরাহীম আ.। ব্যতীত অন্য কাউকে জাতির বাবা বলা: আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ইন্ডিয়াতে জাতির পিতা বলার সংস্কৃতি চালু আছে। এই সংস্কৃতি পাকিস্থানেও চালু আছে বলে লোক মুখে শোনা যায়। আর কোন কোন দেশে এই কুপ্রথা চালু আছে তা পাঠকবর্গ ভালো করেই জানেন। কোনো মুমিন ব্যক্তি ইসলামের নির্দেশিত পিতার পরিচয় জানার পর নির্ধারিত পিতা ছাড়া অন্য কাউকে পিতা বলে সম্বোধন করতে পারেন না। কেননা, নির্ধারিত পিতা ছাড়া অন্য কাউকে পিতা বলে সম্বোধন করা কবীরা গুনাহ। মহান আল্লাহ আমাদেরকে সকল গুনাহ থেকে রক্ষা করুন। আমীন!

৫. নামায পরিত্যাগ করা: মহান আল্লাহ বলেন-

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ • الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ

অতএব দুর্ভোগ সেসব নামাযির, যারা তাদের নামায সম্বন্ধে বে-খবর।[২১৬]

৬. বিতিরের নামায আদায় না করা: হাদীসে এসেছে-

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

হযরত আবু আইউব আনসারী রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: প্রত্যেক মুসলমানের উপর সালাতুল বিতর আদায় করা অত্যাবশ্যক।[২১৭]

হযরত বুরাইদা তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন-

الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا

আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, বিতর অত্যাবশ্যক (ওয়াজিব)। যে ব্যক্তি বিতর আদায় করবে না সে আমার দলভুক্ত নয়। বিতর অত্যাবশ্যক। যে ব্যক্তি বিতর আদায় করবে না সে আমার দলভুক্ত নয়। বিতর অত্যাবশ্যক। যে ব্যক্তি বিতর আদায় করবে না সে আমার দলভুক্ত নয়। [২১৮]

৭. অকারণে জুমার নামায না পড়া: হাদীসে এসেছে-

مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ

---

[২১৬] সূরা মাউন, আয়াত-৪.৫

[২১৭] সুনানু আবু দাউদ, হাদীস-১৪২৪

[২১৮] সুনানু আবু দাউদ, হাদীস-১৪২১

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তি অবহেলা করে তিন জুমআ পরিত্যাগ করে মহান আল্লাহ তার অন্তরে সিল মেরে দেন।[২১৯]

৮. অকারণে জামাত ছেড়ে একা একা নামায পড়া: হাদীসে এসেছে-

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ الْمُؤَذِّنَ فَيُقِيمَ ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا يَؤُمُّ النَّاسَ ثُمَّ آخُذَ شُعَلًا مِنْ نَارٍ فَأُحَرِّقَ عَلَى مَنْ لَا يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ بَعْدُ

'আমি ইচ্ছা করেছিলাম যে, মুয়াজ্জিনকে ইকামত দিতে বলি, আর অন্য কাউকে ইমামত করতে বলি এবং আমি নিজে আগুনের একটি মশাল নিয়ে যারা নামাযে আসে নি তাদের উপর আগুন ধরিয়ে দেই।[২২০]

৯. শরীয়ত সম্মত কারণ ছাড়া রমযানের রোযা ভঙ্গ করা: মহান আল্লাহ বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

হে মুমিনগণ! তোমাদের উপর রোজা ফরয করা হয়েছে, যেরূপ ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর। যেন তোমরা মুত্তাকি হতে পার।[২২১]

হাদীসে এসেছে-

مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَلَا مَرَضٍ لَمْ يَقْضِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ وَإِنْ صَامَهُ

যে ব্যক্তি শরীয়তসম্মত কারণ ছাড়া বা অসুস্থতা ছাড়া রমযানের একটি রোযা ভঙ্গ করে সে যদি যুগযুগ ধরে রোযা রাখে তাহলেও এর প্রতিকার হবে না।[২২২]

১০. যাকাত আদায় না করা: মহান আল্লাহ বলেন-

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

আর যারা স্বর্ণ ও রূপা জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় না করে তাহলে তাদেরকে কঠোর আযাবের সুসংবাদ শুনিয়ে দিন।[২২৩]

১১. হজ্ব করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ্ব না করা: মহান আল্লাহ বলেন-

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

আর এ ঘরের হজ্ব করা হলো মানুষের উপর আল্লাহর প্রাপ্য; যে লোকের সামর্থ রয়েছে এ পর্যন্ত পৌঁছার।[২২৪]

---

[২১৯] সুনানুত তিরমিযী, হাদীস-৫০০

[২২০] সহীহ বুখারী, হাদীস-৬৫৭; হাদীসটি বুখারীতে কয়েকটি স্থানে বর্ণিত হয়েছে।

[২২১] সূরা বাকারা, আয়াত-১৮৩

[২২২] সহীহ বুখারী, হাদীস-১৯৩৪; সুনানু আবু দাউদ, হাদীস-২৩৯৮

[২২৩] সূরা তাওবা, আয়াত-৩৪

[২২৪] সূরা আলে ইমরান, আয়াত-৯৭

হাদীসে এসেছে-

مَنْ مَلَكَ زَادًا أَوْ رَاحِلَةً تُبَلِّغُهُ إِلَى بَيْتِ اللهِ تَعَالَى وَلَمْ يَحُجَّ فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا

যে ব্যক্তি হজ্বের সামর্থ অথবা বাইতুল্লায় যাবার পাথেয় পাবার পরও হজ্ব করল না, সে ইহুদি কিংবা খৃস্টান হয়ে মৃত্যুবরণ করল কিনা তা বলা যায় না।[২২৫]

১২. ইবাদতে লৌকিকতা: 'ঈমানকে শিরক থেকে মুক্ত রাখা' শিরোনামে শিরক ফিল উলূহিয়্যা বা ইবাদাহ' শিরোনামে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

১৩. আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে পশু জবেহ করা: মহান আল্লাহ বলেন-

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ

যেসব জন্তুর উপর আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয় না, সেগুলো থেকে ভক্ষণ করো না; নিশ্চয় এটা গুনাহ।[২২৬]

মানুষের অধিকার সম্পর্কিত কবীরা গুনাহর বিবরণ

১৪. অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা কবীরা গুনাহ: মহান আল্লাহ বলেন-

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ

যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমকে জেনেশুনে হত্যা করবে, তার শাস্তি জাহান্নাম।[২২৭]

১৫. পিতা মাতার অবাধ্য হওয়া: যে ব্যক্তি তার পিতা মাতার অবাধ্য হলো সে একটি কবীরা গুনাহ করল। মহান আল্লাহ বলেন-

وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করো না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়েই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়; তবে তাদেরকে 'উহ' শব্দটিও বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না এবং তাদেরকে শিষ্ঠাচারপূর্ণ কথা বল।'[২২৮]

---

[২২৫] সুনানুত তিরমিযী, হাদিস-৮১২

[২২৬] সূরা আনয়াম, আয়াত-১২১

[২২৭] সূরা নিসা, আয়াত-৯৩

[২২৮] সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত-২৩

১৬. আত্মীয় স্বজনদের পরিত্যাগ করা: আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখার জন্য কুরআন হাদীসে অনেক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। সুতরাং কেউ যদি তাদেরকে পরিত্যাগ করে তাহলে কবীরা গুনাহ হবে। মহান আল্লাহ বলেন-

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

আর আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর ওসীলা দিয়ে তোমরা একে অপরের নিকট নিজেদের হক চেয়ে থাক এবং আত্মীয় স্বজনদের (অধিকার খর্ব করা)কে ভয় কর। নিশ্চিয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি লক্ষ্য রাখছেন।[২২৯]

হাদীসে এসেছে-

وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ

যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস রাখে সে যেন আত্মীয় স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখে।[২৩০]

১৭. যিনা-ব্যভিচার জঘন্যতম অপরাধ এবং কবীরা গুনাহ: মহান আল্লাহ বলেন-

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

আর ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না। নিশ্চয় এটা অশ্লীল কাজ এবং মন্দ পথ।[২৩১]

১৮. সমকামীতা একটি নির্লজ্জ এবং ঘৃণিত অপরাধ: মহান আল্লাহ বলেন-

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ • وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ

পৃথিবীতে মানুষের মধ্যে তোমরাই পুরুষদের সাথে কুকর্ম কর। তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের জন্যে যে স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করেছেন, তাদেরকে বর্জন কর? বরং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়।[২৩২]

১৯. সুদ: সুদের সাথে জড়িত সবার সমান অপরাধ। মহান আল্লাহ বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً

হে মুমিনগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়ো না। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক।[২৩৩]

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন-

---

[২২৯] সূরা নিসা, আয়াত-১
[২৩০] সহীহ বুখারী, হাদীস-৬১৩৮
[২৩১] সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত-৩২
[২৩২] সূরা শুয়ারা, আয়াত-১৬৫, ১৬৬
[২৩৩] সূরা আলে ইমরান, আয়াত-১৩০

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

অতঃপর যদি তোমরা সুদ পরিত্যাগ না কর, তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে যাও।[২৩৪]

২০. এতিমের মাল আত্মসাৎ করা ও জুলুম করা: মহান আল্লাহ বলেন-

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

নিশ্চিত জেনে রেখো, যারা এতিমদের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করে, তারা নিজেদের পেটে আগুনই ভর্তি করে এবং তাদেরকে অচিরেই এক জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করতে হবে।[২৩৫]

২১. মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি মিথ্যা আরোপ করা: আল্লাহ বলেন-

وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ

যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, কিয়ামতের দিন আপনি তাদের মুখ কালো দেখবেন।[২৩৬]

হাদীসে এসেছে-

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে সে যেন তার অবস্থান জাহান্নামে ঠিক করে নিল।[২৩৭]

২২. যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা: শত্রু বাহিনী যদি মুসলিম বাহিনীর দ্বিগুণ বা কম হয় তখন মুসলিম সৈনিকের জন্য যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে পলায়ন করা কবীরা গুনাহ। তবে মুসলিম সৈনিক যদি শত্রুকে ধোঁকা দেয়া কিংবা অন্য মুসলিম সৈনিকের সাথে মিলিত হয়ে শত্রুকে আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে ময়দান থেকে পলায়ন করে তাহলে কবীরা গুনাহ হবে না। বরং সেটা ভালো কাজ হবে। মহান আল্লাহ বলেন-

وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

আর যে লোক সেদিন তাদের থেকে পশ্চাদপসরণ করবে, অবশ্য যে লড়াইয়ের কৌশল পরিবর্তনকল্পে কিংবা যে নিজ সৈন্যদের নিকট আশ্রয় নিতে আসে সে

---

[২৩৪] সূরা বাকারা, আয়াত-২৭৯
[২৩৫] সূরা নিসা, আয়াত-১০
[২৩৬] সূরা যুমার, আয়াত-৬০
[২৩৭] সহীহ বুখারী, হাদীস-১২৯১; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৪

ব্যতীত অন্যরা আল্লাহর গযব সাথে নিয়ে প্রত্যাবর্তন করবে। আর তার ঠিকানা হলো জাহান্নাম। বস্তুতঃ সেটা হলো নিকৃষ্ট অবস্থান।[২৩৮]

২৩. প্রজাদেরকে ধোঁকা দেওয়া এবং তাদের উপর জুলুম করা: আল্লাহ বলেন-

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

অভিযোগ তাদের বিরুদ্ধে, যারা মানুষের উপর অত্যাচার চালায় এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহ করে বেড়ায়। তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।[২৩৯]

হাদীসে এসেছে-

مَا مِنْ رَاعٍ غَشَّ رَعِيَّتَهُ، إِلا وَهُوَ فِي النَّارِ.

যে নেতা তার জাতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে সে জাহান্নামে যাবে। [২৪০]

২৪. ওসীয়তের দ্বারা অন্যকে ক্ষতি করা: মহান আল্লাহ বলেন-

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ •

উত্তরাধিকারের সম্পদ বন্টন করা হবে ওসীয়তের সম্পদ অথবা ঋণের সম্পদ পরিশোধ করার পর এমতাবস্থায় যে, ওসীয়তের মাধ্যমে যেন অপরের ক্ষতি না করা হয়। এ বিধান আল্লাহর। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সহনশীল।[২৪১]

২৫. অন্য কারো মাল, অথবা গনিমতের মাল, সরকারি মাল আত্মসাৎ করা: এগুলো ভয়ানক কবীরা গুনাহ। মহান আল্লাহ বলেন-

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ

নিশ্চয় মহান আল্লাহ কোনো খিয়ানতকারীকে (আত্মসাৎকারীকে) ভালোবাসেন না।[২৪২]

হাদীসে এসেছে-

لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلاَ صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ

পবিত্রতা ছাড়া নামায হবে না। আত্মসাৎকৃত মালের দান কবুল হবে না।[২৪৩]

২৬. চুরি করা: জঘন্যতম অপরাধ এবং কবীরা গুনাহ। মহান আল্লাহ বলেন-

[২৩৮] সূরা আনফাল, আয়াত- ১৬
[২৩৯] সূরা শুরা, আয়াত- ৪২
[২৪০] মুয়জামুত তাবরানী, হাদীস-৫৩৩
[২৪১] সূরা নিসা, আয়াত-১২
[২৪২] সূরা আনফাল, আয়াত-৫৮
[২৪৩] সহীহ মুসলিম, হাদীস-৫৫৭

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

যে পুরুষ চুরি ও যে নারী চুরি করে তাদের উভয়ের হাত কেটে দাও যাতে তারা নিজেদের কৃতকর্মের প্রতিফল পায় এবং আল্লাহর পক্ষ হতে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হয়। আল্লাহ ক্ষমতাবানও, প্রজ্ঞাবানও।[২৪৪]

২৭. ডাকাতি ও ছিনতাই করা: মহান আল্লাহ বলেন-

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে সংগ্রাম করে এবং দেশে হাঙ্গামা সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হয়, তাদের শাস্তি হচ্ছে এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলীতে চড়ানো হবে অথবা তাদের হস্তপদসমূহ বিপরীত দিক থেকে কেটে দেয়া হবে অথবা দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে। এটি হলো তাদের জন্য পার্থিব লাঞ্ছনা আর পরকালে তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর শাস্তি।[২৪৫]

২৮. কারো উপর জুলুম বা অত্যাচার করা: মহান আল্লাহ বলেন-

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ

জালেমরা যা করে, সে সম্পর্কে আল্লাহকে কখনও বেখবর মনে করো না, তাদেরকে তো ঐ দিন পর্যন্ত অবকাশ দিয়ে রেখেছেন, যেদিন চক্ষুসমূহ বিস্ফোরিত হবে।[২৪৬]

অন্য আয়াতে আল্লাহ আরো বলেন-

وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ

তোমরা জালেমদের কাছেও যেয়ো না। নতুবা তোমাদেরকেও আগুনে ধরবে।[২৪৭]

২৯. বিচারে দুর্নীতি করা: মহান আল্লাহ বলেন-

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

[২৪৪] সূরা মায়েদা, আয়াত-৩৮
[২৪৫] সূরা মায়েদা, আয়াত-৩৩
[২৪৬] সূরা ইবরাহীম, আয়াত-৪২
[২৪৭] সূরা হুদ, আয়াত-১১৩

ইঞ্জিলের অধিকারীদের উচিত, আল্লাহ তাতে যা অবতীর্ণ করেছেন। তদানুযায়ী ফয়সালা করা। যারা আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারাই পাপাচারী।[২৪৮]

হাদীসে এসেছে-

قَاضِيَانِ فِي النَّارِ وَقَاضٍ فِي الْجَنَّةِ قَاضٍ قَضَى بِالْحَقِّ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ وَقَاضٍ قَضَى بِجَوْرٍ فَهُوَ فِي النَّارِ وَقَاضٍ قَضَى بِجَهْلِهِ فَهُوَ فِي النَّارِ قَالُوْا: فَمَا ذَنْبُ هَذَا الَّذِيْ يَجْهَلُ قَالَ: ذَنْبُهُ أَنْ لَا يَكُوْنَ قَاضِيًا حَتَّى يَعْلَمَ

(বিচারক তিন প্রকার:) দুই প্রকার বিচারক জাহান্নামে যাবে। এক প্রকার বিচারক জান্নাতে যাবেন। যে বিচারক সত্যকে জানতে পেরেছেন এবং সে অনুযায়ী বিচার করেছেন তিনি জান্নাতে যাবেন। যে বিচারক সত্যকে জেনেও ইচ্ছা করে অবিচার করেছে সে জাহান্নামে যাবে এবং যে বিচারক অজ্ঞতা সত্ত্বেও বিচার করেছে সেও জাহান্নামে যাবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! যে ব্যক্তি অজ্ঞতাবশত বিচার করেছে তার দোষ কী? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তার দোষ হলো সে কেন না জেনে বিচার করল।[২৪৯]

৩০. বিচারের জন্য ঘুষ দেওয়া ও গ্রহণ করা: মহান আল্লাহ বলেন-

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ ভোগ করো না এবং জনগণের সম্পদের কিয়দাংশ জেনে-শুনে অসৎ পন্থায় আত্নসাৎ করার উদ্দেশ্যে শাসক কতৃপক্ষের হাতেও তুলে দিও না।[২৫০]

হাদীসে এসেছে-

لَعَنَ اللهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ فِي الْحُكْمِ

বিচারের ব্যাপারে ঘুষ দাতা ও গ্রহীতাকে মহান আল্লাহ অভিশাপ করেছেন।[২৫১]

৩১. লানত করা বা অভিশাপ দেয়া: হাদীসে এসেছে-

لَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ

কোনো মুমিন ব্যক্তিকে অভিশাপ দেয়া তাকে হত্যা করার শামিল।[২৫২]

[২৪৮] সূরা মায়েদা, আয়াত-৪৭
[২৪৯] আল-মুসতাদরাকু আলাস সাহীহাইন, হাদীস-৭০১৩
[২৫০] সূরা বাকারা, আয়াত-১৮৮
[২৫১] সুনানু আবু দাউদ, হাদীস-৩৫৮২; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস-৯০১১

অন্য হাদীসে এসেছে-

سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَقِتَالُه كُفْرٌ

মুসলমানকে গালি দেওয়া ফাসেকি (গুনাহর কাজ), হত্যা করা কুফুরি।[২৫৩]

৩২. প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি অন্যকে না দেওয়া: হাদীসে এসেছে-

ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ مَنَعَ ابْنَ السَّبِيلِ فَضْلَ مَاءٍ عِنْدَهُ وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ يَعْنِى كَاذِبًا وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا فَإِنْ أَعْطَاهُ وَفَى لَهُ وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ لَمْ يَفِ لَهُ

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কিয়ামতের দিন তিন প্রকার লোকের সাথে কথা বলবেন না। তাদের প্রতি দৃষ্টি দিবেন না। তাদেরকে গুনাহ থেকে পবিত্র করবেন না। তাদের জন্য কষ্টদায়ক কঠিন শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন। তারা হলো, **১.** যে ব্যক্তি মরুপ্রান্তরে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি থাকা সত্ত্বেও তা মুসাফিরদের দেয় না। ২. ঐ ব্যক্তি যে মিথ্যা কসম করে বলে যে আমি এ পণ্য এতো টাকায় ক্রয় করেছি অথচ সে তা সে মূল্যে ক্রয় করে নি। তারপর সে তা শপথের মাধ্যমে অধিক মূল্যে বিক্রয় করে। ৩. এমন ব্যক্তি যে পার্থিব স্বার্থ উদ্ধারের জন্য কোন ইমামের আনুগত্য ঘোষণা করেছে, যদি ইমাম তাকে তার স্বার্থ দেয় তবে সে তার সাথে সহযোগিতা করে। আর যদি সে ইমাম তার স্বার্থ না দেয় তবে সে অসহযোগিতা করে।[২৫৪]

৩৩. মাপে এবং ওজনে কম দেওয়া: মহান আল্লাহ বলেন-

وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

যখন লোকদেরকে মেপে দেয় কিংবা ওজন করে দেয়, তখন কম করে দেয়।[২৫৫]

৩৪. প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়া: হাদীসে এসেছে-

وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ قِيْلَ وَمَنْ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ الَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَه

আল্লাহর শপথ সে ব্যক্তি মুমিন নয়, আল্লাহর শপথ সে ব্যক্তি মুমিন নয়, আল্লাহর শপথ সে ব্যক্তি মুমিন নয়। জিজ্ঞেস করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কে সে লোক? তিনি বললেন, যার প্রতিবেশী তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ নয়।[২৫৬]

৩৫. ঝগড়া, ত্রাস এবং বিপর্যয় সৃষ্টি করা: মহান আল্লাহ বলেন-

[২৫২] সহীহ বুখারী, হাদীস-৬১০৫, ৬৬৫২
[২৫৩] সহীহ বুখারী, হাদীস-৪৮
[২৫৪] সুনানু আবু দাউদ, হাদীস-৩৪৭৬; সহীহ বুখারী, হাদীস-২৩৬৯
[২৫৫] সূরা মুতাফফিফীন, আয়াত-৩
[২৫৬] সহীহ বুখারী, হাদীস-৬০১৬

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ • وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ

আর এমন কিছু লোক রয়েছে যাদের পার্থিব জীবনের কথাবার্তা তোমাকে চমৎকৃত করবে। আর তারা সাক্ষ্য স্থাপন করে আল্লাহকে নিজের মনের কথার ব্যাপারে। প্রকৃতপক্ষে তারা কঠিন ঝগড়াটে লোক। যখন ফিরে যায় তখন চেষ্টা করে যাতে সেখানে অকল্যাণ সৃষ্টি করতে পারে এবং শস্যক্ষেত্র ও প্রাণনাশ করতে পারে। আল্লাহ ফাসাদ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা পছন্দ করেন না।[২৫৭]

৩৬. একাধিক স্ত্রীর ক্ষেত্রে সমতা রক্ষা না করা: মহান আল্লাহ বলেন-

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا

যদি আশঙ্কাবোধ করো যে, তোমরা তাদের (অর্থাৎ স্ত্রীদের) মধ্যে সুবিচার করতে পারবে না, তবে এক স্ত্রীতে অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীতে ক্ষান্ত থাক। এ পন্থায় তোমাদের অবিচারে লিপ্ত না হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।[২৫৮]

মন্দ স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কিত কবীরা গুনাহর বিবরণ

৩৭. অহংকার, দাম্ভিকতা, হিংসা, ঘৃণা নিন্দনীয় অপরাধ: মহান আল্লাহ বলেন-

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

অহংকার করে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না এবং পৃথিবীতে গর্বভরে পদচারণ করো না। নিশ্চয় আল্লাহ কোনো দাম্ভিক অহংকারীকে পছন্দ করেন না।[২৫৯]

৩৮. মিথ্যা শপথ করা: মহান আল্লাহ বলেন-

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

যারা আল্লাহর নামে কৃত অঙ্গীকার এবং শপথকে সামান্য মুল্যে বিক্রয় করে, আখেরাতে তাদের কেন অংশ নেই। আর তাদের সাথে কিয়ামতের দিন আল্লাহ কথা বলবেন না। তাদের প্রতি (করুণার) দৃষ্টিও দেবেন না। আর তাদেরকে পরিশুদ্ধও করবেন না। বস্তুতঃ তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।[২৬০]

---

[২৫৭] সূরা বাকারা, আয়াত-২০৪, ২০৫

[২৫৮] সূরা নিসা, আয়াত-৩

[২৫৯] সূরা লুকমান, আয়াত-১৮

[২৬০] সূরা আলে ইমরান, আয়াত-৭৭

হাদীসে এসেছে-

وَلاَ تَحْلِفُوا إِلاَّ بِاللَّهِ وَلاَ تَحْلِفُوا بِاللَّهِ إِلاَّ وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ

তোমরা শুধু আল্লাহর নামে শপথ করবে। আর আল্লাহর নামে কেবল সে বিষয়েই শপথ করবে যে বিষয়ে তোমরা সত্যবাদী।[২৬১]

৩৯. কথায় কথায় মিথ্যা বলা: মহান আল্লাহ বলেন-

فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ

তাদের প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত করি যারা মিথ্যাবাদী।[২৬২]

নোট: তিনটি ক্ষেত্রে মিথ্যা কথা বলা জায়েয আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন-

لَا يَحِلُّ الْكَذِبُ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ يُحَدِّثُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ لِيُرْضِيَهَا وَالْكَذِبُ فِي الْحَرْبِ وَالْكَذِبُ لِيُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ

তিনটি ক্ষেত্র ব্যতীত মিথ্যা বলা বৈধ নয়। ১. স্ত্রীকে খুশি করার উদ্দেশ্যে তার সাথে স্বামীর কিছু কথা বলা। ২. যুদ্ধের সময়। ৩. লোকদের পরস্পরের মধ্যে সংশোধন করা জন্য।[২৬৩]

৪০. গান ও বাদ্যযন্ত্র এবং নৃত্য পরিবেশন করা: মহান আল্লাহ বলেন-

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ

কতক মানুষ এমন, যারা অজ্ঞতাবশত আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে বিচ্যুত করার জন্য অবান্তর কথা কিনে আনে যা আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে উদাসীন করে দেয়।[২৬৪]

উল্লেখিত আয়াতে ‘অবান্তর কথা’র ব্যাখ্যা সম্পর্কে সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদি. কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তিনি মহান আল্লাহর নামে তিন বার শপথ করে বললেন এই আয়াতে ‘অবান্তর কথা’ এর ব্যাখ্যা হলো ‘গান’।[২৬৫]

৪১. মদ পান করা: এটি অন্যায় এবং অশ্লীলতা জন্ম দেয়। হাদীসে এসেছে-

اجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا أُمُّ الْخَبَائِثِ

তোমরা মাদকদ্রব্য পরিহার করো। কেননা তা যাবতীয় নিন্দনীয় কাজের মূল।[২৬৬]

---

[২৬১] সুনানু আবু দাউদ, হাদীস-৩২৫০

[২৬২] সূরা আলে ইমরান, আয়াত-৬১

[২৬৩] সুনানুত তিরমিযী, হাদীস-১৯৩৯

[২৬৪] সূরা লুকমান, আয়াত-৬

[২৬৫] বিস্তারিত: তাফসীরে ইবনে কাসীর

[২৬৬] সুনানুন নাসাঈ, হাদীস-৫৬৬৬

৪২. জুয়া খেলা: মহান আল্লাহ বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

হে মুমিনগণ! এই যে মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য-নির্ধারক বস্তুসমূহ এসব শয়তানের অপবিত্র কাজ ছাড়া কিছুই নয়। অতএব, এগুলো থেকে বেঁচে থাক। যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও।[২৬৭]

হাদীসে এসেছে-

مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ

যে ব্যক্তি গুটি খেলা (এক ধরনের জুয়া) খেলল সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানি করল।[২৬৮]

৪৩. সৎ নারীকে যিনার অপবাদ দেওয়া ও কু-ধারণা করা: মহান আল্লাহ বলেন-

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

যারা সতী-সাধ্বী, সরলমতী ঈমানদার নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তার প্রতি দুনিয়া আখেরাতে অভিশাপ পড়েছে। তাদের জন্যে রয়েছে গুরুতর শাস্তি।[২৬৯]

৪৪. আত্মহত্যা করা: মহান আল্লাহ বলেন-

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

তোমরা আত্মহত্যা করো না। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু।[২৭০]

হাদীসে এসেছে-

مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيْدَةٍ عُذِّبَ بِهِ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ

যে ব্যক্তি কোনো ধারালো লোহা দিয়ে আত্মহত্যা করে তাকে তা দিয়েই জাহান্নামে আযাব দেওয়া হবে।[২৭১]

৪৫. পোশাক-পরিচ্ছদে নারী-পুরুষের মাঝে সাদৃশ্য সৃষ্টি করা: হাদীসে এসেছে-

لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ الْمُتَشَبِّهِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

[২৬৭] সূরা মায়েদা, আয়াত-৯০
[২৬৮] সুনানু আবু দাউদ, হাদিস-৪৯৪০
[২৬৯] সূরা নূর, আয়াত-২৩
[২৭০] সূরা নিসা, আয়াত-২৯
[২৭১] সহীহ বুখারী, হাদীস-১৩৬৩

রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐ সব পুরুষকে অভিশাপ করেছেন যারা পোশাক-পরিচ্ছদ এবং আচার আচরণে নারীর সাদৃশ্য রাখে এবং ঐ সব নারীকে যারা পুরুষের বেশ ধারণ করে।[২৭২]

৪৬. কাউকে মন্দ নামে ডাকা: মহান আল্লাহ বলেন-

وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না। কেউ বিশ্বাস স্থাপন করলে তাদের মন্দ নামে ডাকা গোনাহ। যারা এমন করার পর তাওবা না করবে তারা জালেম।[২৭৩]

৪৭. গীবত বা পরনিন্দা করা: মহান আল্লাহ বলেন-

وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ

তোমাদের কেউ যেন কারও পশ্চাতে নিন্দা না করে। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের মাংস ভক্ষণ করা পছন্দ করবে? বস্তুতঃ তোমরা তো একে ঘৃণাই কর।[২৭৪]

৪৮. পার্থিব উদ্দেশ্যে ইলম অর্জন এবং ইলম গোপন করা: মহান আল্লাহ বলেন-

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ

নিশ্চয় যে আমার নাযিলকৃত উজ্জল নিদর্শনাবলী ও হিদায়াতকে গোপন করে, যদিও আমি কিতাবে তা মানুষের জন্য সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেছি। তাদের প্রতি আল্লাহর লানত বর্ষণ করেন এবং অন্যান্য লানতবর্ষনকারীগণও লানত বর্ষণ করেন।[২৭৫]

৪৯. আমানতের খিয়ানত বা বিশ্বাসঘাতকতা করা: মহান আল্লাহ বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে সাথে খেয়ানত করো না এবং খেয়ানত করো না নিজেদের পারস্পরিক আমানতে জেনে-শুনে।[২৭৬]

৫০. খোঁটা দেওয়া বা অনুগ্রহ করে তা প্রকাশ করা: মহান আল্লাহ বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ

[২৭২] সহীহ বুখারী, হাদীস-৫৮৮৫
[২৭৩] সূরা হুযরাত, আয়াত-১১
[২৭৪] সূরা হুযরাত, আয়াত-১২
[২৭৫] সূরা বাকারা, আয়াত-১৫৯
[২৭৬] সূরা আনফাল, আয়াত-২৭

হে মুমিনগণ! তোমরা অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে এবং কষ্ট দিয়ে নিজেদের দান খয়রাত বরবাদ করো না সে ব্যক্তির মত যে নিজের ধন-সম্পদ লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ব্যয় করে।[২৭৭]

৫১. কান পেতে গোপন কথা শোনা এবং দোষ ত্রুটি ফাঁস করা: আল্লাহ বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا

হে মুমিনগণ! তোমরা অনেক ধারণা থেকে বেঁচে থাক। নিশ্চয় কতক ধারণা গোনাহ। এবং গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না।[২৭৮]

৫২. চোগলখোরী অর্থাৎ পশ্চাতে নিন্দা করা: মহান আল্লাহ বলেন-

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ • هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ •

যে অধিক শপথ করে, যে লাঞ্ছিত, আপনি তার আনুগত্য করবেন না এবং যে পশ্চাতে নিন্দা করে একের কথা ।[২৭৯]

৫৩. মুসলমানকে গালি দেয়া ও কষ্ট দেয়া: মহান আল্লাহ বলেন-

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا

যারা বিনা অপরাধে মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে কষ্ট দেয়, তারা মিথ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপের বোঝা বহন করে।[২৮০]

৫৪. ওয়াদা বা অঙ্গীকার পালন না করা: মহান আল্লাহ বলেন-

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا •

অঙ্গীকার পূর্ণ কর। নিশ্চয় অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।[২৮১]

৫৫. প্রতিকৃতি বা ছবি অঙ্কন করা: হাদীসে এসেছে-

إِنَّ الَّذِيْنَ يَصْنَعُوْنَ الصُّوَرَ يُعَذَّبُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوْا مَا خَلَقْتُمْ

যেসব লোক প্রতিকৃতি বা ছবি অঙ্কন করে কিয়ামতের দিন তাদেরকে আযাব দেওয়া হবে এবং বলা হবে তোমরা যা কিছু সৃষ্টি করেছিল তা এখন জীবিত করে দেখাও।[২৮২]

৫৬. বিপদে অধৈর্য হওয়া: বিপদের সময় গালে চড় মারা, চুল-কাপড় ছেঁড়া, বিলাপ করা এবং নিজের ধ্বংস কামনা করা কবীরা গুনাহ। হাদীসে এসেছে-

[২৭৭] সূরা বাকারা, আয়াত-২৬৪
[২৭৮] সূরা হুযরাত, আয়াত-১২
[২৭৯] সূরা কলম, আয়াত- ১০,১১
[২৮০] সূরা আহযাব, আয়াত-৫৮
[২৮১] সূরা বানী ইসরাইল, আয়াত-৩৪
[২৮২] সহীহ মুসলিম, হাদীস-৫৬৫৭

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُوْدَ وَشَقَّ الْجُيُوْبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ

যারা (মৃত ব্যক্তির জন্য শোক প্রকাশে) নিজের গালে চড় মারে, জামা কাপড় ছিড়ে এবং জাহেলি যুগের মতো চিৎকার দেয় সে আমাদের দলভুক্ত নয়।[২৮৩]

৫৭. স্বামীর অবাধ্য হওয়া: মহান আল্লাহ বলেন-

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ

আর যে সকল স্ত্রীর ব্যাপারে অবাধ্যতার আশঙ্কা কর, প্রথমে তাদেরকে বুঝাও, (এতেও কাজ না হলে) তাদের শয়ন শয্যায় একা ছেড়ে দাও। (তাতেও সংশোধন না হলে) তাদেরকে প্রহার করতে পার।[২৮৪]

৫৮. তাচ্ছিল্যভাবে কারো প্রতি বিদ্রুপের হাসাহাসি করা: মহান আল্লাহ বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ

হে মুমিনগণ! কেউ যেন অপর কাউকে উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে।[২৮৫]

৫৯. লুঙ্গি বা পায়জামা ইত্যাদি টাখনুর নীচে পরিধান করা: হাদীসে এসেছে-

مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فَهُوَ فِي النَّارِ

যে পুরুষ ব্যক্তি পায়ের টাখনুর নীচ পর্যন্ত ঝুলিয়ে লুঙ্গি, পায়জামা ইত্যাদি পরিধান করবে সে অংশ জাহান্নামে যাবে।[২৮৬]

৬০. পুরুষের জন্য স্বর্ণ ব্যবহার করা: হাদীসে এসেছে-

أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيْرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِيْ حُرِّمَ عَلٰى ذُكُوْرِهَا

স্বর্ণ এবং রেশমী কাপড় আমার উম্মতের নারীদের জন্য হালাল এবং পুরুষের জন্য হারাম করা হয়েছে।[২৮৭]

৬১. রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাহাবীগণকে গালমন্দ করা: হাদীসে এসেছে-

مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ

যে ব্যক্তি আমার কোনো ওলীর সাথে দুশমনি রাখবে আমি তার সাথে যুদ্ধের ঘোষণা করব (এটি হাদীসে কুদসি)।[২৮৮]

৬২. প্রতারণা ও ধোঁকাবাজি করা: মহান আল্লাহ বলেন-

[২৮৩] সহীহ বুখারী, হাদীস-১২৯৪
[২৮৪] সূরা নিসা, আয়াত-৩৪
[২৮৫] সূরা হুযরাত, আয়াত-১১
[২৮৬] সহীহ বুখারী, হাদীস-৫৭৮৭
[২৮৭] সুনানু নাসাঈ, হাদীস-৫১৪৮
[২৮৮] সহীহ বুখারী, হাদীস-৬৫০২

وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ

প্রতারণার কুফল প্রতারণাকারীকেই ভোগ করতে হবে।[২৮৯]
হাদীসে এসেছে-

اَلْمَكْرُ وَالْخَدِيعَةُ فِي النَّارِ

প্রতারক ও ধোঁকাবাজ জাহান্নামে যাবে।[২৯০]

৬৩. আলিম ও হাফিযের মন্দ বলা ও দোষ চর্চা করা: মহান আল্লাহ বলেন-

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে ইলম দেওয়া হয়েছে (আলিম-হাফিয) আল্লাহ তাদেরকে মর্যাদায় উন্নত করবেন। তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ সে সম্বন্ধে পরিপূর্ণ অবগত। *সূরা মুজাদালাহ, আয়াত-১১*

৬৪. অন্যের ঘরে উকিঁ দেওয়া ও অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করা: আল্লাহ বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا

হে মুমিনগণ! নিজ গৃহ ছাড়া অন্যের গৃহে প্রবেশ করো না, যতক্ষণ না অনুমতি গ্রহণ করো ও তার বাসিন্দাদেরকে সালাম দাও। *সূরা নূর, আয়াত-২৭*

৬৫. মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া: মহান আল্লাহ বলেন-

وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ

মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাক।[২৯১] অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন-

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ

নিশ্চয় আল্লাহ সীমালংঘনকারী, মিথ্যাবাদীকে পথ প্রদর্শন করেন না।[২৯২]

৬৬. হারাম পানাহার করা: মহান আল্লাহ বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

হে মুমিনগণ! তোমরা পরস্পরে একে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে আহার করো না।[২৯৩] হাদীসে এসেছে-

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ غُذِيَ مِنَ الْحَرَامِ / بِالْحَرَامِ

[২৮৯] সূরা ফাতির, আয়াত-৪৩
[২৯০] মুয়জামুত তাবরানী, হাদীস-৭৩৮; ফাতহুল বারী
[২৯১] সূরা হজ্জ, আয়াত-৩০
[২৯২] সূরা গাফির/মুমিন, আয়াত- ২৮
[২৯৩] সূরা নিসা, আয়াত-২৯

ঐ দেহ জান্নাতে প্রবেশ করবে না যাকে হারাম খাদ্য দ্বারা প্রস্তুত করা হয়েছে।[২৯৪]

৬৭. ছোটদেরকে স্নেহ না করা এবং বড়দেরকে সম্মান না করা: হাদীসে এসেছে-

مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرِنَا فَلَيْسَ مِنَّا

যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদেরকে স্নেহ করে না এবং আমাদের বড়দেরকে সম্মান করে না সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।[২৯৫]

৬৮. গুনাহর কাজে সাহায্য করা ও উৎসাহিত করা: মহান আল্লাহ বলেন-

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

তোমরা সৎকর্ম ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে একে অন্যকে সহযোগিতা করো। গুনাহ ও জুলুমের ক্ষেত্রে একে অন্যকে সহযোগিতা করো না। আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহর শাস্তি অনেক কঠিন।[২৯৬]

৬৯. অপচয় করা: মহান আল্লাহ বলেন-

وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

তোমরা অপচয় করো না, নিশ্চয় তিনি অপচয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না।[২৯৭]
অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন-

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

জেনে রেখ, যারা অপ্রয়োজনীয় কাজে অর্থ ব্যয় করে তারা শয়তানের ভাই।[২৯৮]

৭০. আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া: মহান আল্লাহ বলেন-

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ

বলুন, হে আমার বান্দাগণ যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছ তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। *সূরা যুমার, আয়াত-৫৩*

[২৯৪] আল-মুয়জামুল আওসাত, হাদীস-৫৯৬১; মুসনাদুল বাযযার, হাদীস-৪৩
[২৯৫] সুনানু আবু দাউদ, হাদিস-৪৯৪৫
[২৯৬] সূরা মায়িদা, আয়াত-২
[২৯৭] সূরা আনয়াম, আয়াত-১৪১; আরাফ, আয়াত-৩১
[২৯৮] সূরা গাফির/মুমিন, আয়াত-৪৩

সপ্তম দাবিঃ কুরআনে নির্দেশগুলো পালন করা এবং নিষেধগুলো না করা।

কুরআনে যে সব বিষয়ে নিষেধ করা হয়েছে এর সংখ্যা অনেক। আমরা 'হাফিযের প্রতি কুরআনের দশটি দাবি' শিরোনামে যথাক্রমে ৩, ৪, ৫ এবং ৬ নং দাবির মধ্যে মৌলিক এবং উল্লেখযোগ্য নিষিদ্ধ কর্মের বিবরণ আলোচনা করেছি। এছাড়াও কুরআনে আরও অনেক নিষিদ্ধ কথা ও কাজের বিবরণ রয়েছে। অন্যান্য নির্ভরযোগ্য কিতাব থেকে দেখে নিলে ভালো হয়। কুরআনে বর্ণিত নির্দেশগুলোও অনেক। সংক্ষিপ্ত বইয়ে তা লেখার সুযোগ হয় নি। আমরা সাধারণত বিভিন্ন ইসলামি বই-পুস্তক এবং ওয়াজ-নসীহতের মাধ্যমে এগুলো জেনে থাকি। যেমন নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত, জুমা, ঈদ ও জানাযা ইত্যাদি। তবে প্রতেক মুমিনের জন্য উচিত হলো ইসলামের মৌলিক বিষয়ে নির্ভরযোগ্য কয়েকটি কিতাব সংগ্রহ করে তা নিয়মিত পাঠ করা। যেমন-

ক. সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাসহ কুরআন পড়া। এর জন্য উত্তম হলো আল্লামা তকি ওসমানি দা.বা. এর রচিত 'তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন' পাঠ করা।

খ. হাদীসের জন্য ব্যাখ্যাসহ 'মিশকাতুল মাসাবীহ' অধ্যয়ন করা।

গ. ইতিহাসের জন্য সম্ভব হলে 'আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া' পাঠ করা। বিশেষ করে 'সীরাতে মুস্তুফা' পাঠ করা। সকল নবী-রাসূলের জীবনী পাঠ করার জন্য মাকতাবাতুল ইসলাম থেকে প্রকাশিত 'কাসাসুল কুরআন' চমৎকার সংকলন।

ঘ. নামায সম্পর্কিত বইয়ের মধ্যে 'আমার সালাত' বইটি সকল সাধারণ পাঠকের জন্য চমৎকার সংকলন। বইটিতে কুরআন হাদীসের আলোকে সকল নামাযের বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে সহজ সাবলীল ভাষায়। বইটির সম্পাদনায় রয়েছেন ঢাকা বসুন্ধরা ইসলামিক রিসার্চ সেন্টারের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস, আল্লামা মুফতি আবদুস সালাম নোমানি (হাফিযাহুল্লাহ)। বইটি প্রকাশে সাহস এবং উৎসাহ যুগিয়েছিলেন এবং অভিমত ও দু'আর বানী দিয়েছিলেন সদ্য প্রয়াত উপমহাদেশের প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ, স্বনামধন্য শাইখুল হাদীস আল্লামা তাফাজ্জুল হক রাহি.। এই বইগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানতে আমাদের এই বইয়ের মধ্যে দেওয়া নির্ধারিত নাম্বারে (আসরের পর থেকে এশার নামায পর্যন্ত সময়ে) যোগাযোগ করতে পারেন।

অষ্টম দাবিঃ শুধু কুরআন-সুন্নাহ নির্দেশিত আমলের প্রতি যত্নবান হওয়া।

কুরআন-সুন্নাহ নির্দেশিত আমলের বিবরণ জানার জন্য একটি স্বতন্ত্র পুস্তক রচনা করা প্রয়োজন। আমাদের এই সংক্ষিপ্ত আয়োজনে শুধু সকাল-সন্ধা এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর পালনীয় আমলের কথা আলোচনা করেছি। প্রয়োজনে অন্যান্য নির্ভরযোগ্য বই-পুস্তক পাঠ করে জেনে নিবেন বলে আশা করি।

সকাল-সন্ধ্যার আমল

০১ নং: আয়াতুল কুরসী পাঠ করাঃ (১ বার)

কুরআন- হাদীসে আয়াতুল কুরসীর অনেক ফযিলত রয়েছে। এখানে সংক্ষেপে কয়েকটি ফযিলতের কথা উল্লেখ করছি। আয়াতুল কুরসী হচ্ছে সূরা বাক্বারার ২৫৫ নং আয়াত। তা হচ্ছে-

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ •

আয়াতুল কুরসীর ফযিলতঃ

ক. আল্লাহর হিফাযতে থাকবে। খ. শয়তান কাছে আসে না। হাদীসে এসেছে-

إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ . . . .

নবী صلى الله عليه وسلم বলেন, আবু হুরাইরা যখন তুমি ঘুমাতে যাও তখন আয়াতুল কুরসী পড়, তাহলে তুমি সর্বদা আল্লাহর হিফাযতে থাকবে। সকাল হওয়া পর্যন্ত তোমার কাছে শয়তান আসতে পারবে না। *সহীহ বুখারী, হাদীস-৩২৭৫*

গ. যে ব্যক্তি ঘর থেকে বের হবার আগে আয়াতুল কুরসী পড়বে সে ফিরে আসার আগ পর্যন্ত কোনো ক্ষতির সম্মুখীন হবে না। *(আল-আযকার' নববী রাহি.)*

ঘ. জান্নাতে প্রবেশে মৃত্যু ছাড়া কোনো বাধা থাকবে না। হাদীসে এসেছে-

مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلَّا الْمَوْتُ

যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরজ নামাযের পর আয়াতুল কুরসী পড়বে তাঁর জান্নাতে পৌছতে মৃত্যু ছাড়া কোনো বাধা থাকবে না। *আল-মুয়জামুল কাবীর, হাদীস-৭৫৩২*

ঙ. যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরজ নামায আদায়ের পর আয়াতুল কুরসী পড়বে সে অন্য নামায আদায় করা পর্যন্ত আল্লাহর হেফাযতে থাকবে। *মুয়. কাবীর, হা.-২৭৩৩*

চ. মহান আল্লাহ তাকে সাহায্য করবেন। হাদীসে এসেছে-

مَنْ قرأ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَخَوَاتِيمَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ عِنْدَ الْكَرْبِ، أَعَانَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

যে ব্যক্তি বিপদের সময়ে আয়াতুল কুরসী, বাক্বারার শেষ ২টি আয়াত পড়বে আল্লাহ তাকে সাহায্য করবে। *আমালুল ইয়াউমি ওয়াল লাইলাতি: ইবনুস সুন্নী, হা.-৩৪৪*

০২ নং: ইস্তিগফার পড়াঃ[২৯৯] অনেক ধরণের ইস্তিগফার রয়েছে। তবে হাদীসে বর্ণিত সর্বোত্তম ইস্তিগফার হলো সায়্যিদুল ইস্তিগফার। তা হচ্ছে-

[২৯৯] সহীহ বুখারী, হাদীস-৬৩০৬

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ
وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَاصَنَعْتُ اَبُوْءُلَكَ بِنِعْمَتِكَ
عَلَيَّ وَاَبُوْءُلَكَ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْلِيْ فَاِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ

হে আল্লাহ! আপনি আমার প্রভু। আপনি ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই। আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি আপনার বান্দা। আমি সাধ্যমত আপনার প্রতিশ্রুতিতে অঙ্গিকারাবদ্ধ রয়েছি। আমি আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট হতে আপনার কাছে আশ্রয় চাই। আমার প্রতি আপনার নিয়ামতের স্বীকৃতি প্রদান করছি। আর আমি আমার গুনাহ স্বীকার করছি, অতএব আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন। নিশ্চয় আপনি ছাড়া গুনাহ ক্ষমা করার কেউ নেই।

ইস্তিগফারের ২১টি ফযিলত রয়েছে। বিস্তারিত জানতে আমাদের এই বইটিতে দেয়া পরামর্শ প্রদানের জন্য দেয়া নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন। এছাড়া গুগোলের প্লেস্টোরে সঠিকভাবে 'মাসনুন দুআ ও যিকির' লিখে সার্চ করলেও আমার লেখা বইটি পাবেন।

০৩ নং: সকল পেরেশানী থেকে মুক্তির জন্য: (৭ বার)

حَسْبِيَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

হাছবি ইয়াল্লাহু লা- ইলাহা ইল্লা হুয়া আলাইহি তাওয়াক কালতু ওয়া হুয়া রাব্বুল আরশিল আযীম।

আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট। তিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। আমি তাঁর উপর নির্ভর করি। তিনি মহান আরশের প্রতিপালক। *সুনানু আবু দাউদ, হাদীস-৫০৮৩*

ফযিলত: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন; যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা সাতবার এই আমল করবে, দুনিয়া ও আখিরাতে মহান আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট হবেন।[৩০০]

০৪ নং: জান্নাত লাভ ও ঈমানের নিরাপত্তার জন্য: (৩ বার)

رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا /وَّرَسُوْلًا

রাযীতু বিল্লাহি রাব্বাউ ওয়াবিল ইসলামি দ্বীনাউ ওয়াবি মুহাম্মাদিন নাবিইয়্যাউ ওয়া রাসূলাহ।

আমি আল্লাহকে প্রভূ হিসেবে, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে এবং মুহাম্মাদ ﷺ-কে নবী ও রাসূল হিসেবে গ্রহণ করে সন্তুষ্ট হয়েছি।[৩০১]

---

[৩০০] সুনানু আবু দাউদ, হাদীস-৫০৮৩

[৩০১] তিরমিযী, হাদীস-৩৩৮৯; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস-২৩১৬০;

ফযিলত: ক. মুনাইযির রাদি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন; যে ব্যক্তি সকালে এ বাক্যগুলো বলবে আমি দায়িত্ব গ্রহণ করছি যে, আমি তাঁর হাত ধরে তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করাব।[৩০২] খ. সাওবান রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন; যে ব্যক্তি সকালে তিনবার এবং বিকালে তিনবার পড়বে তার উপর আল্লাহর হক হয়ে যায় যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা তাকে খুশী ও সন্তুষ্ট করবেন।[৩০৩]

নোট: প্রিয় পাঠক! বর্তমানে কাদিয়ানি ও অন্যান্য ভ্রান্ত সম্প্রদায় যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নবী হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট নয়, এরা খাঁটি উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যে ঈমান বিধ্বংসী ফিতনা ছড়াচ্ছে। এছাড়া পাশ্চাত্যের প্রচার মাধ্যমগুলো আমাদের মুসলিম দেশের মানুষের ঈমান নষ্ট করার জন্য তারা মুমিনদেরকে এ কথা শেখাতে চেষ্টা করছে যে 'ইসলাম ধর্ম হিসেবে যথেষ্ট নয়, অথবা সব ধর্মই ঠিক আছে'। সুতরাং এই পরিস্থিতিতে উপরের দুআটি নিয়মিত পাঠ করা উচিত যেন আমাদের ঈমান সর্বদা সঠিক ও নিরাপদ থাকে।

০৫ নং: বৃদ্ধকাল উত্তম হওয়া এবং সুন্দরভাবে মৃত্যু হওয়ার জন্য: (১ বার)

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ خَيْرَ عُمُرِيْ اٰخِرَهُ وَخَيْرَ عَمَلِيْ خَوَاتِمَهُ وَخَيْرَ اَيَّامِيْ يَوْمَ اَلْقَاكَ

আল্লাহুম্মাজ আল খাইরা উমরী আখিরাহু, ওয়া খাইরা আমালী খাওয়াতিমাহু, ওয়া খাইরা আইয়ামী ইয়াওমা আলক্বাকা।

হে আল্লাহ! আমার জীবনের শেষ অংশকে উত্তম করুন। আমার শেষ আমলকে উত্তম করুন এবং আপনার সাথে আমার সাক্ষাতের দিনকে উত্তম করুন।[৩০৪]

০৬ নং: সুস্থ জীবনের জন্য প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় পড়ার দুআ: (৩ বার)

اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ بَدَنِيْ اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ سَمْعِيْ اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ بَصَرِيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ

আল্লাহুম্মা আফিনী ফী বাদানী, আল্লাহুম্মা আফিনী ফী ছাময়ী, আল্লাহুম্মা আফিনী ফী বাছারী লা-ইলাহা ইল্লা আংতা।

হে আল্লাহ! আপনি আমার শরীরে নিরাপত্তা দান করুন, আমার শ্রবণে নিরাপত্তা দান করুন, আমার দৃষ্টি শক্তিতে নিরাপত্তা দান করুন। আপনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই।

ফযিলত: আব্দুর রহমান ইবনে আবু বাকরা রাদি. বলেন, আমি আমার আব্বাকে বললাম, আব্বু! আপনাকে প্রত্যেক দিন সকাল-সন্ধ্যায় এই দুআ বলতে শুনি।

---

[৩০২] মুয়জামুত তাবরানী, হাদীস-৮৩৮; মাযমাউয যাওয়াইদ, হাদীস-১৭০০৫

[৩০৩] সুনানুত তিরমিযী, হা.-৩৩৮৯; মুসনাদে আহমাদ, হা.-২৩১৬০; মিশকাত, হা.-২৩৯৯

[৩০৪] আমালুল ইয়াউমি ওয়াল লাইলাতি: ইবনুস সুন্নী, হাদীস-১২১

তিনি আমাকে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এই দুআ পড়তে শুনেছি। এই জন্য আমিও এই দুআ পড়ি তাঁর আদর্শকে ধরে রাখার জন্য।[৩০৫]

০৭ নং: আকস্মিক বালা-মুসিবত থেকে রক্ষার জন্য: (৩ বার)

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِیْ لَا یَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَیْءٌ فِی الْاَرْضِ وَلَا فِی السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ

বিছমিল্লা হিল্লাযী লা- ইয়া-দুররু মায়াছমিহি শাইউং ফিল আরদ্বি ওয়ালা ফিছ ছামায়ি, ওয়া হুয়াছ ছামিউল আলীম।

আমি সেই আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি, যার নামে শুরু করলে আসমান-জমিনের কোন বস্তুই কোন অনিষ্ট করতে পারে না। তিনি হচ্ছেন সর্বোশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।[৩০৬]

ফযিলত: হযরত ওসমান ইবনে আফফান রাদি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন; যে ব্যক্তি সকালে তিনবার এই দুআ পড়বে, সন্ধ্যা পর্যন্ত তার উপর আকস্মিক বালা-মুসিবত আসবে না। কোনো কিছুই তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। অনুরূপভাবে সন্ধ্যায় পড়লেও সে সকাল পর্যন্ত সেই ফলাফল লাভ করবেন। *সুনানু আবু দাউদ, হাদীস-৫০৯০; তিরমিযী, হাদীস-৩৩৮৮*

০৮ নং: আকস্মিক কল্যাণ লাভ এবং অমঙ্গল থেকে বেঁচে থাকার জন্য: (১ বার)

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْاَلُكَ مِنْ فَجْاَةِ الْخَیْرِ . وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فَجْاَةِ الشَّرِّ

আল্লাহুম্মা ইন্নী আছ আলুকা মিন ফাজ আতিল খাইরি, ওয়া আউযুবিকা মিন ফাজ আতিশ শাররি।

হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আকস্মিক কল্যাণ চাই, এবং আকস্মিক অমঙ্গল থেকে আশ্রয় চাই। *মাযমাউয যাওয়াইদ, হাদীস-১৭০০১*

০৯ নং: সকল ক্ষতি থেকে রক্ষার জন্য: (৩ বার)

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

আউযু বিকালিমা তিল্লাহিত তা-ম্মাতি মিং শাররি মা- খালাক্ব।

আল্লাহর পূর্ণ গুণাবলী বাক্য দ্বারা তাঁর নিকট আমি সৃষ্টির সকল ক্ষতি থেকে আশ্রয় চাই।[৩০৭]. **ফযিলত:** সফর বা ভ্রমণ থেকে ফেরত আসার আগ পর্যন্ত কোন কিছুই তার ক্ষতি করতে পারবে না। (এই আমলটিকে প্রায় সকল হাদীসেই সন্ধ্যাকালীন আমল বলা হয়েছে। দুয়েকটি হাদীসে সকাল-সন্ধ্যার কথা বলা হয়েছে।)

১০ নং: অসংখ্য সওয়াব অর্জন এবং গুনাহ মাফের জন্য: (১ বার)

[৩০৫] সুনানু আবু দাউদ, হাদীস-৫০৯২
[৩০৬] সুনানু আবু দাউদ, হাদীস-৫০৯০; সুনানুত তিরমিযী, হাদীস-৩৩৮৮
[৩০৭] সহীহ মুসলিম, হাদীস-৭০৫৫; ইতহাফুল খাইরাহ, হাদীস-৬০৯০

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِیْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ দাহু লা- শারীকালাহ, লাহুল মুলকু ওয়ালা হুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িং ক্বাদীর।

আল্লাহ ব্যতীত কোনো মাবূদ নেই। তিনি এক। তার কোনো অংশীদার নেই। রাজত্ব এবং সকল প্রশংসা তাঁরই জন্য। তিনি সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।[৩০৮]

ফযিলত: যে ব্যক্তি ফজরের নামাযের পর এই আমলটি করবে সে অনেক লাভবান হবে। যেমন- ক. সে ব্যক্তি ইসমাঈল (আ.)-এর বংশীয় চারজন ক্রীতদাস মুক্ত করার সমান সওয়াব পাবে। খ. তাকে দশটি সওয়াব দেওয়া হবে। গ. তার দশটি গুনাহ ক্ষমা করা হবে। ঘ. তার দশটি পদমর্যাদা বৃদ্ধি করা হবে। ঙ. ঐ দিন শয়তানের প্ররোচনা থেকে সুরক্ষিত থাকবে। আর আসরের পর পড়লেও সে অনুরূপ ফলাফল সকাল পর্যন্ত পেতে থাকবে।[৩০৯] চ. কেউ যদি সকাল-বিকাল ১০০ বার পাঠ করে তবে সে দিন তার চেয়ে বেশি আমল আর কেউ করতে পারবে না। তবে যদি কেউ তার সমান এই আমলটি করে বা তার চেয়ে বেশি পাঠ করে তাহলে ভিন্ন কথা।[৩১০] ছ. সকল নবীদের কাছে উত্তম আমল।[৩১১] (এ দুআটি ফরয নামাজের পর মাসনুন আমলেও আসবে।)

১১ নং: সকল বিষয়কে সাফল্য মণ্ডিত করার জন্য: (১ বার)

یَا حَیُّ یَا قَیُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِیْثُ اَصْلِحْ لِیْ شَاْنِیْ كُلَّهٗ وَلَا تَكِلْنِیْ اِلٰی نَفْسِیْ طَرْفَةَ عَیْنٍ

ইয়া হাইউ ইয়া ক্বাইউম, বিরাহমাতিকা আছতাগীছ, আছলিহ লী শায়নী কুল্লাহ, ওয়ালা তাকিলনী ইলা নাফছী ত্বারফাতা আইন।

হে চিরঞ্জীব! হে মহারক্ষক! আপনার রহমতের ওসীলা দিয়ে ত্রাণ প্রার্থনা করছি। আপনি আমার সকল বিষয়কে সুন্দর ও সাফল্যমণ্ডিত করুন। আর আমাকে চোখের পলকের বাইরে (একটি মুহূর্তের জন্যও) আমার নিজের দায়িত্বে ছেড়ে দিবেন না। *মুয়জামুত তাবরানী, হাদিস-৪৪৪; ফাতহুল বারী শরহে বুখারী*

নোট: হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদি. বলেন, আমরা (ফজরের নামাযের পর) সূর্যোদয় পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সঙ্গে মসজিদে বসা ছিলাম। এরপর তিনি বের হলেন। আমি তাঁর পেছনে চললাম। তিনি বললেন 'তুমি আমার সঙ্গে চলো, আমরা ফাতিমার বাড়িতে যাবো। আমরা ফাতিমার ঘরে প্রবেশ করলাম। তখন সে (নামাযের পর) ঘুমাচ্ছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, হে

[৩০৮] সুনানু আবু দাউদ, হাদীস-৫০৭৯
[৩০৯] সুনানু আবু দাউদ, হাদীস-৫০৭৯
[৩১০] সহীহ বুখারী, হাদীস-৬৪০৩;
[৩১১] সুনানুত তিরমিযী, হাদীস-৩৫৮৫

ফাতিমা! এই সময় তুমি ঘুমাচ্ছ কেন? ফাতিমা বলল, আমি সারা রাত জ্বরে আক্রান্ত ছিলাম। তিনি বললেন, আমি তোমাকে যে দুআটি শিখিয়েছিলাম তুমি কি সেই দুআটি পড়েছ? তখন ফাতিমা রাদি. বললেন, সেটি আমি ভুলে গিয়েছি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি বলো.. .., একথা বলে তিনি ফাতিমা রাদি. কে উপরের দুআটি আবার শিখিয়ে দিলেন। *মুয়জামুত তাবরানী, হাদীস-৪৪৪*

১২ নং: শরীরের হিফাযতের জন্য: (প্রত্যেকটি ৩ বার)

ক. সূরা ইখলাস । খ. সূরা ফালাক্ব। গ. সূরা নাস।

ফযিলত: মুয়ায ইবনে আবদুল্লাহ রাদি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন হে মুয়ায! তুমি যদি সকাল-সন্ধ্যায় তিনবার করে এই তিনটি সূরা পাঠ করো তাহলে তোমার জন্য যথেষ্ট হবে। তোমার আর কিছুই দরকার হবে না। *তিরমিযী-৩৫৭৫*

১৩ নং: সারাদিন সওয়াব লাভের আমল: (৩ বার)

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ

ছুবহা নাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী, আদাদা খালক্বিহী, ওয়া রিযা নাফছিহী, ওয়া যিনাতা আরশিহী, ওয়া মিদাদা কালিমাতিহ।

আমি আল্লাহর পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করছি তাঁর সৃষ্টি বস্তু সমূহের সংখ্যার সমান। তাঁর নিজের সন্তুষ্টির সমান। তাঁর আরশের ওযনের সমান। তাঁর বাণীসমূহ লিখার কালি পরিমাণ অসংখ্যবার। *সহীহ মুসলিম, হাদীস-৭০৮৮*

ফযিলত: উম্মুল মুমিনীন হযরত জুওয়াইরিয়া রাদি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের নামাযের পর আমাকে নামাযের স্থানে যিকির রত অবস্থায় দেখে বাইরে গেলেন। এরপর তিনি দুপুরের একটু আগে ফিরে এসে আমাকে নামাযের মুসল্লায় বসে যিকিররত অবস্থায় দেখলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাকে যে অবস্থায় রেখে বাইরে গিয়েছিলাম তুমি কি এখনো সে অবস্থায়ই আছো? আমি জবাব দিলাম, হ্যাঁ। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি তোমার কাছ থেকে বেরিয়ে যাবার পর চারটি বাক্য তিনবার করে বলেছি, (উপরের বাক্যগুলো)। তুমি সকাল থেকে এ পর্যন্ত যত আমল করেছ সবকিছু একত্রে যে সওয়াব হবে, উপরের বাক্যগুলো তিনবার পড়লে তোমার আমলনামাতে সেই পরিমাণ সওয়াব হবে। *সহীহ মুসলিম, হাদীস-৭০৮৮*

নোট: সহীহ মুসলিম থেকে বুঝা যায় যে, আমলটি সকালে পালন করতে হবে। কিন্তু হিসনুল মুসলিমে এটিকে সকাল-সন্ধ্যার আমলের শিরোনামে উল্লেখ করা হয়েছে। আমরাও এটিকে সকাল সন্ধ্যার আমলের শিরোনামে উল্লেখ করেছি।

১৪ নং: গুরুত্বপূর্ণ দুআ: (১ বার)

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوْتُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ দাহু লা-শারীকালাহ, লাহুল মুলকু ওয়ালা হুল হামদু, য়ুহয়ি ওয়া য়ুমীতু ওয়াহুআ হাইয়ুন লা-ইয়ামুতু, বিয়াদিহিল খাইরু, ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িং ক্বাদীর।[৩১২]

১৫ নং: সত্তর হাজার ফিরিশতা ক্ষমা প্রার্থনার আমল: 'যে ব্যক্তি সকালে ৩ বার

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

আউযু বিল্লাহিছ ছামিয়িল আলীমি মিনাশ শাইত্বানির রাজীম' এবং একবার সূরা হাশরের শেষ তিনটি আয়াত পড়বে তার গুনাহ মাফের জন্য মহান আল্লাহ সত্তর হাজার ফিরিশতা নিয়োগ করেন। বিকাল পর্যন্ত ফিরিশতারা তার জন্য মাগফিরাত করতে থাকেন। সে যদি ঐ দিন মৃত্যু বরণ করে তাহলে সে শহীদের মর্যাদা পাবে। *সুনানুত তিরমিযী, হাদীস-২৯২২* এই আমলটি শুধু সকালে পালনীয়।

সূরা হাশরের শেষ তিনটি আয়াত: (১ বার)

هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ • هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۚ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ • هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ۚ يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

তিনিই আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই; তিনি অপ্রকাশ্য ও প্রকাশ্য সবই জানেন। তিনি সকলের প্রতি দয়াবান ও পরম দয়ালু। তিনিই আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই; তিনিই একমাত্র মালিক, পবিত্রতার অধিকারী, শান্তিদাতা ও নিরাপত্তাদাতা, সকলের রক্ষক, মহা ক্ষমতাবান, সকল দোষ-ত্রুটি হতে সংশোধনকারী, গৌরবান্বিত, তারা যে শিরক করে তা থেকে পবিত্র। তিনিই আল্লাহ, যিনি সৃষ্টিকর্তা, অস্তিত্বদাতা, রূপদাতা, সুন্দর নাম সমূহ তাঁরই। নভোমন্ডলে ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে সবই তাঁর তাসবীহ পাঠ করে। তিনিই ক্ষমতাময়, হিকমতের মালিক।

[৩১২] অধিকাংশ হাদীসে এই দুআটিকে বাজারে প্রবেশের পূর্বের দুআ বলা হয়েছে। আবার কোনো কোনো হাদীসে দুআটিকে ফরজ নামাযের পর এবং সকাল-সন্ধ্যায় পড়ার কথা বলা হয়েছে। মাযমাউয যাওয়াইদ, হাদীস-১৬৯৮৭

প্রত্যেক ফরজ নামাযের পর মাসনুন আমল

প্রাসঙ্গিক কথা: নামায মুমিনের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আমল। আর এ আমলেই মুমিনের অন্তরে প্রশান্তি আসে। এজন্য নামাযের শেষে মুমিন তাঁর হৃদয়ে প্রশান্তি অনুভব করেন। আমরা নামাযে মনোযোগ দিতে পারি না বলে এ প্রশান্তি ভালোভাবে অনুভব করতে পারি না। তা সত্ত্বেও যতটুকু সম্ভব মনোযোগ সহকারে অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে নামায শেষ করলে নামায আদায়কারী নিজেই হৃদয়ের প্রশান্তি ও আবেগ অনুভব করবেন। নামায শেষে তাড়াহুড়া করে উঠে চলে যাওয়া মুমিনের উচিত নয়। নামাযের পরে যতক্ষণ সম্ভব নামাযের স্থানে বসে যিকির-মুনাজাতরত থাকা উচিত। কিছু না করে শুধু বসে থাকলেও ফিরিশতাগণের দুআ লাভের সৌভাগ্য হবে।

প্রত্যেক ফরজ নামাযের পর মাসনুন আমলের গুরুত্ব

১. ফিরিশতাগণ অনবরত দুআ করতে থাকেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন-

وَالْمَلاَئِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِى صَلَّى فِيهِ يَقُولُونَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ أَوْ يُحْدِثْ فِيهِ

ফিরিশতাগণ অনবরত তোমাদের জন্য দুআ করতে থাকেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা নামাযের পর নামাযের স্থানে বসে থাকো। (ফিরিশতাগণ বলেন) 'হে আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করুন, হে আল্লাহ! তাঁকে রহমত করুন, তাঁর তাওবা কবুল করুন। যতক্ষণ সে অহেতুক কাজ না করে এবং ওযু নষ্ট না করে।[৩১৩]

২. গোলামকে মুক্ত করার চেয়েও বেশি প্রিয় আমল: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন-

لأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَعَالَى مِنْ صَلاَةِ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ أَرْبَعَةً مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ وَلأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللَّهَ مِنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ أَرْبَعَةً

ফজরের নামাযের পরে সূর্যোদয় পর্যন্ত আল্লাহর যিকিররত কিছু মানুষের সাথে বসে থাকা আমার কাছে ইসমাঈল আ.-এর বংশের চারজন ক্রীতদাস বা গোলামকে মুক্ত করার চেয়েও বেশি প্রিয়। অনুরূপভাবে আসরের নামাযের পরে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আল্লাহর যিকিরে রত কিছু মানুষের সাথে বসে থাকা আমার কাছে ইসমাঈল আ.-এর বংশের চারজন ক্রীতদাস বা গোলামকে মুক্ত করার চেয়েও বেশি প্রিয়।[৩১৪]

৩. একটি কবুল হজ্ব ও কবুল ওমরা করার সমান সওয়াব: হাদীসে এসেছে

[৩১৩] সুনানু আবু দাউদ, হাদীস-৫৫৯
[৩১৪] সুনানু আবু দাউদ, হাদীস-৩৬৬৯

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন- 'যে ব্যক্তি ফজরের নামায আদায় করার পর নামায জায়েয হওয়ার সময় পর্যন্ত তাঁর বসার স্থানে বসে থাকবে সে একটি কবুল হজ্ব এবং একটি কবুল ওমরা করার সমান সওয়াব পাবে।[৩১৫]

৪. সাহাবী-তাবেয়িগণের আমল: এছাড়া সাহাবী-তাবেয়িগণ প্রত্যেক ফরজ নামাযের পরে কোনো কথোপকথনে লিপ্ত না হয়ে সাধ্যমতো বেশি সময় তাসবীহ, তাহলীল এবং দুআ ও যিকির করতে পছন্দ করতেন। ফরজ নামাযের পর দুআ কবুল হয় বলে হাদীসে উল্লেখ আছে। এ জন্য ফরজ নামাযের পর বেশি করে দুআ করা উচিত। বিশেষ করে ফজর এবং আসরের নামাযের পরে দুআ, দরুদ এবং যিকির নিয়মিতভাবে বেশি করে পালন করা উচিত।

প্রত্যেক ফরজ নামাযের পর মাসনুন আমল

০১ নং: ইস্তিগফার পড়া: (৩ বার)

প্রত্যেক ফরজ নামাযের সালাম ফিরিয়ে তিনবার 'আস্তাগফিরুল্লাহ' বলা।[৩১৬]

০২ নং: আয়াতুল কুরসি পড়া: (১ বার)

আয়াতুল কুরসী পড়া।[৩১৭] 'সকাল সন্ধ্যার আমল' শিরোনামে আলোচনা হয়েছে।

০৩ নং: সূরা ফালাক ও নাস পাঠ করা: (১ বার)

হাদীসে এসেছে, 'হযরত ওকবা ইবনে আমের রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেন প্রত্যেক ফরয নামাযের পর সূরা ফালাক ও নাস পাঠ করি।[৩১৮]

০৪ নং: কুফুরি, দারিদ্রতা ও কবরের আযাব থেকে রক্ষার দুআ: (১ বার)

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ

আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল কুফরি, ওয়াল ফাক্বরি, ওয়া আযাবিল ক্বাবরি

হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাই কুফুরি, দারিদ্রতা এবং কবরের আযাব থেকে।

ফযিলত: হযরত মুসলিম ইবনে আবু বাকরা রাদি. বলেন, আমার পিতা নামাযের শেষে উল্লেখিত আমলটি করতেন। আমিও নামাযের শেষে আমলটি করতে লাগলাম। তিনি আমাকে বললেন, হে আমার ছেলে! তুমি এই আমলটি কোথায় থেকে শিখলে? আমি বললাম, আপনার থেকে শুনে শুনে শিখেছি। তখন তিনি

[৩১৫] আল-মুয়জামুল আওসাত, হাদীস-৫৬০২
[৩১৬] সহীহ মুসলিম, হাদীস-১৩৬২
[৩১৭] আল-মুয়জামুল কাবীর, হাদীস-২৭৩৩
[৩১৮] সুনানু আবু দাউদ, হাদীস-১৫২৫

বললেন, হে ছেলে! এই আমলটিকে গুরুত্বসহ পালন করবে। কেননা নবী ﷺ প্রত্যেক নামাযের শেষে এই আমলটি করতেন।[৩১৯]

০৫ নং: প্রত্যেক ফরজ নামাযের পর এই দুআ পড়া: (১ বার)

اَللّٰهُمَّ أَعِنِّي عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ.

আল্লাহুম্মা আয়িন্নী আলা যিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুছনি ইবাদাতিক।

হে আল্লাহ! আপনার স্মরণ, কৃতজ্ঞতা এবং উত্তম ইবাদত পালনে আমাকে সাহায্য করুন।

ফযিলত: মুয়ায ইবনে জাবাল রাদি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার হাত ধরে বলেছেন, 'হে মুয়ায, আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি আমি তোমাকে ভালোবাসি, তারপর তিনি বললেন, হে মুয়ায! আমি তোমাকে ওসিয়ত করছি, তুমি কখনো ফরজ নামাযের পর 'আল্লাহুম্মা...' বাদ দিবে না। মুয়ায বর্ণনাকারী ছানাবিহকে এবং তিনি আবু আবদুর রহমানকে এমনই ওসিয়ত করেছেন।[৩২০]

০৬ নং: প্রত্যেক ফরজ নামাযের পর এই দুআ পড়া: (১ বার)

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ

আল্লাহুম্মা আংতাছ ছালাম, ওয়া মিংকাছ ছালাম, তাবারাকতা ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম।[৩২১]

হে আল্লাহ! আপনি শান্তিদাতা, শান্তি আপনার পক্ষ থেকেই হয়। আপনি সুমহান, হে সম্মান ও মর্যাদার মালিক।

৭ নং: প্রত্যেক ফরজ নামাযের পর তাসবীহ'র আমল: (৩০ থেকে ৩০০ পর্যন্ত)

প্রত্যেক ফরজ নামাযের পর ৩৩ বার 'ছুবহানাল্লাহ', ৩৩ বার 'আল হামদু লিল্লাহ' এবং ৩৩/৩৪ বার 'আল্লাহু আকবার' বলা। এই আমল সম্পর্কে অনেক সহীহ হাদীসে বিভিন্ন সংখ্যা উল্লেখ আছে। তবে উল্লেখিত সংখ্যাটিই বেশি প্রসিদ্ধ। এই তাসবিহগুলোর সর্বনিম্ন সংখ্যা হচ্ছে প্রত্যেকটি ১০ বার করে মোট ৩০ বার। আর সর্বোচ্চ সংখ্যা হচ্ছে প্রত্যেকটি ১০০ বার করে মোট ৩০০ বার।

আবু হুরাইরা রাদি. থেকে বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যদি কেউ উপরোক্ত তাসবীহ প্রত্যেকটি ৩৩ বার করে মোট ৯৯ বার এবং একবার নীচের তাসবীহ পড়ে তাহলে তাঁর গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। যদিও তা সাগরের ফেনার মতো হয়। তাসবীহ'টি হচ্ছে-

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

---

[৩১৯] মুসনাদে আহমদ, হাদীস-২০৪২৫; তাহযীবুল আসার, হাদীস-৩১০

[৩২০] সুনানু আবু দাউদ, হাদীস-১৫২৪

[৩২১] সুনানু আবু দাউদ, হাদীস-১৫১৪

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ দাহু লা- শারীকালাহ, লাহুল মুলকু ওয়ালা হুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িং ক্বাদীর।[৩২২]

৮ নং: জাহান্নাম থেকে মুক্তির জন্য: (৭ বার, শুধু ফজর ও মাগরিবের পর)

اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِيْ مِنَ النَّارِ

(আল্লা-হুম্মা আজিরনী মিনান নার।)

হে আল্লাহ! আপনি আমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করুন।[৩২৩]

ফযিলত: মুসলিম ইবনুল হারিস রাদি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেছেন, তুমি ফজরের নামাযের পরেই দুনিয়াবী কথা বলার আগে এ দুআটি সাতবার পড়বে। যদি তুমি ঐ দিনে মৃত্যুবরণ কর তাহলে আল্লাহ তোমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন। অনুরূপভাবে মাগরিবের নামাযের পরেই দুনিয়াবি কথা বলার আগে এ দুআটি সাতবার পড়বে। যদি তুমি ঐ রাতে মৃত্যুবরণ কর তাহলে আল্লাহ তোমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন।[৩২৪]

৯ নং: ইলম, রিযিক ও আমল কবুলের জন্য দুআ: (১ বার শুধু ফজরের পর)

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُّتَقَبَّلًا،

আল্লাহুম্মা ইন্নী আছ আলুকা ইলমান নাফিয়া, ওয়া রিযক্বাং ত্বায়্যিবা, ওয়া আমালাম মুতাক্বাববালা, ।

হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে উপকারী ইলম, উত্তম জীবিকা এবং কবুল আমল প্রার্থনা করছি।[৩২৫]

১০ নং: সূরা সাফ্‌ফাত এর শেষ তিন আয়াত পড়া: (৩ বার) তা হচ্ছে-

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

পবিত্র আপনার প্রতিপালকের সত্তা, তিনি সম্মানিত ও পবিত্র যা তারা বর্ণনা করে তা থেকে। রাসূলগণের প্রতি সালাম বর্ষিত হোক। সমস্ত প্রশংসা বিশ্বপালক আল্লাহর জন্য।

ফযিলত: যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরজ নামাযের পর এই আয়াতগুলো তিনবার পড়বে তাকে যতেষ্ট পরিমাণ সওয়াব দেওয়া হবে।[৩২৬]

---

[৩২২] সহীহ বুখারী, হাদীস-৬৩২৯

[৩২৩] সুনানু আবু দাউদ, হাদীস-৫০৮১

[৩২৪] সুনানু আবু দাউদ, হাদীস-৫০৮১

[৩২৫] সুনানু ইবনে মাজাহ, হাদীস-৯২৫

[৩২৬] মুয়জামুত তাবরানী, হাদীস-৫১২৪

নবম দাবি: আলোকিত সমাজ গঠন

বাংলাদেশে একটি আলোকিত সমাজ বিনির্মাণে তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে আসতে হবে। বিশেষ ভূমিকা রাখতে হবে আল্লাহর কুরআনের আলিম-ওলামা ও হাফিযগণের। তাহলেই পুরনো, সেকেলের সমাজ ভেঙ্গে আলোকিত সমাজ প্রতিষ্ঠিত করার আশা করা যায়। জরাজীর্ণ, ঘুণে ধরা শোষিত জাহেলি সিস্টেমে পরিচালিত সমাজকে ভেঙ্গে নতুন সমাজ বিনির্মাণ করতে হলে আলিম-ওলামা ও হাফিযগণকে কিছু আবশ্যকীয় গুণ অর্জন করতে হবে। যেমন-

১. ইলম (জ্ঞান) অর্জন

জ্ঞানশক্তি। পেশী শক্তির চেয়ে জ্ঞানের শক্তি অনেক বেশি কার্যকর। ধন-সম্পদ, টাকা-পয়সা দিয়ে যা করা যায় না তা করা যায় ইলম বা জ্ঞানের আলোতে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন-

أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا فَمَنْ أَرَادَ الْعِلْمَ فَلْيَأْتِهِ مِنْ بَابِهِ

আমি ইলমের শহর এবং আলী এর দরজা। সুতরাং যে ইলম অর্জনের ইচ্ছা করে সে যেন তার (অর্থাৎ হযরত আলী রাদি. এর) দরজায় আগমন করে।[৩২৭]

[৩২৭] আল-মুয়জামুল কাবীর, হাদীস-১১০৬১; হযরত আলী রাদি. এর জ্ঞানের গভীরতা বুঝার জন্য একটি প্রাসঙ্গিক ঘটনা উল্লেখ করছি। হযরত আলী রাদি. ছিলেন অনেক ইলমওয়ালা ব্যক্তি। তাঁর ইলম পরীক্ষা করার জন্য দশজনের একটি প্রতিনিধি দল বুদ্ধি করে হযরত আলী রাদি. এর নিকট গমন করল। তাঁর কাছে গিয়ে তাদের দলনেতা বলল, হে আমিরুল মুমিনিন, খলিফাতুল মুসলিমিন! আপনি যদি অনুমতি প্রদান করেন তাহলে আমরা আপনাকে একটি প্রশ্ন করব। খলিফা তাদেরকে প্রশ্ন করার অনুমতি প্রদান করলেন। দলনেতা বলল, সম্পদ ও জ্ঞানের মধ্যে কোনটি শক্তিশালী এবং উত্তম? এবং কেন? আপনি আমাদের দলের দশজনকে পৃথক পৃথক করে দশটি উত্তর প্রদান করে বুঝাতে হবে আপনি ইসলামের জ্ঞানের দরজা। দল নেতার কথা শুনে উপস্থিত সবাই চাতক পাখির ন্যায় দৃষ্টি দিলেন খলিফাতুল মুসলিমিন হযরত আলী রাদি. এর দিকে। খলিফাতুল মুসলিমিন বললেন, ঠিক আছে। আমি উত্তর দেব। আপনারা মনোযোগ সহকারে শুনুন। সবাই উত্তর শুনার জন্য মনোযোগ দিলেন খলিফাতুল মুসলিমিন হযরত আলী রাদি. এর দিকে। তিনি বললেন: ১. নবি রাসূল জ্ঞান অর্জনের জন্য গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ফিরাউন ও কারুন গুরুত্ব আরোপ করেছে সম্পদ অর্জনের জন্য। তাই সম্পদ অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্ঠ। ২. সম্পদ পাহাড়া দিতে হয়। কিন্তু জ্ঞানকে পাহাড়া দিতে হয় না। বরং জ্ঞান বিদ্বানকে পাহাড়া দেয়। ৩. সম্পদ শত্রুতা সৃষ্টি করে। কিন্তু জ্ঞান মানুষকে বন্ধুত্বে পরিণত করে। ৪. জ্ঞান বিতরণ করলে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু সম্পদ বিতরণে হ্রাস পায়। ৫. জ্ঞান মানুষের মনে উদারতা সৃষ্টি করে। কিন্তু সম্পদ মানুষের মনে কৃপণতা গড়ে তোলে। ৬. সম্পদ হারাবার ভয় থাকে। চুরি করা যায়। কিন্তু জ্ঞানকে কেউ চুরি করতে পারে না এবং গায়ের জোড়েও নিতে পারে না। তাই জ্ঞান সবার জন্যই নিরাপদ। ৭. সম্পদ ধ্বংস হয়ে যায়। জ্ঞান সম্পূর্ণ তার বিপরীত। ৮. সম্পদের পরিমাপ করা যায়। কিন্তু জ্ঞানের পরিমাপ করা যায় না। ৯. সম্পদ মানুষের অন্তরকে কলুষিত করে তোলে। কিন্তু জ্ঞান মানুষের অন্তরকে করে

ইলম অর্জন করা আবশ্যক। তবে কতটুকু ইলম অর্জন করতে হবে? যতটুকু ইলম অর্জন করলে ইসলামি পদ্ধতিতে জীবন পরিচালনা করা যায় ততটুকু ইলম অর্জন করা আবশ্যক। ইলমের কয়েকটি পর্ব রয়েছে। যেমন, ক. ঈমান-আকাইদ, তাওহীদ ও কুফর-শিরক, বিদআত, কবীরা ও সগিরা গুনাহ সম্পর্কিত ইলম। খ. ইবাদত, যথা- পবিত্রতা, ওযু, গোসল, নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত, কুরবানি, আকিকা ইত্যাদি। গ. মুয়ামালাত অর্থাৎ লেনদেন, ব্যবসা-বানিজ্য, অর্থনীতি, শ্রমনীতি, চাকুরী, কল-কারখানা, শিল্প প্রতিষ্ঠান, বিয়ে-শাদী, উত্তরাধিকার, মামলা-মুকাদ্দমা, আচার-বিচার, মসজিদ-মাদরাসা পরিচালনার নিয়ম-নীতি ইত্যাদি। গ. মুয়াশারাত, অর্থাৎ আচার-আচরণ, মানবাধিকার, পানাহার, মেহমানদারী, রাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, শিষ্টাচার, সংস্কৃতি ইত্যাদি। এসব বিষয়ে সবার জন্য ইলম অর্জন করা আবশ্যক নয়। তবে একজন আলিম হাফিযের এ সম্পর্কে ইলম অর্জন করা জরুরী। এর জন্য একজন হাফিযে কুরআন হিফয করার পরপরই দ্বীনী কোনও খেদমতে নিয়োজিত না হয়ে এসব বিষয়ে ইলম অর্জনের জন্য চেষ্টা করা আবশ্যক। যদি সম্ভব না হয় তাহলে অন্তত বাংলাদেশের মাদানী নেসাবের প্রথম দুই বছর পড়া-শুনা করলেও এসব বিষয়ে কিছুটা ধারণা হবে এবং কুরআন বুঝে পড়ার মতো মোটামোটি যোগ্যতা অর্জন হবে। মহান আল্লাহ সকল মুমিন এবং বিশেষভাবে হাফিযগণকে তাওফীক দান করুন।

২. আত্মশুদ্ধি ও চরিত্র গঠন

আত্মশুদ্ধি ও চরিত্র গঠনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা: মহান আল্লাহ বলেন-

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى • وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى •

সে সফলতা অর্জন করেছে, যে পবিত্রতা অবলম্বন করেছে এবং নিজ প্রতিপালকের নাম নিয়েছে অতঃপর নামায পড়েছে।[৩২৮]

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন-

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

তোলে আলোকিত। ১০. সম্পদ মানুষের অন্তরে জন্ম দেয় হিংসা-বিদ্বেষ। কিন্তু জ্ঞান মানুষের অন্তরে জন্ম দেয় মানবতা, নম্রতা, ভদ্রতা শিষ্টাচার। যার কারণে মানুষ হয়ে উঠে মানব দরদী। সুতরাং সম্পদ হতে সর্বদিক থেকে জ্ঞানই শক্তিশালী এবং উত্তম। এতোক্ষণে আগত দলের কেউ কোনও কথা বলে নি। মনোযোগ দিয়ে শুনছিল জ্ঞানের ফটক খলিফাতুল মুসলিমিন হযরত আলী রাদি. এর জ্ঞানগর্ভ কথাগুলো। এক প্রশ্নের দশটি উত্তর শুনে তারা অবাক হলো রীতিমত। স্বীকার করতে বাধ্য হলো 'সত্যিই হযরত আলী রাদি. জ্ঞানের দরজা।

[৩২৮] সূরা আলা, আয়াত-১৪,১৫

রাসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ।[৩২৯]

হযরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে-

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: ঐ ব্যক্তি পরিপূর্ণ মুমিন যে মুমিন ব্যক্তিদের মধ্যে উত্তম চরিত্রের অধিকারী।[৩৩০]

আত্মশুদ্ধি ও উত্তম চরিত্র গঠনের জন্য করণীয়

আত্মশুদ্ধি করা মানে অন্তর পরিষ্কার করা। আমাদের মধ্যে অনেক খারাপ স্বভাব রয়েছে। এটা দুই ধরণের। একটা অন্তরের সাথে সম্পৃক্ত। আরেকটা আমাদের বাহ্যিক অঙ্গের সাথে সম্পৃক্ত। অন্তরের খারাপ স্বভাব দূর করে ভালো গুণ অর্জন করাকে আত্মশুদ্ধি বলা হয়। আমাদের দেহের সকল অঙ্গের মন্দ ব্যবহার পরিহার করে ভালো এবং উত্তম ব্যবহারকে উত্তম চরিত্র গঠন বলা হয়। আত্মশুদ্ধি ও উত্তম চরিত্র গঠনের জন্য অন্তরের দশটি মন্দ স্বভাবকে বাদ দিতে হবে। যেমন, ১. অহংকার ২. অন্যজনের অনিষ্ট কামনা ৩. কৃপণতা ৪. কু-ধারণা ৫. ঘৃণা ৬. গালমন্দ ৭. পরনিন্দা ৮. মিথ্যা বলা ৯. লৌকিকতা ১০. হিংসা-বিদ্বেষ। এই বদঅভ্যাসগুলো মানুষকে মনুষ্যত্ব থেকে বের করে দেয়। সুতরাং আত্মশুদ্ধি এবং উত্তম চরিত্র গঠনের জন্য এগুলো পরিহার করে দশটি ভালো গুণ অর্জন করতে হবে। যেমন, ১. আল্লাহর উপর ভরসা ২. ইখলাস ৩. কৃতজ্ঞতা ৪. তাওবা ৫. তাকওয়া ৬. তাকদিরের প্রতি বিশ্বাস ৭. সম্পদের প্রতি নির্লোভ ৮. ধৈর্য ৯. মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মানুষের প্রতি ভালোবাসা ১০. মৃত্যু বা পরকালের হিসাবের চিন্তা ইত্যাদি।

৩. সংঘটিত হওয়া

জ্ঞান অর্জন ও আত্মশুদ্ধি এবং চরিত্র গঠন সমাজ বিনির্মাণের জন্য যথেষ্ট নয়। প্রয়োজন নিজেদেরকে সংঘটিত করা, ঐক্যবদ্ধ করা ও জামাতবদ্ধ থাকা।

জামাত বা ঐক্যবদ্ধ জীবনযাপনের গুরুত্ব

১. জামাত বা ঐক্যবদ্ধ জীবনযাপন করা একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত: কেননা, যদি ঐক্যবদ্ধ জীবনযাপন করা হয় তাহলে এর দ্বারা মহান আল্লাহর হুকুম পালন করা হয়। মহান আল্লাহ বলেন-

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

[৩২৯] সূরা আহযাব, আয়াত-২১

[৩৩০] সুনানু আবু দাউদ, হাদীস- ৪৬৮৪

তোমরা আল্লাহর রশিকে ঐক্যবদ্ধভাবে আঁকড়ে ধরো এবং পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হয়ো না।[৩৩১]

সুতরাং কেউ যদি জামাতবদ্ধ জীবন যাপন না করে তাহলে সে সূরা আলে ইমরানের উল্লেখিত আয়াতের উপর আমল করল না এবং সে অনেক বড় একটি হুকুম পালন থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকল যা কোনো মুমিনের জন্য উচিত নয়। বিশেষ করে আল্লাহর কুরআনের হাফিযগণের তা হবে একেবারেই অনুচিত কাজ।

২. ঐক্যবদ্ধ জীবনযাপন রাসূলুল্লাহ ও সাহাবীগণের আদর্শ: আল্লাহ বলেন-

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ

মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর সাথে যারা আছে, তারা কাফিরদের বিরুদ্ধে কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরে সদয়।[৩৩২]

৩. জামাত বা ঐক্যবদ্ধ জীবনযাপন থেকে বিচ্ছিন্ন হলে অপমৃত্যুর আশঙ্কা রয়েছে: আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন-

مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

কেউ তার শাসক বা প্রশাসক থেকে কোনও অপছন্দনীয় বিষয় দেখলে সে যেন ধৈর্য ধারণ করে। কারণ যদি কেউ জামাত, সমাজ বা রাষ্ট্রের ঐক্যের বাইরে এক বিগত বের হয়ে যায় এবং এ অবস্থায় সে মৃত্যুবরণ করে তাহলে সে জাহেলি মৃত্যুবরণ করল।[৩৩৩]

৪. যে ব্যক্তি ঐক্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয় সে শয়তানের সঙ্গী হয়: হাদীসে এসেছে-

إِنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدِي هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ فَمَنْ رَأَيْتُمُوهُ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ أَوْ يُرِيدُ يُفَرِّقُ أَمْرَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَائِنًا مَنْ كَانَ فَاقْتُلُوهُ فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ يَرْكُضُ

তোমরা যাকে দেখবে যে সে ঐক্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে বা মুহাম্মাদ ﷺ-এর উম্মতকে বিভক্ত করতে চাচ্ছে সে যেই হোক না কেন তাকে হত্যা করো। কারণ

[৩৩১] সূরা আলে ইমরান, আয়াত-১০৩

[৩৩২] সূরা ফাতাহ, আয়াত-২৯

[৩৩৩] সহীহ বুখারী, আয়াত-৭০৫৪, ৭১৪৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৪৮৯৬

আল্লাহর হাত ঐক্যের উপর। আর যে ঐক্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয় শয়তান তার সাথে দৌড়ায়।[৩৩৪]

৫. জামাত বা ঐক্য থেকে বিচ্ছিন্ন হলে ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন হবার আশঙ্কা রয়েছে: হারিস আল আশআরী রাদি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন-

وَأَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ اللَّهُ أَمَرَنِي بِهِنَّ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ وَالْجِهَادُ وَالْهِجْرَةُ وَالْجَمَاعَةُ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ

আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছি, যেগুলোর ব্যাপারে মহান আল্লাহ আমাকে নির্দেশ প্রদান করেছেন। কথা শুনবে, আনুগত্য করবে, জিহাদ করবে, হিজরত করবে এবং জামাত বা ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকবে। কেননা যে ব্যক্তি জামাত বা ঐক্যবদ্ধ হওয়া থেকে এক বিগত পরিমাণ বিচ্ছিন্ন হলো সে ইসলামের বন্ধন তার ঘাড় থেকে ফেলে দিল, যতক্ষণ না সে ফিরে আসে।[৩৩৫]

৬. জামাতবদ্ধ জীবন জান্নাতের পথকে সহজ করে দেয়: হাদীসে এসেছে-

عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الِاثْنَيْنِ أَبْعَدُ، مَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ.

তোমরা জামাতকে আঁকড়ে ধরো এবং দলাদলি বা বিচ্ছিন্নতা থেকে সাবধান থাকো। কারণ, শয়তান একক ব্যক্তির সাথে এবং সে দু'জন থেকে অনেক দূরে। যে ব্যক্তি জান্নাতের প্রশস্থতা চায় সে যেন জামাত বা ঐক্যকে আঁকড়ে ধরে।[৩৩৬]

৭. জামাতবদ্ধ জীবনে রয়েছে রহমত এবং বিচ্ছিন্নতায় রয়েছে আযাব: হযরত নোমান ইবনে বশির রাদি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন-

وَالْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ

জামাতের মধ্যে রয়েছে রহমত এবং বিভক্তির মধ্যে রয়েছে আযাব।[৩৩৭]

কুরআন-হাদীসের সুস্পষ্ট নির্দেশনার পর আর কোনও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয় না। প্রয়োজন জামাত বা ঐক্যবদ্ধ জীবন গঠনের। বর্তমান সময়ে মুসলিম উম্মাহ সবচেয়ে বড় এবং সংকটময় মূহুর্ত অতিক্রম করছে। এই সময়ে মুসলিমদের পরস্পরে বিভেদ এবং বিচ্ছিন্ন জীবনযাপন মোটেও উচিত নয়। বিশেষ করে একদল অপর দলের প্রতি বিষোদগার করা মুসলিম উম্মাহর সামগ্রিক জীবনকে সিংহ থেকে বিড়াল ছানার মতো করে দিচ্ছে। ইসলাম ও

[৩৩৪] সুনানুন নাসাঈ, হাদীস-৪০২০; আল-মুয়জামুল কাবীর, হাদীস-৩৬২

[৩৩৫] সুনানুত তিরমিযী, হাদীস-২৮৬৩

[৩৩৬] সুনানুত তিরমিযী, হাদীস-২১৬৫; আস-সুনানুল কুবরা, হাদীস-৯২২৫

[৩৩৭] মুসনাদু আহমাদ, হাদীস-১৮৪৪৯

মুসলিম উম্মাহর চরম দুশমনের মুখে হাসির খোরাক জোগার করছে। সুতরাং আমি একজন মুসলিম হিসেবে আজই সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, এখন থেকে আমি আর কোনও মুসলিম ব্যক্তি বা দলের প্রতি বিষোদগার কিংবা দোষ ও নিন্দা চর্চা করবো না। যদি কোনও মুসলিম দলের আদর্শ ভালো না লাগে তাহলে আমি তার ব্যাপারে নিরব ভূমিকা পালন করবো। ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর জাতীয় স্বার্থে অপর কোনও মুসলিম দলের সাথে ঐক্য করতে প্রস্তুত থাকব। কিন্তু ঐক্য করতে গিয়ে আমরা উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সমস্যায় উপনীত হয়ে থাকি। সে সব সমস্যা থেকে উল্লেখযোগ্য সমস্যা ও এর সমাধান জেনে রাখা ভালো। আশা করি সচেতন পাঠক 'ঐক্য গঠনে সমস্যা ও সমাধান' সম্পর্কিত বিষয়ে পড়াশুনা করে জেনে রাখবেন। আমাদের সংক্ষিপ্ত পুস্তকে এ বিষয়ে আলোচনা করতে পারি নি বলে আন্তরিকভাবে দুঃখিত। তবে আশা পাঠকের মতামতের ভিত্তিতে বইটির পরবর্তী সংস্করণে এ বিষয়ে আলোচনা করা প্রয়াস পাব।

৮. আন্দোলনী তৎপরতায় সক্রিয় অংশগ্রহণ: মহান আল্লাহ বলেন-

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا

নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের প্রতি খুশি হয়েছেন, যখন তারা গাছের নিচে আপনার কাছে বাইয়াত গ্রহণ করছিল। তাদের অন্তরে যা কিছু ছিল আল্লাহ সে সম্পর্কেও অবগত ছিলেন। তাই তিনি তাদের উপরে অবতীর্ণ করলেন প্রশান্তি, এবং পুরষ্কারস্বরূপ তাদেরকে দান করলেন আসন্ন বিজয়।[৩৩৮]

আয়াতের শানে নুযূল, ইতিহাস এবং শিক্ষা

হিজরী ৬ষ্ঠ সালে মহানবী ﷺ ওমরা আদায়ের উদ্দেশ্যে চৌদ্দশ সাহাবায়ে কিরামকে নিয়ে মদীনা থেকে মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করলেন। মক্কার কাছাকাছি পৌঁছে জানতে পারলেন মুশরিকরা তাদেরকে মক্কায় প্রবেশ করতে দিবে না। এজন্য তিনি হুদাইবিয়া নামক স্থানে শিবির স্থাপন করলেন। তারপর পরামর্শক্রমে হযরত ওসমান রাদি. -কে মক্কার মুশরিকদের সার্বিক সংবাদ সংগ্রহ করার জন্য দূত হিসেবে প্রেরণ করলেন। মহানবী ﷺ দূতের মাধ্যমে কুরাইশ নেতৃবৃন্দকে এ কথাও জানিয়ে দিলেন যে আমরা এ বছর শুধু ওমরা পালন করার জন্য মক্কায় প্রবেশ করব, কোনও যুদ্ধ করার অভিপ্রায় আমাদের নেই। ওমরা পালন করে শান্তিপূর্ণভাবে মদীনায় ফেরত চলে যাব। নির্দেশমত তিনি মক্কায় গেলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই গুজব ছড়িয়ে পড়ল 'মক্কার মুশরিকরা হযরত

[৩৩৮] সূরা ফাতাহ, আয়াত-১৮

ওসমানকে হত্যা করেছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে মহানবী ﷺ উপস্থিত সকল সাহাবায়ে কিরামকে এক স্থানে সমবেত করে তাদের থেকে বাইয়াত নিলেন (অর্থাৎ হাতে হাত রেখে এই প্রতিশ্রুতি নিলেন) যে, মক্কার মুশরিকরা মুসলিমদের উপর হামলা চালালে তারা তাদের মুকাবিলা করার জন্য নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করবে। ইতিহাসে এই বাইয়াতকে 'বাইয়াতে রিদওয়ান' বলা হয়।

ইতিহাস থেকে আমাদের শিক্ষা: ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে, সাহাবায়ে কিরাম ইলম, আত্মশুদ্ধি ও উত্তম চরিত্র গঠনের পরও নিজেদের মধ্যে ঐক্য এবং পরস্পরে সংঘটিত ছিলেন শক্ত প্রাচীরের ন্যায়। সুতরাং আমাদের জীবনের ব্যর্থতার জন্য সমস্য কোনটি তা বুঝতে পেরেছেন তো! তাহলে আর দেরি কেন? আজই নিজেকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমার আপনার করণীয় কী? মহান আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের তাওফীক দান করুন।

দশম দাবি: হৃদয়ে কুরআনের চেতনা লালন করা

এদেশে অনেক কিছুর চেতনা লালন করা হয়। লালন করা হয় না মহান আল্লাহর কুরআনের চেতনা। কত মানুষ কতকিছুর জন্য ভালোবেসে জীবন বিলিয়ে দেয় অকাতরে। বন্ধুর জন্য বন্ধু জীবন উৎসর্গ করে। অথচ এসব তার পরকালে কোনও উপকারে আসবে না। যে চেতনা লালন করলে কাজে আসবে দুনিয়াতে এবং আরও বেশি নিশ্চিত উপকার হবে পরকালে সে চেতনা লালন করতে হবে হৃদয়ের গভীরে। সে চেতনাবোধ জাগ্রত করার জন্য আমাদের এই আয়োজনে তিনটি কথা উল্লেখ করেছি। আশা করি মহান আল্লাহর কুরআনের হাফিযগণ কথাগুলো মনে রাখবেন। তিনি আমাদেরকে তাওফীক দান করুন।

১. হাফিযগণ নিজের জীবনের চেয়ে কুরআনকে বেশি ভালোবাসতে হবে

কুরআন সংকলন ও সংরক্ষণের ইতিহাস থেকে আমরা জেনেছি যে হযরত ওসমান রাদি. নিশ্চিত শাহাদাতের মুখেও নিজ ঘরে বসে কুরআন তিলাওয়াত করেছিলেন। তিনি যখন পড়ছিলেন-

فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

এটি সূরা বাকারার ১৩৭ নং আয়াতের শেষাংশ। তিঁনি তাঁর ডান হাত দিয়ে কুরআনের পাতা স্পর্শ করে তিলাওয়াত করার সময় মিসরীয় বিদ্রোহীরা তাঁর ডান হাতের মধ্যে সর্বপ্রথম আঘাত করে। তিনি হাত টেনে নেবার সময় বলেছিলেন 'আল্লাহর কসম এই হাত সর্বপ্রথম কুরআন মাজীদ পূর্ণাঙ্গভাবে লিপিবদ্ধ করে গ্রন্থাকারে বিশ্ব মুসলিমদের সামনে উপস্থাপন করেছে।'

হযরত ওসমান রাদি. কে ৩৫ হিজরীর ১৮ যিলহজ শুক্রবার আসরের নামাজের পর মিসরীয় বিদ্রোহীরা তাঁর ঘরে প্রবেশ করে কুরআন তিলাওয়াতরত অবস্থায় তাঁকে শহীদ করেন। তিনি মৃত্যুর সময়েও কুরআনের ভালোবাসা হৃদয়ে ধারণ করেছিলেন।

২. কুরআনের হাফিয জীবন দিবে তবুও বাতিলের সাথে আপোষ করবে না

রাসূলুল্লাহ ﷺ চতুর্থ হিজরীতে মক্কায় গুপ্তচরের একটি জামাত প্রেরণ করেছিলেন। যাদের সংখ্যা ছিল দশ। তাদের নেতা ছিলেন হাফিয আসিম বিন সাবিত রাদি.। তারা মক্কা ও উছফান নামক স্থানের মাঝামাঝি পৌঁছার পর বাধার সম্মুখীন হন। হাফিয আসিম লক্ষ্য করলেন দুশমনের সংখ্যা ১০০ জন। তিনি সাথীদেরকে ফাদফাদ নামক উচুঁ টিলাতে আরোহনের নির্দেশ দান করেন। দুশমনেরা তাদেরকে আত্মসমর্পণের জন্য আহ্বান করে। নেতা হাফিয আসিম বললেন, আমরা আত্মসমর্পণ করবো না। শুরু হলো তুমুল যুদ্ধ। হাফিয আসিম বিন সাবিতসহ মোট সাতজন শাহাদাত বরণ করেন। ইতিপূর্বে হাফিয আসিম বদরের যুদ্ধে শত্রু বাহিনীর বড় নেতাকে হত্যা করেছিলেন। ফাদফাদ নামক উঁচু টিলা থেকে তিনজনকে বন্দী করা হলো। শেষ পর্যন্ত তাদের একজনকে শহীদ করা হলো। অপর দুইজনকে বিক্রি করা হয় ইসলামের দুশমন বাহিনীর হারিছ বিন আমিরের পুত্রদের কাছে। তারা তাদেরকে নিয়ে হত্যা করে। অবশেষে শত্রু বাহিনী হাফিয আসিমের লাশ এনে বদরের যুদ্ধের পরাজয়ের প্রতিশোধ নেওয়ার ইচ্ছা করল। কিন্তু মহান আল্লাহ মেঘের ন্যায় এক ঝাঁক মৌমাছি পাঠিয়ে দিলেন। মৌমাছিগুলো চারদিক থেকে হাফিয আসিমের লাশকে ঘিরে রাখে। শত্রু বাহিনীর হাত থেকে তাঁর দেহকে রক্ষা করা হয়। শত্রু বাহিনী তাঁর কাছেই যেতে পারে নি। কুরআনের হাফিয আসিম জীবন দিলেন তবুও বাতিলের সাথে আপোষ করেন নি।[৩৩৯]

৩. কুরআনের হাফিযকে জিহাদের ময়দানে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে হবে

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদি. এর আমলে আরবের কিছু গোত্র ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যায়। কেউ কেউ মিথ্যা নবী হওয়ার দাবি করে। এ সব মিথ্যুকদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ছিল মূসাইলামাহ্ আল কায্যাব। হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদি. তার বাহিনীর বিরুদ্ধে হযরত খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের রাদি. এর নের্তৃত্বে বিরাট বাহিনী প্রেরণ করেন। মুসলিমদের সৈন্য সংখ্যা ছিল ১৩ হাজার। মূসাইলামার বাহিনীতে সৈন্য ছিল ৪০ হাজার। যুদ্ধ হয় ইয়ামামার ময়দানে। প্রচণ্ড যুদ্ধে মিথ্যুক মূসাইলামাহ্ পরাজিত ও নিহত হয়। মূসাইলামার বাহিনীর প্রায় ২১ হাজার মানুষ প্রাণ হারায়। তবে এই যুদ্ধে মুসলিমদেরও বিপুল প্রাণহানি ঘটে। কোনও কোনও বর্ণনা মতে ৬৬০ এর অধিক সাহাবী শহীদ হন।

[৩৩৯] বিস্তারিত: ই.ফা অনূদিত ও প্রকাশিত; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪/১২৫

যাঁদের অনেকে কুরআনের হাফিয ছিলেন। কোনও বিবরণে বলা হয়েছে শহিদগণের মধ্যে ৭০ জনই ছিলেন কুরআনের হাফিয। বিশেষ করে যে চারজন সাহাবীর কাছ থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরআন তিলাওয়াত শেখার নির্দেশ দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে হাফিয সালিম রাদি. ছিলেন অন্যতম। তিনিও ইয়ামামার যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। ৭০ জন্য হাফিযে কুরআন ইমামার যুদ্ধে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছিলেন।[৩৪০]

تمت الرسالة الصغيرة بعون الله وفضله في يوم الخميس في السابع والعشرين من رمضان الكريم من سنة ১৪৪১ من هجرة المصطفى ﷺ. سائلاً الله عز وجل الإخلاص والقبول، وأن ينفع بهذه الرسالة الصغيرة كل من قرأها، وأسأله عز وجل أن يغفر لي ولوالدى ولمشايخي ولأصحاب الحقوق عليّ وآخر دعواي أن الحمد لله رب العالمين. أبو لبيب مفتى محمد نصير الدين بن معشوق ميا. العنوان: شتاوك؛ لاخهائ؛ حبيغنج؛ بنجلاديش

[৩৪০] আল্লামা ইউসুফ লুধয়ানুবী সম্পাদিত, বাইশজন মিথ্যুক নবী, পৃ.-১৬; অন্যান্য ইতিহাস।